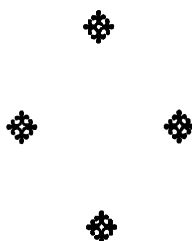
গান্ধিজীর

‘টু দি উইমেন’

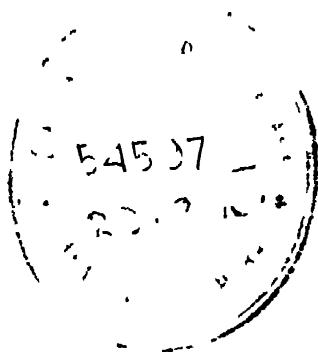


অনুবাদ করেছেন

রেবা রায়

গান্ধিজীর

'টু দি উইমেন'



অনুবাদ করেছেন

রেবা রায়

প্রকাশক :

গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ

রাজভবন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬০

মূল্য : ৬ টাকা ৫০ পয়সা

মুদ্রাকর :

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড

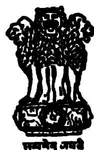
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৯

আজকের দিনে গান্ধিজীর 'টু দি উইমেন' বই-এর বাংলা অনুবাদ নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। শ্রীমতী রেবার এই প্রয়াসে আমার আশীর্বাদ আছে—সততই থাকবে। এই সৎপ্রচেষ্টা সফল হোক্।

কানন দেবী

৫নং নফর কুণ্ডু রোড
কলিকাতা-২৬



The story of India shines with the names of women who have left their impress on politics, religion, art and even warfare. Yet women have suffered many social discriminations. The foresight of Mahatma Gandhi brought the average women to the political movement and Jawaharlal Nehru encouraged her to participate in the development of the country. Once again women are able to make their contribution to the well-being and progress of the country.

I am glad that Mahatma Gandhi's speeches and writings addressed to women have been translated by Smt. Reba Roy into Bengali.

Indira Gandhi

New Delhi,

বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে

মা-কে

দিলাম

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জাতীয় গান্ধী-শতাব্দী সমিতির পূর্বাঞ্চল বিভাগীয় মহিলা ও শিশু উপসমিতির ও বা-বাপু শতাব্দী মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীঅশোকা গুপ্তা ও শ্রীঅমর কুমারী ভার্মার উৎসাহে বইটি অনুবাদ করতে উদ্যোগী হয়েছি। মৌখিক ধন্যবাদে তাঁদের ঋণ শোধ হবার নয়।

রেবা রায়

সূচীপত্র



(শ্রীশম্ভু সাহার সৌজন্যে)

হিন্দু স্ত্রী

একজন সহকর্মী তাঁর বোনের বিবাহিত জীবনের দুর্দশা বর্ণনা করে যে দীর্ঘ চিঠি দিয়েছেন নীচে তার সারাংশ দেওয়া হলো—

"কিছুদিন আগে আমার বোনের বিয়ে হয়েছে। তখন আমরা তার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। পরে জানা গেল সে একটি লম্পট। সব রকম লাম্পট্যে ও ব্যভিচারে তার তৃপ্তি হয় নি। তার কোন আত্মসম্মান বোধও নেই। আমার হতভাগিনী বোন বিয়ের কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলো তার স্বামীদেবতাটি ধীরে ধীরে অধঃপতনের পাঁকে ডুবে যাচ্ছে। এতে সে প্রতিবাদ করে, কিন্তু তার স্বামী তা সহ্য করতে নারাজ— স্ত্রীকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তার সামনেই অতিরিক্ত দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে থাকে। সে কখনও বা তাকে বেত মারে, কখনও দাঁড় করিয়ে রাখে এবং উপবাসী করেও রাখে। এমন কি একটি খুঁটিতে বেঁধে তার চোখের সামনে নিজের দুর্নীতি ও ব্যভিচার দেখাতে বাধ্য করে। ফলে আমার বোনের হৃদয় একেবারে ভেঙ্গে যায়। বোনের কান্না আমাদের মর্মান্তিকভাবে বিচলিত করে; কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ অসহায়। আপনি এখন আমার বোন ও আমাদের কি উপদেশ দেন?

"হিন্দুধর্মের এ একটি নিতান্ত লজ্জা ও গ্লানির বিষয় যে হিন্দুনারীকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয় এবং নারীর নিজস্ব দাবী বা অধিকার বলে কিছুই থাকে না। পুরুষ খুসীমত নিষ্ঠুর বা হৃদয়হীন হলেও দুর্ভাগা নারীর প্রতিবিধানের কোন পথ নেই। পুরুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সে তার খুসীমত যেখানে সেখানে মিলনের ক্ষেত্র স্থাপন করতে পারে কিন্তু তার সামান্য প্রতিবাদ করাও যায় না অথচ বিবাহিতা নারীকে তার পতিদেবতার করুণার ওপর আত্মসমর্পণ করতে হয়। এইভাবে হাজার হাজার নারী গুমরে মরছে। যতদিন না হিন্দুধর্ম থেকে এই কলঙ্ক নিশ্চিহ্ন হয়—ততদিন আমাদের আশা কোথায়?"

পত্রলেখক শিক্ষিত। তাঁর বোনের দুঃখের যে কাহিনী তিনি লিখেছেন তা সংক্ষিপ্ত নয়—সজীব বর্ণনা। পত্রপ্রেরক তাঁর নাম

ঠিকানাও দিয়েছেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর এই আক্রমণকে প্রবল ক্ষোভের অভিব্যক্তি বলে উপেক্ষা করলেও এ একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে সর্বজনীন করবার আক্ষিপ্ত প্রয়াস, যেহেতু এখনও লক্ষ লক্ষ হিন্দু কুলনাবী নিজের নিজের পরিবারে সম্রাজ্ঞী হয়ে সম্পূর্ণ সুখে ও শান্তিতে কাল যাপন করছেন। তাঁবা তাঁদের স্বামীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন এবং তা যে কোন নারীর পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু।

এই যে প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব এর মূলে আছে প্রেম। যে নিষ্ঠুরতার কাহিনীটি পত্রলেখক বর্ণনা করেছেন তা একটি উদাহরণ মাত্র। এটি হিন্দুধর্মের কোন কলঙ্ক সূচনা করে না। বস্তুতঃ মানব সমাজে যে পশুভাব আছে এ তারই প্রকাশ মাত্র—এবং এই প্রকাশ পৃথিবীর সবদেশে বিভিন্নধর্মী যে কোন সমাজেই ঘটতে পারে। স্বামীর বর্বরতার কাছে সহজেই নতি স্বীকার করেন যে সব স্ত্রী তাঁরা এর বিরুদ্ধাচরণে হয় অসমর্থা কিংবা অনিচ্ছুক—এইসব রমণীকে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়ে রক্ষা করা যায় না। অতএব সমাজ সংস্কারকদের পক্ষে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনেই এই রকম অতিশয়োক্তি বা অযথা উচ্ছ্বাস বর্জন করাই উচিত।

তবুও এই প্রবন্ধে যে ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে হিন্দুসমাজে এ রকম ঘটনা একেবারেই যে বিরল তা নয়। স্বামীব ওপর হিন্দুস্ত্রীর আত্মনির্ভরশীলতা এবং হিন্দুকুলবধূর নিজস্ব সত্ত্বা স্বামীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করতে বাধ্য করার মাঝেই রয়েছে হিন্দুধর্মের গলদ; ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে সময় সময় স্বামী বল-পূর্বক যে প্রাধান্য ও অধিকার ভোগের চেষ্টা করেন তা তাঁকে পশুর পর্যায়ে নিয়ে যায়। আইন দিয়ে এই অবিচারের প্রতিকার সম্ভব নয়। বিবাহিত রমণীদের কুমারীদের থেকে পৃথক করে যথাযথ শিক্ষাদানের দ্বারা এবং পুরুষের এই অপৌরুষ আচরণের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের দ্বারাই এই অবিচারের প্রতিকার সম্ভব। এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রতিকার সন্দেহাতীতভাবে সহজ ও সরল।

বিপন্না ও অসহায়া বোনের জন্য তার ভাই ও আত্মীয়স্বজনদের সম্পূর্ণ অসহায় মনে করে কাঁদার চেয়ে তাঁদের হতভাগিনী বোনকে রক্ষার ব্যবস্থা রক্ষা করা উচিত এবং তাকে এই শিক্ষাই দেওয়া উচিত যাতে সে বিশ্বাস করতে পারে যে পাপাসক্ত এই ব্যক্তিকে স্বামীর মর্যাদা দেওয়া বা তার সঙ্গকামনা করা তার উচিত নয়। এক্ষেত্রে এটা সুস্পষ্ট যে স্বামীটির মনে তার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কোমল ভাবই নেই—স্ত্রীকে সে একেবারেই গ্রাহ্য করে না। সুতরাং স্ত্রী তার বিধিসম্মত বিবাহকে নাকচ না করে স্বামীর কাছ থেকে দূরে স্বতন্ত্র-ভাবে বাস করতে পারে এবং নিজেকে অবিবাহিত বলে মনে করতে পারে। অবশ্য বিবাহ-বিচ্ছেদ অপ্রাপ্য হলেও হিন্দুস্ত্রীর পক্ষেও দুটি আইনসম্মত প্রতিকারের পথ খোলা আছে। তা হলো স্বামীকে অত্যাচারের জন্য শাস্তি দেওয়া এবং তার স্ত্রীকে প্রতিপালন করতে বাধ্য করা। অবশ্য আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে এই রকম প্রতিকার সবক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকরী তো হয়ই না বরং এতে মন্দ ফল ফলে। এর দ্বারা সাধ্বী বা ধর্ম-পরায়ণা পত্নী কখনই শান্তিলাভ করতে পারেন না। বিশেষতঃ এ স্বামীর চরিত্র সংশোধন সম্পূর্ণ অসম্ভব না হলেও আরও কঠিন করে তোলে। এই পরিবর্তন সাধনই সমাজের বিশেষ করে প্রত্যেক স্ত্রীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই বিশেষ ক্ষেত্রে বালিকাটির মা-বাবা তার প্রতিপালনে সম্পূর্ণ সক্ষম। যে ক্ষেত্রে এ সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে এ রকম অত্যাচারিতা নারীদের আশ্রয় দিতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেশে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বামীগৃহের অবাঞ্ছিত আশ্রয় পরিত্যাগকারিণী কিংবা স্বামী-পরিত্যক্তা যুবতীদের যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করবার প্রশ্নটিও তবু থাকে—বিশেষতঃ যে সব ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের সুবিধেটুকু নেই। সংখ্যাবিচারে এই প্রশ্নটির বাস্তবিক তেমন গুরুত্ব নেই কারণ যে সমাজ যুগ যুগ ধরে বিবাহ বিচ্ছেদের রীতি অনুমোদন করে নি সেই

সমাজে যে নারীর বিবাহ একবার সুখের হয়নি তিনি সাধারণতঃ পুনর্বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। যদি সমাজের জনমত এই ধরণের বিশেষ প্রতিকার চায় তাহলে আমার সন্দেহ নেই যে তা আসতে বাধ্য। পত্রপ্রেরকের লেখা থেকে যতটা বুঝতে পারি তাতে এই মনে হয় যে, স্ত্রী তার যৌন আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে পারে নি বলেই তার অভিযোগ নয়—স্বামীর ধৃষ্টতা ও উদ্ধত অমানুষতাই তার অভিযোগের কারণ। এর জন্য আমি যেমন বলেছি—প্রয়োজন চিন্তা-ধারার সংশোধন এবং এই সংশোধনের মাঝেই রয়েছে এর প্রতিকার। আমাদের অনেক রকম ত্রুটি-বিচ্যুতির মত এই অসহায়তা বোধও কাল্পনিক। কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গী কিছু মৌলিক চিন্তাধারাই এই বিকৃত কল্পনাপ্রসূত ক্লেশভোগকে দূর করবার পক্ষে যথেষ্ট। এই সব ক্ষেত্রে বন্ধু ও আত্মীয়দের অত্যাচারীর হাত থেকে নিগৃহীতাকে কেবলমাত্র আলাদা করেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়—জনসেবার জন্য তাকে শিক্ষিত করতে উৎসাহ দিতে হবে। স্বামীর অঙ্কশায়িনী হবার অনিশ্চিত অধিকারের চেয়ে এই শিক্ষাই অনেক মূল্যবান।

একজন মহিলা বন্ধুর প্রশ্ন

আমার জ্ঞান ও সততায় বিশ্বাসী কোন একজন মহিলা বন্ধু আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন—নিজের অধিকার সম্বন্ধে অতি সচেতন কোন কোন স্বামীর সঙ্গে বিরক্তিকর বাদানুবাদে লিপ্ত হবার ভয়ে আমি সেইসব প্রশ্নের আলোচনা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অতি সচেতন স্বামীরা আমাকে ক্ষমা করবেন কারণ তাঁরা জানেন যে আমি তাঁদেরই দলে—সময় সময় মতান্তর হলেও আমি গত চল্লিশ বছর ধরে সুখেই বিবাহিত জীবন যাপন করেছি।

প্রথম প্রশ্নটি সঙ্গত, সময়োচিত এবং মূল মারাঠি ভাষায় লেখা—আমি তার সবল তর্জমা করছি।

> "কোনরকম দেশের কাজে যোগদান না করে শুধুমাত্র রাম নাম জপ করেই কি কোন নরনারী আত্মোপলব্ধি করতে পারে? এ প্রশ্নটি করবার কারণ এই যে আমার কোন কোন বোন বলেন যে তাঁদের সাংসারিক কাজকর্মে মন দেওয়া এবং সময় সময় গরীবের জন্য দয়া দেখানো ছাড়া আর কিছুই করবার প্রযোজন নেই।"

এই প্রশ্নটি শুধু মেয়েদেরই নয় অনেক ছেলেদেরও সংশয়াবিষ্ট করেছে এবং আমাকেও গভীরভাবে চিন্তান্বিত করেছে। একথা আমার অজানা নয় যে দর্শনশাস্ত্রের একটি মতবাদে সব রকম কর্মে অনাসক্তি ও প্রয়াসে অনাবশ্যকতা শিক্ষা দেয়। বস্তুতঃ যদি আমার নিজস্ব বিচার ধাবায় বিশ্লেষণ করতে না পারি, শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি দানের জন্য আমি সেই শিক্ষাধারাকে মেনে নিতে পারি নি। আমার বিনীত বিবেচনায় একজনের নিজের বিকাশের জন্য প্রয়াস অপরিহার্য এবং সেই প্রয়াস ফলাফলনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। রামনাম জপ কিংবা সেই রকম কিছু শুধুমাত্র আবৃত্তির জন্যই নয় উপরন্তু ঈশ্বরের নির্দেশপ্রাপ্তির সহায়ক হিসেবে আত্মশুদ্ধির জন্য

প্রয়োজন। অতএব একে কখনই সব রকম কর্মপ্রয়াসের বদলে গ্রহণ করা যায় না। নামজপ কাজে আরও আগ্রহ আনে এবং একে সঠিক পথে চালায়। যদি সব কর্মপ্রয়াসই নিরর্থক হয় তবে পারিপার্শ্বিক আকর্ষণই বা কেন কিংবা গরীবের প্রতি সাময়িক দাক্ষিণ্যই বা কেন? দেশসেবার বীজ এই সব প্রয়াসের মাঝেই নিহিত। মানবতার সেবা, আমার মতে, দেশসেবা, যেমন পরিজনের নিঃস্বার্থ সেবাও দেশসেবা। পরিবারের নিঃস্বার্থ সেবাই একজনকে নিশ্চিত দেশসেবায় এগিয়ে দেয়। রাম-নাম স্থৈর্য ও অনাসক্তি আনে এবং কখনও সঙ্কট মুহূর্তে বিচলিত করে না। দরিদ্রতমের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া এবং তার সেবা ছাড়া আত্মোপলব্ধি অসম্ভব বলে আমি মনে করি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই যে—

> "স্বামী, তিনি বর্বরই হোন বা ভালবাসার পাত্রই হোন তাঁর প্রতি নিষ্ঠা ও তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজ সত্তার বিলোপ সাধনই হিন্দুধর্মের উচ্চতম আদর্শ—এই যদি স্ত্রীর আদর্শ আচরণ হয় তবে স্বামীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সে দেশসেবা গ্রহণ করতে পারে কি? কিংবা সে এ বিষয়ে ততটুকুই এগিয়ে যাবে যতটুকু যেতে তার স্বামী অনুমতি দেবেন।"

স্বামী-স্ত্রী হিসেবে রামসীতাই আমার আদর্শ। কিন্তু সীতা রামের দাসী নন, কিংবা একে অন্যের দাস বা দাসী। রাম সব সময়ই সীতার প্রতি সহানুভূতিশীল। যেখানে সত্যকার ভালবাসা আছে সেখানে এ প্রশ্ন ওঠে না। যেখানে সত্যকার ভালবাসা নেই সেখানে বন্ধনও নেই। কিন্তু বর্তমান হিন্দু পরিবারের গঠন এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। স্বামী ও স্ত্রী বিয়ের সময় একে অন্যের কিছুই জানে না। ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক রীতিনীতি ও বিবাহিত জীবনের গতানুগতিকতাই অধিকাংশ হিন্দু-সংসারে শান্তি বজায় রাখে। কিন্তু যদি স্বামী বা স্ত্রী অসাধারণ কোন মত পোষণ করেন তখনই অশান্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বামীর দিক থেকে কোন সঙ্কোচ বা

দ্বিধা নেই। তিনি সহধর্মিনীর মতামত নেবার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেন না। স্ত্রীকে তিনি তাঁর সম্পত্তি বলে মনে করেন। এই অধিকারে বিশ্বাসী বেচারী স্ত্রী প্রায় সময়ই নিজেকে সঙ্কুচিত করে রাখে। আমার মনে হয় এই অবস্থার সমাধান সম্ভব। মীরাবাঈ সেইপথ দেখিয়েছেন। কোন মহত্তর উদ্দেশ্যে যদি স্ত্রী প্রতিরোধ করেন ও যদি তিনি স্থির জানেন যে তিনি যা করছেন তা ন্যায়সঙ্গত সেক্ষেত্রে স্ত্রীর নিজের পথ বেছে নেবার ও পরিণতির বিরুদ্ধে বিনম্র সাহস দেখাবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

তৃতীয় প্রশ্ন—

"ধরুন যদি কোন স্বামী মাংসাশী হন ও স্ত্রী যদি আমিষাহারকে পাপ বলে মনে করেন তাহলে স্ত্রী কি তাঁর নিজের অভিরুচি মত চলবেন? তিনি কি তাঁর সমস্ত ভালবাসা দিয়ে তার স্বামীকে মাংসাহার কিংবা সেই-রকম কাজ থেকে বিরত করবার চেষ্টা করতে পারেন? কিংবা স্বামীর জন্য মাংস রাঁধতে কি তিনি বাধ্য? এমন কি আরও দুঃখের হলেও স্বামী যদি দাবী করেন তাহলে কি তাঁকে আমিষাহারও করতে হবে? স্ত্রী তার নিজস্ব পথ গ্রহণ করতে পারে এই যদি আপনি বলেন তবে একজন যখন বাধ্য করে এবং অপরজন বিদ্রোহ করে তখন একটি পারিবারিক ঐক্য কি করে বজায় থাকে?"

এই প্রশ্নের আংশিক উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনায় আছে। স্ত্রী তাঁর স্বামীর পাপের সঙ্গী হতে বাধ্য নন। যখন তিনি কোন কিছুকে অন্যায় বলে মনে করেন তখন যা ন্যায় তাই তাঁর সাহসের সঙ্গে করা উচিত। যখন দেখি স্ত্রীর কর্তব্য রান্না করা ও সংসার পরিচালনা করা এবং স্বামীর কর্তব্য সংসারের জন্য অর্থোপার্জন করা তখন আগে দুজনেই যদি মাংসাশী হয়ে থাকেন তাহলে স্ত্রী পরিবারের জন্য মাংস রাঁধতে বাধ্য। অপর পক্ষে নিরামিষাশী পরিবারে স্বামী যদি মাংসাশী হন ও স্ত্রীকে তাঁর জন্য রান্না করে দিতে জোর করেন তাহলে স্ত্রী তার ন্যায়বোধকে অস্বীকার করে মাংস রান্না

করতে বাধ্য নন। পারিবাবিক শান্তি নিশ্চয়ই একান্ত প্রয়োজন কিন্তু এই শান্তি রক্ষাই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। আমার মতে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত বিবাহিত জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষাও সমান প্রয়োজনীয়। সারাজীবনই কর্তব্যপালনের এক পরীক্ষা। এ জীবনে ও তার পরেও পারস্পরিক কল্যাণ সাধনাই বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য। মানবতার সেবাও এই ব্রত। যদি একজন সাথী শৃঙ্খলার নিয়ম ভাঙ্গেন তবে অপর জনেরও বাঁধন ছিড়ে ফেলার অধিকার জন্মায়। এই বিচ্ছেদ শুধু দৈহিক নয়—আত্মিক। এ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন ওঠে না। স্বামী ও স্ত্রী পৃথক হবেন এবং পৃথক হয়েই যে আদর্শের জন্য একদিন মিলিত হয়েছিলেন সেই আদর্শেরই সেবা করবেন। হিন্দুধর্ম স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের সমকক্ষ বলে মনে করে। ঠিক কবে থেকে তা কেউ না জানলেও এটা অস্বীকাব করা যায় না যে বিপরীত অবস্থাও দেখা দেয়। এটুকু অবশ্য আমি নিশ্চয় জানি যে আত্মোপলব্ধির জন্য এবং যে আত্মোপলব্ধির জন্যই নারী ও পুরুষের জন্ম তার জন্য সবকিছু করবার অবাধ স্বাধীনতা হিন্দুধর্ম প্রত্যেককেই দিয়েছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে নারী

একজন পত্রলেখক বেজওয়াড়াতে প্রকাশিত "ভারতীয় স্বরাজ্যে"র একটি সংখ্যা আমাকে পাঠিয়েছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর স্থান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ তাতে আছে। কোন পরিবর্তন না করে আমি তার কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি।

"স্বামী চরিত্রহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং সদ্‌গুণের অধিকারী না হইলেও স্ত্রীর তাহাকে দেবতার ন্যায় গ্রহণ করা কর্তব্য।" (মনু ৫-১৫৪)

"স্বামীর আদেশ স্ত্রীকে পালন করিতে হইবে। ইহা তাহার পরম কর্তব্য।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১-১৮)

"স্ত্রীর পক্ষে কোন পৃথক আচার, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বা উপবাসের প্রয়োজন নাই। স্বামীর সেবা করিযাই সে স্বর্গে উন্নত স্থান লাভ করে।" (মনু ৫-১৪৫)

"স্বামীর জীবিতকালে যে স্ত্রী উপবাস এবং শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পালন করে—সে তাহার স্বামীর আয়ুর হ্রাস ঘটায়। সে নরকে যায়। যে স্ত্রী পুণ্যবারি পাইতে চায় তাহার উচিত স্বামীর পদ অথবা তাহার সকল দেহ ধৌত করিয়া সেই জল পান করা—তবেই সে সর্বোচ্চ শিখরে উঠিতে পারে।" (আত্রী ১৩৬-১৩৭)

"স্ত্রীর পক্ষে স্বামী ব্যতিরেকে অন্য কোন উচ্চতর স্থান নাই। যে স্ত্রী স্বামীর বিরাগভাজন হয় সে মৃত্যুর পরেও তাহার সহগামিনী হইতে পারে না। অতএব স্বামীর বিরাগভাজন হওয়া তাহার উচিত নহে।" (বশিষ্ট ২১-১৪)

"যে রমণী পিতৃগৃহ বিষয়ে গরবিনী হইয়া স্বামীকে অমান্য করে রাজার উচিত তাহাকে বহুজনের সভায় কুক্কুরের সম্মুখে বধ্যরূপে নিক্ষেপ করা।" (মনু ৮-৩৭১)

"যে স্ত্রী স্বামীকে অমান্য করে তাহার প্রদত্ত আহার্য কাহারও গ্রহণ করা উচিত নহে। কারণ এইরূপ স্ত্রীলোকেরা ইন্দ্রিয়পরায়ণা বলিয়া পরিগণিত হয়।" (আঙ্গীরস—৬৯)

"স্বামী যখন কুঅভ্যাসে লিপ্ত অথবা পানাসক্ত হয় অথবা শারীরিক ব্যাধিতে ভুগিতে থাকে এবং স্ত্রী যদি তখন তাহাকে অমান্য করিতে চাহে

তবে তিন মাসের জন্য মূল্যবান বস্ত্রাদি ও রত্নালঙ্কার বর্জন করিয়া তাহার দূরে থাকা উচিত।" (মনু ১০-৮)

এটা দুঃখের বিষয় যে যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতাকে নিজেদের স্বাধীনতার মতই মর্যাদা দেন এবং যাঁরা নারীকে জাতির জননীস্বরূপ শ্রদ্ধা করেন তাঁদের কাছে স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক সূত্রই শ্রদ্ধার আসন লাভ করে না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে রক্ষণশীলতার স্বপক্ষে কোন একটি সংবাদপত্র স্মৃতির ঐ অংশগুলোকে ধর্মেরই অঙ্গ বলে প্রকাশ করেছে। অবশ্য স্মৃতিশাস্ত্রের এমন অনেক উক্তি আছে যাতে নারীকে তার যথাযোগ্য স্থানই দেওয়া হয়েছে এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখান হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে স্মৃতিশাস্ত্রের যে সব নির্দেশ ঐ শাস্ত্রেরই অন্য সব নির্দেশের বিরোধী ও যা নীতিজ্ঞানের পরিপন্থী সেগুলো সম্বন্ধে কি করণীয়? আমি আগেও অনেকবার বলেছি যে ধর্মগ্রন্থের নামে যা কিছুই ছাপানো হোক না কেন তার সবই ভগবৎকথা বা তাঁর আদেশবাণী নয়। কিন্তু কোন্‌টা সৎ এবং প্রমাণস্বরূপ বা কোন্‌টা অসৎ এবং প্রক্ষিপ্ত তা সকলেই মীমাংসা করতে পারে না। অতএব ধর্মগ্রন্থের নামে যা কিছু চলতি তা পরিমার্জনা করার জন্য—যে সব সূত্রের কোন নৈতিক মূল্য নেই বা যেগুলো ধর্ম ও নীতির মূলগত বিষয়গুলিরও সম্পূর্ণ বিরোধী সেগুলো দূর করে হিন্দুসমাজকে সঠিক পথে চালিত করতে পারে এমন একটি সংস্করণ রচনা করবার জন্য একটি যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারকমণ্ডলীর একান্ত দরকার। বিশাল হিন্দুসমাজ বা যাঁরা ধর্মীয় নেতারূপে স্বীকৃত তাঁরা এইরকম একটি মণ্ডলের অস্তিত্ব স্বীকার করবেন না—এই নিশ্চয়তা যেন ঐ মহান্ কর্মোদ্যোগের বাধা না হয়। নিষ্ঠা ও সেবার মনোভাব নিয়ে যে কাজ করা যায় তার সুফল উত্তরকালে সকলেই ভোগ করবে এবং নিশ্চিতভাবে যাদের সহায়তার প্রয়োজন তাদের সহায়তা করবে।

নারী ও বর্ণাশ্রম

শ্রদ্ধেয় এক বন্ধু লিখেছেন—

"বর্ণ সম্বন্ধে আপনার সাম্প্রতিক রচনা পড়লে এই মনে হয় বর্ণাশ্রমের যে আভাস আপনি দিয়েছেন তা শুধুমাত্র পুরুষের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। নারীদের সম্বন্ধে তাহলে কি হবে? হয়ত আপনি বলবেন যে বিয়ের আগে সে পিতার এবং বিয়ের পরে সে স্বামীর বর্ণ গ্রহণ করবে। এই কি বুঝতে হবে যে আপনি মনুর সেই বহুনিন্দিত উক্তির সমর্থন করেন—যাতে বলা হয়েছে যে জীবনের কোন অধ্যায়েই স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না—বিবাহের পুর্বে পিতামাতার—বিবাহের পরে স্বামীর এবং বৈধব্যকালে সন্তানের কর্তৃত্বাধীনেই তাদের থাকতে হবে?

"সে যাই হোক না কেন, বস্তুতঃ এ সত্য যে, আমাদের যুগ নারীর রাজনৈতিক অধিকারের যুগ। সে স্পষ্টতঃই স্বাধীনবৃত্তি নির্বাচনে পুরুষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আজকাল এরকম ঘটনা খুবই স্বাভাবিক যে স্বামী যখন মহাজনী কারবারে ব্যাপৃত তার স্ত্রী তখন স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত। এরকম ক্ষেত্রে স্ত্রী কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হবে? বর্ণাশ্রমের নিয়ম অনুসারে পুরুষ তার বংশানুক্রমিক বৃত্তি সাধারণভাবে গ্রহণ করবে এবং পিতার বর্ণই অর্জন করবে। কিন্তু নারী তার পিতামাতার বর্ণ গ্রহণ করে বিয়ের পরেও আশা করা যায় স্বাভাবিকভাবেই নিজের নিজের বৃত্তিতেই নিযুক্ত থাকবে। তাহলে তাদের সন্তানেরা এদের মধ্যে কোন্ বর্ণভূক্ত হবে? কিংবা আপনি কি এই প্রশ্নের মীমাংসা তাদের সন্তানদের সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছে বা পছন্দের ওপর ছেড়ে দেবেন? যে বংশগত ভিত্তিতে বর্ণ প্রতিষ্ঠিত আর যা আপনার প্রচারিত বর্ণাশ্রম-ধর্মের মূল কথা—তার পরিণতি কি হবে?"

আমার মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। উল্লিখিত আমার রচনায় আমি বলেছি যে বর্ণ সম্বন্ধে নানারকম বিভ্রান্তি থাকায় প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে কোন 'বর্ণই নেই। বর্ণাশ্রম প্রথাও আর কার্যকরী নয়। হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থাকে

শৃঙ্খলাহীন বলা চলে—চতুর্বর্ণ মাত্র নামেই আছে। যদি বর্ণের পরিচয়েই আলোচনা করতে হয় তবে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে একটি মাত্রই বর্ণ আছে—তা এই যে আমরা সকলেই শূদ্র।

পুনরুজ্জীবিত বর্ণধর্মের যে ধারণা আমার আছে তাতে বিয়ের আগে একটি মেয়ে তাব ভাইএর মতই পিতার বর্ণভুক্ত হবে। অসবর্ণ বিবাহ কদাচিৎ হবে। সুতরাং বিয়ের পরেও মেয়েটির আগের বর্ণ অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু যদি স্বামী অন্য বর্ণভুক্ত হনই তবে স্বভাবতই কন্যা তার পিতার বর্ণ ত্যাগ করে স্বামীর বর্ণ গ্রহণ করবে। বর্ণের এই পরিবর্তন কারুর পক্ষেই নিন্দার্হ নয় কিংবা এ কারুর ভাবপ্রবণতাকে আঘাতও করে না, কেননা পুনরুজ্জীবিত বর্ণাশ্রম অর্থে চারটি বর্ণের মধ্যেই সম্পূর্ণ সামাজিক সমতা বোঝায়।

স্বাভাবিক নিয়মে স্ত্রী স্বাধীনভাবে স্বামীর থেকে আলাদা বৃত্তি গ্রহণ করবে এটা আমার ধারণায় নেই। শিশুদের যত্ন নেওয়া আর সংসার চালনা তার সব শক্তি নিয়োজিত রাখবার পক্ষে পর্যাপ্ত। সুসংবদ্ধ সমাজে পরিবার ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত দায়িত্ব তার ওপর না দেওয়াই উচিত। পুরুষ পরিবার প্রতিপালন করবে আর নারী তার পরিচালনা করবে—এইভাবে একে অন্যের পরিপূরক ও পরিবর্ধক হিসেবে কাজ করবে—শ্রম পূর্ণ করবে।

এতে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় বা তার স্বাধীনতা খর্ব হয় বলে আমি মনে করি না। "নারীর কোন স্বাধীনতাই থাকতে পারে না।" —মনুর এই তথাকথিত উক্তি আমার কাছে অভ্রান্ত দৈব উক্তি বলে মনে হয় নি। এতে শুধু এই বোঝা যায় যে সম্ভবতঃ যে সময় এটা প্রচারিত হয়েছিল সে সময় নারীকে পরাধীন অবস্থায় রাখা হত। আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ, সহধর্মিনী বা সহকারিণী বলে বর্ণনা আছে। স্বামীও যখন স্ত্রীকে দেবী বলে সম্বোধন করেন তাতেও কোন অসম্মান বোঝায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ কোন এক সময়ে নারীকে তার বহু অধিকার ও সুযোগ থেকে

বঞ্চিত করে তাকে হীনতর অবস্থায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু কোন অবস্থায়ই তার বর্ণের অবনতির প্রশ্ন ওঠেনি, যেহেতু বর্ণ বলতে কতগুলি অধিকার বা সুবিধার কথা বোঝায় না। এ কেবলমাত্র কর্তব্য ও দায়িত্বের নির্দেশই দেয়। আমাদের দায়িত্বভার থেকে কেউই আমাদের বিচ্যুত করতে পারে না যদি না আমরা নিজেরাই তা পরিহার করতে চাই। যে নারী নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ও তা পালন করেন—তিনি তাঁর আপন মর্যাদার আসন লাভ করেন। যে সংসারে তিনি কর্ত্রী সেখানে তিনি রাণী—দাসী নন।

এর পর আমাকে বোধহয় বিস্তৃতভাবে আর বলতে হবে না যে সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তা স্বীকৃত হলে সন্তানদের বর্ণ সম্বন্ধে আর কোন সমস্যা থাকবে না—কারণ স্বামী ও স্ত্রীর বর্ণের কোন বৈষম্যই থাকবে না।

নারীর স্থান

দাম্পত্য জীবনের মোহকে যিনি এতদিন সার্থকতার সঙ্গে প্রতিরোধ করেছেন এমন একজন মহিলা লিখছেন—

"বম্বের মালবারী হলে গতকাল এক মহিলা সম্মেলনে বহু সারগর্ভ বক্তৃতা হয়েছে। ঐ সন্ধ্যায় আলোচ্য বিষয় ছিল "সারদা বিল"। মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স আঠার হওয়া উচিত আপনি এই মত সমর্থন করেন জেনে আমরা কতই না আনন্দিত। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আইন বিষয়ে। আপনি যদি নবজীবন ও ইয়ং ইণ্ডিয়াতে একটি জোরালো প্রবন্ধ লিখতেন তবে তা কতই না কাজের হতো। কেন নারীকে তার জন্মগত অধিকার ফিরে পাবার জন্য হয় দয়া ভিক্ষা করতে হবে নয় সংগ্রাম করতে হবে? যখন শুনি নারীগর্ভজাত পুরুষেরাই সদম্ভে "দুর্বলা নারী" বলে উক্তি করেন এবং আমাদের প্রাপ্যটুকু দান করার উদার প্রতিশ্রুতি দেন তখন তা অদ্ভুত লাগে ও এক নিদারুণ পরিহাস বলে মনে হয়। দান করবার নির্বোধ উক্তিই বা কেন? আইন-বিরুদ্ধভাবে নিজের শক্তিতে যা কেড়ে নেওয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দেবার মাঝে ঔদার্য বা সৌজন্য কোথায়? পুরুষের চেয়ে নারীর প্রয়োজনীয়তা কম কিসে? তাদের উত্তরাধিকারের অংশ পুরুষদের চেয়ে কম হবে কেন? তা সমান সমান হবে না কেন? দিন দুই আগে আমরা কয়েকজন মিলে খুব উত্তেজনার সঙ্গে এই আলোচনা করছিলাম। একজন মহিলা বললেন—'আইনের কোন পরিবর্তন আমরা চাই না। আমরা যা পেয়েছি তাতেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। কেননা বস্তুতঃ পুত্রসন্তানই বংশের নাম ও ধারা বহন করে বলে তারই বেশী অংশ পাওয়া সমীচীন—সে-ই পরিবারের প্রধান অবলম্বন।' আমরা বললাম, 'কিন্তু কন্যাদের বিষয়ে কি বলেন?' কথার মাঝখানে এক বীরপুরুষ বলে উঠলেন—'কেন অন্য পুরুষ তার দেখাশোনা করবে?' চমৎকার! অন্য কোন পুরুষ! সব সময়ই সেই অন্য পুরুষের দোহাই! আর একজন পুরুষ যে থাকবেই তাই বা ধরে নেওয়া হবে কেন? তাঁরা এমনভাবে কথা বলেন যে নারী যেন একটি ভারের

বোঝা—যতদিন না সেই অন্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটে ততদিন পিতৃগৃহে কোন মতে আশ্রয় পাবে—পরে দ্বিধাহীনভাবে তৃতীয় ব্যক্তির হাতে স্বস্তির সঙ্গে দান করা হবে। বাস্তবিক, নারী হলে আপনি কি এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন না?"

নারীর প্রতি পুরুষের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আমার নারী হবার প্রয়োজন নেই। নারীর উত্তরাধিকারের আইনকে আমি এই দুর্ব্যবহারের তালিকায় নগণ্য বলে মনে করি। যে সামাজিক অন্যায় সারদা আইনের বিষয়বস্তু তা উত্তরাধিকার আইনের চেয়ে অনেক গুরুতর। কিন্তু নারীর অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে আমার মনোভাব অনমনীয়। আমার মতে নারীর এমন কোন আইনগত অক্ষমতা থাকা উচিত নয় যা পুরুষের নেই। সম্পূর্ণ সমদৃষ্টি নিয়েই আমি কন্যা ও পুত্রকে দেখবো। শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে ক্রমেই নারী তার নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং স্বভাবতঃই তখন যে প্রকট অসাম্যের অধীন হয়ে আছে তার প্রতিবাদ করবে।

কিন্তু আইনগত অসমতা দূর করা কেবলমাত্র সাময়িক ব্যবস্থা। এই অন্যায়ের মূল—অধিকাংশ লোক যতটা জানে তার চেয়ে অনেক গভীরে নিহিত। পুরুষের ক্ষমতা, খ্যাতির লোভ ও গভীরভাবে পারস্পরিক কামলিপ্সার মধ্যেই এ নিহিত। পুরুষ সব সময়ই ক্ষমতা চায়। সম্পত্তির ওপর অধিকারই তাকে এই ক্ষমতা দেয়, ক্ষমতাসঞ্জাত খ্যাতি তা মৃত্যুর পরে হলেও তার প্রতি পুরুষের থাকে প্রচণ্ড লোভ। আর সেই খ্যাতি লাভ করা সম্ভব হয় না যদি পরবর্তী বংশধরেরা সকলেই সমানভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, এবং ত্যক্ত সম্পত্তি পর্যায়ক্রমে খণ্ডিত হতে থাকে। অতএব সম্পত্তির বহুলাংশই জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তানের ওপর বর্তায়। অধিকাংশ নারীই বিবাহিতা। আইন তাঁদের বিরুদ্ধে হলেও তাঁরা তাঁদের স্বামীর ক্ষমতা ও সুবিধার সম অংশীদার হন। বিশেষ কোন একজন প্রভুর গৃহিণী হওয়াতেই তাঁদের আনন্দ। অতএব যদিও বা তাঁরা স্ত্রী-পুরুষের এই

অসাম্যের বাক্‌সর্বস্ব আলোচনার আমূল সংস্কারের পক্ষে মত দেন —যে বিশেষ সুবিধা তাঁরা ভোগ করেন তা পরিত্যাগ করতে তাদের অনিচ্ছুকই দেখা যায়।

সুতরাং যদিও আইনগত সব অসাম্য প্রত্যাহার আমি সর্বতো-ভাবে সমর্থন করি তবুও আমি এই প্রত্যাশা করি যে সংস্কারপন্থী ভারতীয় মহিলারা মূল কারণটি দূর করায় মন দেবেন। নারী ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। অতএব তার প্রবেশে যেন সমাজজীবনের পাপ দূর হয়—সম্পদলিপ্সা ও দুর্দম উচ্চাশা যেন সংযত হয়। এটা যেন তাঁরা মনে রাখেন যে লক্ষ লক্ষ লোকের তাদের বংশধরদের দেবার মত কোন সম্পত্তি নেই। তাদের থেকে আমরা যেন এই শিখতে পারি যে অল্প কয়েকজনের বংশগত সম্পত্তি না থাকলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। মা-বাবার সত্যিকারের সম্পত্তি, যা তাঁরা সমানভাবে সকলকে দিতে পারেন তা হলো তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্রবল ও শিক্ষার সুব্যবস্থা। পুত্র-কন্যারা যাতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে কায়িক পরিশ্রম করে সৎভাবে জীবিকার্জন করতে পারে সেইভাবে তাদের গড়ে তুলতে মা-বাবার চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং নাবালক শিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্ব স্বভাবতঃই সাবালক বংশধরদের ওপর থাকবে। যে বংশগত ধনসম্পত্তি সব রকম উদ্যোগ নষ্ট করে কর্মবিমুখতা ও বিলাসব্যসনে প্রলুব্ধ করে সেই অসম্মানকর আকাঙ্ক্ষার বদলে ধনী ব্যক্তিরা যদি তাঁদের সন্তানদের স্বাবলম্বী হবার যোগ্য শিক্ষা দেন তবে ধনীর দুলালদের বর্তমান অপদার্থতা বহুলাংশে দূর হবে। যুগ যুগ ব্যাপী অন্যায়ের কারণ অনুসন্ধান ও অপসারণের দায়িত্ব প্রগতিশীলা মহিলাদেরই থাকা প্রয়োজন। পারস্পরিক আসক্তিই যে নারীদের অযোগ্যতার অন্যতম কারণ তা প্রমাণের প্রয়োজন নেই। নারী যেমন নিজের অজ্ঞাতসারে নানা সূক্ষ্ম উপায়ে পুরুষকে বিভ্রান্ত করে তেমনই পুরুষও অজ্ঞাতসারে নারীর প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার বৃথাই চেষ্টা করে। ফলে কেউই কৃতকার্য হয় না। এদিক

থেকে দেখলে—ভারতমাতার প্রগতিপন্থী কন্যাদের এক গুরুতর সমস্যার সমাধান করতে হবে। পাশ্চাত্যের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যে পদ্ধতিতে এর সমাধান করা হয়েছে তারা তার অন্ধ অনুকরণ না করলেও পারেন। ভারতীয় প্রতিভা ও ভারতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী পথ তারা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। যা হীন ও অসম্মানকর তা অসঙ্কোচে ত্যাগ করে আমাদের সভ্যতার যা কিছু ভাল তা সযত্নে রক্ষা করে দৃঢ়, সংযত ও নিষ্কলুষ পথ বেছে নিতে হবে। এই কাজ সীতা, দ্রৌপদী, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর মত নারীরাই করতে পারেন, পৌরুষভাবাপন্না বা অতি সচেতন নারীরা নন।

নারীর প্রতি আচরণ

কটকের শ্রীমতী সরলাদেবী লিখেছেন—

"নারীদের প্রতি আচরণ যে অস্পৃশ্যতার মতই একটি সামাজিক ব্যাধি তা কি আপনি স্বীকার করেন না? আমি যে সব তরুণ জাতীয়তাবাদীর সংস্পর্শে এসেছি তাদের মধ্যে শতকরা নব্বুই জনের আচরণই অনেকটা পশুর মত। নারীকে উপভোগ্য বস্তু বলে মনে করেন না এমন কজন অসহযোগী ভারতবর্ষে আছেন? আত্মশুদ্ধি যা আমাদের স্বার্থকতার জন্য অপরিহার্য তা নারীর প্রতি আচরণের পরিবর্তন ছাড়াই কি লাভ করা সম্ভব?"

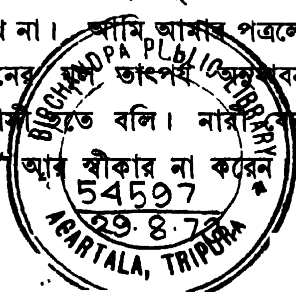
আমি অবশ্য স্বীকার করি না যে নারীর প্রতি আচরণ অস্পৃশ্যতার মতই গুরুতর সামাজিক ব্যাধি। শ্রীমতী সরলাদেবী এই অন্যায় সম্বন্ধে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, অসহযোগীদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র সম্ভোগ-লালসা চরিতার্থের অভিযোগও স্বীকার করে নেওয়া যায় না। অতিশয়োক্তি অনেক সময় উদ্দেশ্যের ক্ষতি করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবও আমার মেনে নিতে কোন বাধা নেই যে নিজেদের সত্যকার স্বরাজের উপযুক্ত করতে হলে নারী ও তার পবিত্রতা সম্বন্ধে যতটা সম্মান দেখানো হয় তার চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধার ভাব পুরুষকে অর্জন করতে হবে। মিঃ এণ্ড্রুজ জ্বালাময়ী ভাষায় এই মহিলার চেয়ে অনেক বেশী বাস্তবতার সুরে বলেছেন যে বিপথগামী বোনেদের নিয়ে উল্লাস করার স্পর্ধা যেন আমাদের না থাকে। কোন অসহযোগী যদি মনে করেন যে এরকম বিপথগামিনী বোনেদের কেউ কেউ তাদেরই ভোগের জন্য নিজেদের তৈরী করে রেখেছেন আর সেই কথা সোৎসাহে আলোচনা করেন তবে তা খুব নীচ চিন্তাই হবে। আমাদের নৈতিক কল্যাণের জন্যই এরকম একটি গুরুতর বিষয়ে সহযোগী ও অসহযোগীদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। 'যতদিন একটি নারীকে আমরা আমাদের লালসার জন্য উৎসর্গ

করবো ততদিন আমাদের সব পুরুষের মাথা লজ্জায় নত হওয়া উচিত। ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টিকে লালসার বস্তু করে পশুর মত নিকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে আমি বরঞ্চ সমস্ত পুরুষজাতির বিলোপ পছন্দ করি। কিন্তু এই সমস্যা কেবলমাত্র ভারতীয় সমস্যাই নয়, এ সমস্ত বিশ্বের সমস্যা। যখন আমি আধুনিক ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ কৃত্রিমতাপূর্ণ জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে প্রচার করি এবং নরনারীকে চরকাকেন্দ্রিক সরল জীবনে ফিরে যেতে বলি তখন তা এই কারণেই বলি যে বুদ্ধিমানের মত আমরা যদি সরলতার পথে ফিরে না যাই তবে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট এক অবস্থার অবনতি থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই। নারী-স্বাধীনতা আমি তীব্রভাবেই চাই। বাল-বিবাহ আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। কোন বাল-বিধবা দেখলে আমি শিউরে উঠি। যখন সদ্য বিপত্নীক কোন লোক পাশব উদাসীনতায় আবার বিয়ে করে তখন আমি রাগে কাঁপতে থাকি। বাবা-মা যখন কন্যাদের নিরক্ষর বা অজ্ঞ রেখে কেবলমাত্র অবস্থাসম্পন্ন কোন যুবকের সাথে বিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই তাদের লালন-পালন করেন—আমি তা অন্যায় বলে মনে করি। আমার রাগ ও বিরাগ যতই হোক না কেন সমস্যার গুরুত্বটুকু আমি অনুধাবন করতে পারি। নারীর ভোটাধিকার ও আইনসম্মত সমান সুবিধা নিশ্চয়ই থাকা উচিত। কিন্তু সমস্যার সেখানেই সমাধান হয় না। নারী যখন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আলোচনায় প্রভাবিত করে তখনই হয় সত্যকার সমস্যার সুরু।

একজন সম্মানিত মুসলমান বন্ধু লণ্ডনের কোন একজন বিশিষ্ট নারী আন্দোলন-কর্মীর সঙ্গে তার আলোচনার যে মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন উদাহরণস্বরূপ আমি তারই উল্লেখ করছি। নারীর অধিকার সম্বন্ধে কোন একটি আলোচনা-সভায় একজন মুসলমানকে উপস্থিত দেখে একজন মহিলা বন্ধু অত্যন্ত বিস্মিতা হন। মুসলমান বন্ধু কি করে সেখানে এলেন—মহিলা বন্ধুর এই প্রশ্নের উত্তরে বন্ধুটি বলেন যে তার আসার দুটি মুখ্য ও দুটি গৌণ কারণ আছে। শৈশবে তার

বাবা মারা যান। জীবনের সব কিছুর জন্য তিনি তার মার কাছে ঋণী। আবার তার এমন একজন মহিলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, যিনি তার সত্যিকারের জীবনসঙ্গিনী। তার চারটি কন্যা-সন্তানই নাবালিকা—কোন পুত্র নেই এবং পিতা হিসেবে তিনি তাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। অতএব তিনি যে নারী অধিকারে বিশ্বাসী হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? তিনি আরও বললেন যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নারীর প্রতি ঔদাসীন্যের অভিযোগ করা হয়। এর চেয়ে মিথ্যা অপবাদ আর কিছু নেই। ইসলামধর্ম নারীর সমান অধিকারই দিয়েছে। তিনি মনে করেন যে পুরুষই তার লালসা চরিতার্থের জন্য নারীকে কলঙ্কিত করেছে। নারীর অন্তরের সত্তার বদলে তার দেহকেই পুরুষ অনুরাগের বস্তু করেছে, আর এই অপকৌশলে পুরুষ এতদূর সফল হয়েছে যে আধুনিকা নারী আপন দেহসৌষ্ঠবের ওপরই ভরসা করছে—এই পরাধীনতার নিদর্শনস্বরূপ তার এই দেহের পূজোকে সেও অভিনন্দন করতে সুরু করেছে। প্রায় নিরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন যে যদি তাই না হয় তাহলে পতিতা বোনেরা কি করে দেহের প্রসাধনে আনন্দ পায়? তাদের অন্তরাত্মাকে কি আমরা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করি নি? সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি আরও বললেন যে স্ত্রী-স্বাধীনতার মৌখিক স্বীকৃতিই শুধু তিনি চান না—তার মনের মধ্যে স্বেচ্ছাসৃষ্ট যে নিগড় রয়েছে তাও ভেঙ্গে ফেলতে চান এবং এই কারণেই তিনি তার কন্যাদের স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বনে উপযুক্ত করে তুলতে ইচ্ছুক।

এই ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ আলোচনাকে আর বিস্তৃত করার প্রয়োজন দেখি না। আমি আমার পত্রলেখিকাকে মুসলমান বন্ধুটির কথোপ-কথনের মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে ও সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হতে বলি। নারী যেন নিজেকে পুরুষের লালসার বস্তু বলে আর স্বীকার না করেন। পুরুষের চেয়ে নারীর পক্ষেই এর



প্রতিকার করা সম্ভব। নারীকে পুরুষের সম অধিকারিণী হতে হলে তাকে কোন পুরুষের জন্য এমনকি স্বামীর জন্যও দেহসজ্জা করতে অস্বীকার করতে হবে। দৈহিক প্রসাধনে রামকে খুসী করার জন্য সীতা কখনও এক মুহূর্ত নষ্ট করেছেন—এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।

নারীর নবজীবন লাভ

বম্বের মোরারজী গোকুলদাস হলে বম্বে ভগিনীসমাজের বাৎসরিক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধিজী বলেন—নারীর নবজাগরণ বলতে আমরা কি বুঝি তা জানা আমাদের খুবই দরকার। অবনতি না হলে উন্নতির প্রশ্ন ওঠে না। আর তাই যদি হয় তাহলে কেন ও কিভাবে তা হলো তাও আমরা বিবেচনা করবো। এসব বিষয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে আমি এই বুঝেছি যে বর্তমান আন্দোলন জনসাধারণের একটি নগণ্য অংশের মধ্যেই নিবদ্ধ। কোটি কোটি নরনারী এই আন্দোলন সম্বন্ধে অজ্ঞ। তারা এই বিরাট্ নভমণ্ডলে একটি বিন্দুর মত। এ দেশের শতকরা পুরো পচাশীজন লোকই চারদিকে কি ঘটে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকেই তাদের সময় সরলভাবেই অতিবাহিত করে। এরা অজ্ঞ হলেও তাদের জীবনের সামান্যতম কাজও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে করে। দু-পক্ষেরই সমান শিক্ষা আছে কিংবা কোন রকম শিক্ষাই নেই। একে অন্যকে যথোচিতভাবে সহায়তা করে থাকে। যদি তাদের জীবন কোন দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ হয় তাহলে অবশিষ্ট শতকরা পনের জন লোকের জীবনের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই এর কারণ নিহিত আছে। যদি ভগিনীসমাজের আমার বোনেরা আমাদের এই পচাশী ভাগ লোকের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করেন তবে সমাজের জন্য চমৎকার একটি কার্যসূচী রচনার পর্যাপ্ত উপাদান তাঁরা পাবেন।

আমি আমার মন্তব্যগুলো উল্লিখিত শতকরা পনের জনের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখবো। তবুও যে সব অক্ষমতা নরনারী দুজনের মধ্যেই আছে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে। পুরুষের তুলনায় নারীর নবজাগরণ সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমাদের লক্ষ্য। আইন

পুরুষের দ্বারাই রচিত। আজও এই স্বনির্বাচিত কর্তব্য পালনে পুরুষ সব ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ হয় নি। নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবে যে সব দুর্বলতার উল্লেখ আমাদের শাস্ত্রে আছে সেইসব দূর করার উদ্দেশ্যে নারীজাগরণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টায় অধিকাংশেরই রত থাকা প্রয়োজন। কেই বা এই চেষ্টা করবে ও কিভাবে? আমার বিনীত মত এই যে এই প্রয়াস কার্যকরী করতে আমাদের সীতা, দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর মত পবিত্র, দৃঢ়চেতা ও আত্ম-সংযত নারী তৈরি করতে হবে। যদি তা করতে পারি তবে সে রকম আধুনিকা বোনেরাও পুরাকালের পুরোধায়ীদের মত হিন্দুসমাজ থেকে একই রকম অর্ঘ লাভ করবেন। তাঁদের কথা শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞার মতই প্রতিপালিত হবে। স্মৃতিশাস্ত্রে নারীদের সম্বন্ধে ইতস্ততঃ যে সব বিরুদ্ধ মন্তব্য আছে সে সম্বন্ধে আমরা লজ্জাবোধ করবো ও খুব তাড়াতাড়ি তা বিস্মৃত হব। হিন্দুধর্মে অনুরূপ বিপ্লব আগেও ঘটেছে ভবিষ্যতেও ঘটবে—যার ফলে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস দৃঢ়তর হবে। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন এই সঙ্ঘ অবিলম্বে আমার বর্ণনা অনুযায়ী নারী তৈরি করতে পারে।

নারীর অধোগতির মূল কারণ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম ও যে আদর্শের উপলব্ধি দ্বারা নারীর বর্তমান অবস্থা উন্নত করা যেতে পারে তাও বিচার করেছি। এই আদর্শ উপলব্ধি করতে পারে এমন নারীর সংখ্যা স্বভাবতঃই অল্প। অতএব সাধারণ নারী চেষ্টা করে কতদূর অগ্রসর হতে পারে তাই আমরা এখন আলোচনা করবো। যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব নারীর মনে তাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক চেতনা জাগাবার দিকেই তাদের প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত। যাঁরা মনে করেন যে এরকম চেষ্টা শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা-বিস্তারেই সম্ভব আমি তাদের দলে নই। এই ধারণায় কাজ করলে আমাদের লক্ষ্যে পৌছান অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত হবে। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। প্রতি পদক্ষেপেই

আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে শুরুতেই কোন রকম পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়াও আমাদের নারীদের তাঁদের বর্তমান বেদনাদায়ক বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারি। নারী পুরুষের সাথী ও উভয়েরই চিন্তা-ক্ষমতা সমান। পুরুষের প্রতিটি কাজে এমনকি তার ক্ষুদ্রতম অংশেও সমানভাবে যোগ দেবার অধিকার নারীর আছে। স্বাধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার সমান অধিকারও তাঁর আছে। পুরুষ যেমন নারীও তেমনই তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্রে পুরোভাগে থাকবার অধিকারী। অতি স্বাভাবিক নিয়মেই এ হওয়া বাঞ্ছনীয়— লেখাপড়া ও ক্ষমতা অর্জনের ফলে তা হবে না। অন্যায় এক কুসংস্কারের প্রভাবে সবচেয়ে অপদার্থ পুরুষও নারীর ওপর যে আধিপত্য করে আসছে—তারা তার যোগ্য নয়। আর, এই আধিপত্য তাদের পাওয়াও উচিত নয়। নারীর এই অবস্থার জন্যই আমাদের অনেক আন্দোলন মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের অধিকাংশ কাজেই উপযুক্ত ফললাভ হয় না। কারণ আমাদের অবস্থা সেই সব ব্যাপারীর মত যে ব্যবসায়ে উপযুক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে না—পাই পয়সার হিসেব রাখতে গিয়ে টাকার হিসেবে ভুল করে।

কিন্তু যদিও লেখাপড়ার জ্ঞান ছাড়া বহু প্রয়োজনীয় ও সৎকাজ করা সম্ভব তবুও আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে ঐ জ্ঞান ছাড়া সব সময় তোমরা তা করতে পার না। এ বুদ্ধি বিকাশ করে, তীক্ষ্ণতর করে, আর আমাদের সৎকাজের বৃত্তিকে উদ্দীপিত করে। লেখাপড়ার জ্ঞানের ওপর আমি কখনও অযথা বেশী গুরুত্ব দিই না। আমি এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করছি। আমি মাঝে মাঝেই একথা বলে থাকি যে কেবল নিরক্ষরতার অজুহাতে নারীকে সমান অধিকার দিতে অস্বীকার করা কিংবা তা থেকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু নারীর পক্ষে সেইসব স্বাভাবিক অধিকারের মর্যাদা রক্ষা, উন্নতিবিধান ও প্রসার করতে সমর্থ হবার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য—আবার লক্ষ লক্ষ

জনের পক্ষে আত্মোপলব্ধি শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। সরল আনন্দে ভরা অনেক বই আছে—শিক্ষা ছাড়া আমরা সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব। অশিক্ষিত মানুষ ও পশুতে কোন তফাৎ নেই—এ অতিশয়োক্তি নয়। সুতরাং পুরুষের মত নারীর পক্ষে শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজন। শিক্ষার পদ্ধতি যে দুই ক্ষেত্রেই সমান হবে তা নয়। প্রথমতঃ আমাদের রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা ক্রটিপূর্ণ—অনেক ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকারক। নরনারী উভয়েরই এ বর্জন করা উচিত। বর্তমান ক্রটি থেকে মুক্ত হলেও আমি একে সব দিক থেকে নারীর পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করতাম না। পুরুষ ও নারী সমমর্যাদাসম্পন্ন, কিন্তু তারা অভিন্ন নয়। একে অন্যের পরিপূরক ও প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায়ক হিসেবে তারা এক অতুলনীয় দম্পতি। সেই কারণে একের অস্তিত্ব ছাড়া অপরকে কল্পনা করাও যায় না। অতএব এইসব ঘটনা থেকে অভ্রান্তভাবে এই প্রমাণিত হয় যে, যা কিছু যে কোন একজনের অমর্যাদা ঘটায় তা দু'জনেরই সমান ক্ষতি করে। নারীর জন্য যে কোন প্রকল্প রচনা করার সময় এই অবিসম্বাদী সত্য সব সময়ই মনে রাখতে হবে। বিবাহিত দম্পতির মধ্যে বহির্মুখী কাজে পুরুষই প্রধান এবং বহির্জগতের সঙ্গে সঙ্গতভাবেই তার বেশী পরিচয় থাকা আবশ্যক। অবশ্য এই নয় যে বিদ্যাকে বিশেষভাবে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে—কিংবা জ্ঞানভাণ্ডারের কয়েকটি বিভাগ এক পক্ষের জন্য বন্ধ থাকবে। কিন্তু যদি শিক্ষাদান পদ্ধতি রচনায় এই মূলগত বৈষম্যের যুক্তি উপলব্ধি না করা হয় তবে স্ত্রীপুরুষের জীবনের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের নারীদের জন্য ইংরাজীশিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না সে সম্বন্ধে আমার দু একটা কথা বলা উচিত। আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায় নারী বা পুরুষ কারুর পক্ষেই ইংরাজী শিক্ষা অপরিহার্য নয়। এটা ঠিক যে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেবার জন্য কিংবা

জীবিকার্জনের জন্য ইংরাজীর প্রয়োজন আছে। নারী জীবিকার্জনের জন্য চাকরী বা ব্যবসায়িক বৃত্তিতে লিপ্ত থাকুক এ আমি চাই না। যে ক'টি নারী ইংরাজী শিক্ষা পেতে চায় কিংবা প্রয়োজন মনে করে তারা পুরুষদের বিদ্যালয়ে গিয়ে সহজেই তা পেতে পারে। বালিকা বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন আমাদের অসহায় অবস্থাকে কেবল দীর্ঘতর করে তুলতে পারে। আমি প্রায়ই পড়ি ও বলতে শুনি যে পুরুষ ও নারী দুজনের কাছেই ইংরাজী সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়া প্রয়োজন। আমি বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে এ রকম মনোভাবেব পিছনে কিছুটা ভুল ধারণা আছে। পুরুষের জন্য এই ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত রেখে নারীদের জন্য তা রুদ্ধ রাখার বাসনা কারুরই নেই। যদি তোমার সাহিত্যপাঠের রুচি থাকে তবে পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে তোমাকে সারা বিশ্বের সাহিত্য অনুশীলনে বাধা দিতে পারে। কিন্তু যখন বিশেষ কোন সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা তৈরী করতে হয় তখন যারা সাহিত্যজ্ঞান চর্চা করতে চায় এমন কয়েকজনের প্রয়োজনই শুধু মেটাতে পারে না। আমি যখন ইংরাজী শিক্ষার জন্য এখনকার চেয়ে আরও কম সময় দেবার জন্য নারী ও পুরুষদের বলে থাকি তখন আমাব উদ্দেশ্য এই নয় যে ইংরেজী সাহিত্য পড়ে তাদেব যে আনন্দলাভের সম্ভাবনা তা থেকে তারা নিবৃত্ত হোক। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে ও পরিশ্রমে আমরা সমান আনন্দলাভ করতে পারি যদি আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে কোন পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করি। এই পৃথিবী বহু অতুলনীয় রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ কিন্তু এই সব রত্নের সবই ইংরেজীখচিত নয়। অন্যান্য ভাষাও অনুরূপ সমৃদ্ধ রচনা প্রকাশের গর্ব করতে পারে, আমাদের সাধারণ লোকদের জন্য এইসব সংগ্রহ করা উচিত এবং কেবলমাত্র তা করা যেতে পারে যদি আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এইসব রচনা আমাদের জন্য নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন।

কেবলমাত্র ওপরে বর্ণিত শিক্ষাদান প্রকল্প খসড়া রচনা করেই আমাদের সমাজ থেকে বালবিবাহের বিষময় ফল দূর করা যাবে না কিংবা নারী জাতিকে সমান অধিকার দেওয়া যাবে না। বিয়ের পরেই বস্তুতঃ যারা আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায় এমন সব মেয়েদের অবস্থা সম্বন্ধে এখন বিবেচনা করা যাক্। তারা সাধারণতঃ আবার বিদ্যালয়ে ফিরে আসে না। নিজের কন্যাদের ক্ষেত্রে বাল-বিবাহের অবর্ণনীয় ও অচিন্ত্যনীয় অন্যায় সম্বন্ধে সচেতন হয়েও তারা কন্যাদের শিক্ষাদেবার কথা কিংবা অন্য উপায়ে তাদের নিরানন্দ জীবনে বৈচিত্র্য আনার চিন্তাও করেন না। কোন পরোপকারের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে পুরুষেরা বালিকা বিবাহ করে না, বরঞ্চ নিছক কামনার জন্যই তা করে। কে এইসব বালিকাদের উদ্ধার করবে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরই নারী সমস্যার যথাযথ সমাধান দেবে। কঠিন হলেও এর একটি উত্তর আছে। স্বামী ছাড়া তার স্বার্থ রক্ষা করতে আর কেউই নেই। যে পুরুষ তাকে বিয়ে করেছে কোন বালিকাবধূ তাকে স্বমতে আনতে পারবে এ প্রত্যাশা নিষ্ফল। অতএব অন্ততঃপক্ষে এখনকার জন্যও এই কঠিন কর্তব্য পুরুষের ওপর ন্যস্ত করতেই হবে। যদি পারতাম তাহলে আমি এই বালিকাদের পরিসংখ্যান নিতাম ও বন্ধুভাবাপন্নদের খুঁজে বার করে বালিকাবধূদের ভাগ্য এইভাবে জড়িয়ে রাখা যে নীতিবিদদের গুরুতর পাপ সে সম্বন্ধে তাঁদের বোঝাবার জন্য সবিনয়ে নৈতিক আবেদন করতাম—তাদের সতর্ক করে বলতাম যে এই পাপের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয় যতদিন না তাবা আপন বধূকে শুধু সন্তানের মা না করে সেই শিশুদের যথাযথ পালনের শিক্ষা দেন ও সেই শিক্ষাদান সাপক্ষে নিজেরা সম্পুর্ণ ভাবে যৌনসংযম পালন করেন।

অতএব ভগিনী সমাজের সভ্যাদের উদ্যমকে কার্যকরী করার জন্য তাদের সামনে বহু ফলপ্রসূ কর্মপন্থা রয়েছে। কর্মক্ষেত্র এত প্রশস্ত যে যদি স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে সেই কাজে ব্রতী হওয়া যায়

তাহলে সংস্কারের জন্য বৃহত্তর আন্দোলন এখনকার জন্য অন্ততঃ স্থগিত রাখা যেতে পারে। স্বায়ত্বশাসন লাভের অধিকারের কোন রকম উল্লেখ ছাড়াই ঐ আন্দোলনের যথেষ্ট সমর্থন করা হবে। যখন ছাপার ব্যবস্থা মোটেই ছিল না ও বক্তৃতাদানের সুযোগও সীমিত ছিল—যখন এখনকার হাজার মাইলের বদলে দিনে মাত্র ২৪ মাইল ভ্রমণই কচিৎ সম্ভব হতো তখন আমাদের আদর্শ প্রচারের একটি মাত্র পথই ছিল, তা হলো আমাদের কর্ম—আর এই কর্মের শক্তি অপরিসীম। এখন আমরা ভাষণ দিয়ে খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে বায়ুবেগে ইতস্ততঃ যাওয়া আসা করছি কিন্তু তবুও আমরা লক্ষ্যের অনেক পেছনে পড়ে আছি আর হতাশার কান্নায় বাতাস ভরে উঠেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি অন্ততঃ এই মত পোষণ করি যে অসংখ্য ভাষণ ও রচনার চেয়ে আগেকার মত আমাদের কাজই জনতাকে অনেক প্রভাবিত করবে। তোমাদের সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে এর সভ্যরা যেন যে কোন রকম নীরব ও অনাড়ম্বর কাজের প্রতিই গুরুত্ব দেন।

নারীর ভুমিকা কি

একজন উচ্চশিক্ষিতা ভগিনীর লেখা কিছু কিছু বাদ দিয়ে আমি নীচে উদ্ধৃত করছি ঃ—

"আত্মার মহিমা কি? অহিংসা ও সত্যাগ্রহের ভেতর দিয়ে আপনি জগতকে তা বুঝিয়েছেন। মানুষের পশু প্রবৃত্তি কি করে জয় করা যায় সেই সমস্যার সমাধান এই দুটি কথার মধ্যেই আছে।

"আমাদের সন্তানদের আত্মনির্ভরশীল করার পক্ষে হস্তচালিত শিল্প-কেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি শুধু যে একটি সুন্দর পরিকল্পনা মাত্র তাই নয় শিক্ষার একমাত্র নির্ভুল পথও বটে। এ কথা একমাত্র আপনিই বলেছেন আর শিক্ষাসংক্রান্ত বিরাট সমস্যার এক কথায় সমাধান করেছেন। পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এর খুটিনাটিগুলো ঠিক করা যেতে পারে।

"আমাদের নারীদের সমস্যার সমাধান করে দিতে আমি আপনাকে মিনতি করি। রাজাজীর মতে নারীর কোন সমস্যা নেই, তা সম্ভবতঃ রাজ-নৈতিক অর্থে নয়। সম্ভবতঃ জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে আইন রচনা করে অর্থাৎ বৃত্তি নির্বাচনে নরনারী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু এইসব বিষয় দিয়ে এই সত্যের পরিবর্তন হবে না যে আমরা নারী—পুরুষের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের নীচ বৃত্তিগুলোকে জয় করে অহিংসা ও ব্রহ্মচর্যের অতিরিক্ত কিছু আচরণবিধির প্রয়োজন আছে। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন তার হিংসাত্মক প্রবৃত্তি, লালসা ও অপরকে ব্যথা দেবার পশুভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অহিংসা ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন তেমনই নারীর জন্য এমন কয়েকটি বিধির প্রয়োজন যা দিয়ে নারী তার মধ্যে যে নীচ প্রবৃত্তি আছে এবং যা সাধারণতঃ নারীর প্রকৃতিগত বলা হয় এবং যেগুলো পুরুষের চেয়ে আলাদা সেইসব প্রবৃত্তি জয় করতে নারী পারে। তার স্বাভাবিক গুণ ও নারীজনোচিত যে বিশেষ পদ্ধতিতে সে লালিত হয় এবং নারীর জন্য যে বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি হয়—এ সবগুলি তার পরিপন্থী। সেই কারণে এগুলি অর্থাৎ তার প্রকৃতি, তার লালনপালন পদ্ধতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার কাজের

পথে বাধা সৃষ্টি করে, ও 'যাহোক সে ত নারী মাত্র' এই অতি প্রচলিত কটু মন্তব্যের কারণ ঘটায়। নারীত্ব যেন এক দুর্বহ বোঝা—আমি এটাই বলতে চাই। আমি এও মনে করি যে নির্ভুল সমাধান ও নিজেদের বিকাশের সঠিক পদ্ধতি যদি আমাদের জানা থাকে তবে আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তি-গুলোকে—যেমন স্নেহপ্রবণতা ও কোমলতা—বাধা হ'তে না দিয়ে সহায়ক করে তুলতে পারি। পুরুষ ও শিশুর ক্ষেত্রে আপনার মতানুযায়ী ঐ উন্নতির পথের নির্দেশ নিশ্চয়ই আমাদের অন্তর থেকে আসা উচিত।

"আমি প্রকৃতি লালনপালন পদ্ধতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বলেছি। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আমার বক্তব্যকে সরল করব।

"নারী প্রকৃতি অনুসারে কোমল করুণাময়ী ও স্নেহপ্রবণ হবে কেন না সে সন্তানের জননী। তার অজ্ঞাতে এই গুণগুলো তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অতএব যখনই কিছু করতে হয় নারী খুব উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে ওঠে। পুরুষের সঙ্গে থাকা কালেও সে ভুল করতে পারে। যখন উচিত নয় তখনই সে কোমল প্রাণা হয়ে ওঠে। সে আবেগপ্রবণ হয়—সহজেই দাম্ভিকা হয়ে প্রায়ই বোকার মত কাজ করে। আপনাকে যখন আমি দেখতে এসেছিলাম—যে সাক্ষাতের জন্য আমি খুবই আগ্রহান্বিত ছিলাম—যে সাক্ষাতের বিষয় চিন্তা করতে করতে আমি কালকের রাত বিনিদ্রায় কাটিয়েছি সেই সাক্ষাতের সময় যখন আপনার সামনে আমাকে বসতে বলা হল তখন আমি শ্রীদেশাইএর প্রশস্ত পিঠের পিছনে বসে আপনাকে ভাল করে দেখতে পাইনি। ফলে আমি কিছুই শুনতে পেলাম না ও আপনার দর্শন-লাভে নিজেকে বঞ্চিতও করলাম। কি বোকার মত আচরণ হলো। উপরন্তু আমার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতেও অপারগ হলাম ও স্পষ্ট করে তা উচ্চারণ করতেও পারলাম না। আমার ভাবপ্রবণ স্বভাবই, যা সহজেই সংযমের বাইরে চলে যায়, আমার এ রকম আচরণের কারণ বলে মনে হয়। অবশ্য সঠিক নিয়ন্ত্রণে এই বিশেষ ত্রুটি সংশোধন করা যায়—কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা আমি হয়ত বা অন্য কোন ভাবে সে রকম বোকার মত কাজই করতাম।

"নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির প্রশ্নগুলোর যে উত্তর আমার একজন বন্ধু লিখেছেন তা তিনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি

নিশ্চয়ই জানেন যে প্রশ্নগুলো সংখ্যানুক্রমিক ও এই ধরণের—দেশের—আপনার অঞ্চলে নারী নিজের অধিকারে কি পরিমাণ সম্পত্তি রাখতে, অর্জন করতে, উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে, বিক্রি করতে বা দান করতে পারে? আপন যোগ্যতা অনুযায়ী নারীদের নানারকম কাজ ও জীবিকা সংগ্রহের উপযোগী শিক্ষা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারিক শিক্ষার কি কি ব্যবস্থা বা সুযোগ রয়েছে? তিনি প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর দেন নি কিন্তু আমাকে লিখেছেন যে সেই গৌরবময় অতীতে নারীরা সত্যিকারের শিক্ষা কিছুই পেতেন না এ কথা বললে বিন্দুমাত্র সত্য বলা হবে না। মনুকে উদ্ধৃত করে তিনি এও বলেছেন যে বৈদিক যুগে বিয়ের পর স্ত্রী পরিবারে সঙ্গে সঙ্গেই একটি মর্যাদার স্থান পেতেন ও পতিগৃহে তিনি যথার্থই কর্ত্রী হতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে যখন বর্তমান কালের কথা বলা হয়েছে তখন অতীতকালের রীতিব্যবস্থার উল্লেখ করার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি মৃদুস্বরে বললেন যে তার মনে হয়েছিল যে রচনার ভঙ্গিতে কিছু বলাই সুন্দর। পরক্ষণেই তিনি বেশী উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন যে শ্রীমতী অমুকের উত্তর তার চেয়েও নিকৃষ্ট হয়েছে। আমার মনে হয় নারী বলে যে উপযুক্ত শিক্ষা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন সেই শিক্ষার অভাবই আমার বন্ধুর এ রকম ভুলের কারণ। একজন কেরাণীও জানে যে যদি কাউকে কোন প্রশ্ন করা হয় তাহলে অন্য বিষয়ের ওপর লিখে তার উত্তর দেওয়া যায় না।

"নিজের বক্তব্য আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক উদাহরণ দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। বিভিন্ন প্রকৃতির নারী সম্বন্ধে আপনার বিরাট অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে ঠিক পথে চলবার মূলনীতির অভাব নারীর মধ্যে রয়েছে আমার এইকথা বলা ঠিক হয়েছে কি না।

"আপনি আমাকে হরিজন পড়তে উপদেশ দিয়েছেন। আমি আগ্রহের সঙ্গে তা পড়ি। কিন্তু এতদিন অন্তরাত্মা সম্বন্ধে আমি কোন নির্দেশ পাইনি। সুতাকাটা ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা শিক্ষার কয়েকটি ধারা মাত্র। তার মধ্যেই সমস্যার সব সমাধান আছে বলে মনে হয় না। কারণ যে সব মহিলারা সুতা কাটেন ও কংগ্রেসী আদর্শ অনুসারে কাজও করেন, তাদেরও

মারাত্মক ভুল করতে আমি দেখেছি—নারী বলেই তারা এরকম ভুল করেন এ কথাও বলা হয়।

"নারী পুরুষের মত হোক এ আমি চাই না। কিন্তু হীন প্রবৃত্তি জয় করার জন্য পুরুষকে যেমন আপনি অহিংসার শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের নির্বোধ প্রকৃতিকে দূর করতে আমাদেরও সেইরকম কিছু শিক্ষা দিন।

"আমাদের গুণের সদ্ব্যবহার কি করে করা যায়, কি করেই বা আমাদের অসুবিধেকে সুবিধায় পরিণত করা যায় অনুগ্রহ করে আমাদের তা বলুন।

"আমি যে নারী এই বোধের ভার সব সময়ই আমার মধ্যে রয়েছে। যখনই আমি কাউকে বিদ্রূপের সঙ্গে বলতে শুনেছি "যাই হোক না কেন সে নারী মাত্র" তখনই আমার আত্মা বেদনায় শিউরে ওঠে অবশ্য যদি আত্মার শিহরণ সম্ভব হয়। আমি একজন ভদ্রলোককে এই প্রসঙ্গে কিছু বলায় তিনি হেসে আমাকে বলেছিলেন "আমাদের বন্ধুর বাড়ীতে তুমি সেই শিশুটিকে দেখেছিলে? সে রেলগাড়ী গাড়ী খেলেছিল, একটি থামের সঙ্গে ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত সে ঝক ঝক করে আওয়াজ করছিল। থামটি সরাতে পারবে তার এই শিশুসুলভ ধারণায় থামটিকে ঘুরে না গিয়ে সে ক্রমাগত নিজের শক্তি দিয়ে তা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল। তোমাকে দেখে আমার তার কথা মনে হয়। তুমি যা বলছ তা মনস্তত্ত্ব মূলক। আর তুমি তা বুঝতে ও সমাধান করতে চেষ্টা করে আমাকে হাসাচ্ছ।"

নারীকল্যাণের জন্য আমার অবদান নিশ্চিত ভাবে সত্যাগ্রহ আবিষ্কারের মধ্যেই আছে—এই ভেবে আমি আত্মতুষ্টি লাভ করেছি। কিন্তু পত্র লেখিকার মতে স্ত্রীজাতির জন্য পুরুষের চেয়ে আলাদা ব্যবস্থা প্রয়োজন। যদি তাই হয় আমার মনে হয় না যে কোন পুরুষ সঠিক সমাধান খুঁজে পাবে। যতই চেষ্টা করুক না কেন সে ব্যর্থ হবেই কারণ প্রকৃতিই তাকে নারী হিসেবে আলাদা ভাবে সৃষ্টি করেছে। মইএর তলায় যে ব্যাঙ পিষে মরছে একমাত্র সেই জানে কোথায় তার যন্ত্রণা। স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে নারীকেই ঠিক করতে হবে কি তার প্রয়োজন। আমার নিজের মত এই যে মূলতঃ

পুরুষ ও স্ত্রী যখন এক তাদের সমস্যাও মূলতঃ এক হবেই। দুজনের ভিতরকার আত্মা একই। দুজনে একই প্রাণ ধারণ করে—তাদের অনুভূতিও এক। একে অন্যের পরিপূরক। একজন অন্যজনের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না।

কিন্তু এক বা অন্যভাবে পুরুষ বহুযুগ ধরে নারীর ওপর কর্তৃত্ব করে আসছে—এই কারণে নারীর মনে হীনমন্যতার জটিলতা দেখা দিয়েছে। পুরুষ নিজের স্বার্থে তাকে শিক্ষা দিয়েছে যে সে পুরুষের চেয়ে হীন তাই সে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু পুরুষের মধ্যে যাঁরা দ্রষ্টা তাঁরা নারীর সমান অধিকার স্বীকার করেছেন।

তা সত্ত্বেও এতে কোন সন্দেহ নেই যে কোন একটি বিশেষ অবস্থায় পথটি দ্বিমুখী হয়েছে। যদিও উভয়েই মূলতঃ এক, আবার এও সমভাবেই সত্য যে আকৃতিতে উভয়ের মধ্যে জন্মগত পার্থক্য আছে। সুতরাং উভয়ের বৃত্তিও পৃথক হওয়া দরকার। যে মাতৃত্বের দায়িত্ব অধিকাংশ নারীকে গ্রহণ করতেই হবে তার জন্য যে সব গুণের প্রয়োজন তা পুরুষের না থাকলেও চলে। আবার পুরুষ যেখানে সক্রিয়, নারী সেখানে নিষ্ক্রিয়। সে মুখ্যতঃ গৃহকর্ত্রী। পুরুষ আহার্য সংগ্রহ করে—নারী তা সংরক্ষণ ও বিভাজন করে। ভাষাগত অর্থেই নারী তত্ত্বাবধায়িকা। জাতির শিশুদের লালন-পালনের বিশেষ দায়িত্ব তারই ও এতে তার একচ্ছত্র অধিকার। তার যত্ন ছাড়া জাতি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হবে।

আমার মতে নারীকে গৃহত্যাগী করে সেই ঘর রক্ষা করার জন্য তাকে বন্দুক ধরতে আহ্বান করা বা প্রবুদ্ধ করা নর ও নারী উভয়ের পক্ষেই লজ্জাকর। এ অসভ্যতায় প্রত্যাবর্তন ও বিনাশের সূচনা করে। যে ঘোড়ায় পুরুষ আরোহণ করে আছে তাতে আরোহী হবার চেষ্টায় দুজনেই পড়ে যায়। নিজের সাথীকে তার বিশেষ বৃত্তি ত্যাগ করতে জোর করা বা প্রলুব্ধ করার অপরাধ পুরুষের ওপরেই পড়বে। বাইরের আক্রমণ থেকে ঘর রক্ষা করায় যে

সাহসের প্রয়োজন সেই ঘর সুশৃঙ্খল অবস্থায় পরিচালনা করতে ততখানি সাহসেরই প্রয়োজন।

১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারীতে সেবাগ্রামে গান্ধিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারী একজন আমেরিকান মহিলার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন—

> "নারীর উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমি বিশ্বাস করি। এও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নারী পুরুষের সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করে বা তার ভাবভঙ্গির নকল করে জগতে কোন অবদান করতে পারবে না। প্রতিযোগিতা সে করতে পারে কিন্তু পুরুষের ভাবভঙ্গির নকল করে সে তার অধিগম্য শীর্ষস্থানে পৌছুতে পারবে না। তাকে পুরুষের পরিপূরক হতে হবে।"

আমি লক্ষ লক্ষ কৃষককে তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে দেখেছি এবং এই ছোট্ট সেগাঁও-এ (এখন সেবাগ্রাম) তাদের রোজই যখন লক্ষ্য করে দেখি তখন কর্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক পার্থক্য আমার দৃষ্টিগোচর না হয়ে পারেনি। সেখানে কোন নারী কর্মকার বা সূত্রধর নেই। কিন্তু শস্যক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয়েই একসঙ্গে কাজ করে, যদিও কঠিন কাজগুলো পুরুষই করে থাকে। নারী সংসার পরিচালনা ও ব্যবস্থা করে। পুরুষ প্রধানতঃ আহার্য সংগ্রহ করে এবং দুজনেই অপ্রতুল আয়োজনের পরিপূরণ করে থাকে।

কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য স্বীকার করে নিলে দুজনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাধারণ গুণ ও তার অনুশীলনের চেষ্টা বস্তুতঃ এক।

ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সত্য ও অহিংসা গ্রহণ করার আহ্বানের মধ্যেই এই কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিহিত আছে। আমি এই আশা পোষণ করি যে সে বিষয়ে নারী অবিসম্বাদী নেত্রীত্ব গ্রহণ করবে আর মানবের বিবর্তনে একবার তার যোগ্যস্থান খুঁজে পেলে সে হীনমন্যতার ভাব ত্যাগ করতে পারবে। যদি সে এতে কৃতকার্য হয় তবে সবকিছুই যে যৌনপ্রবৃত্তি দিয়ে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় এই

আধুনিক শিক্ষায় বিশ্বাস করতে দৃঢ়ভাবে সে অস্বীকার করবে। ভয় হয় আমি বোধহয় আমার এই প্রস্তাব গোলমেলে করে স্থাপন করছি। কিন্তু আমি আশা করি আমার বক্তব্য পরিষ্কার হয়েছে। যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেও লক্ষ লক্ষ পুরুষ যৌন কল্পনার মোহে আচ্ছন্ন হয় কিনা তা আমি জানিনা। সমবেত ভাবে কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত কৃষকেরাও এই চিন্তায় প্রভাবিত হয় না। এটা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে তারা নর-নারীর সহজাত প্রবৃত্তি হতে মুক্ত। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আজকালকার যৌন সাহিত্যের ভারে যারা আপ্লুত তাদের জীবনে যৌন চিন্তা যে ভাবে প্রভাবিত করে এই কৃষকদের জীবনে সেভাবে করে না। প্রাণ-ধারণের কঠিন ক্লেশের রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখীন নর-নারীর এই সব চিন্তার অবকাশ থাকে না।

আমি এই সব প্রবন্ধে মন্তব্য করেছি যে নারী মূর্তিমতী অহিংসা—অহিংসা অর্থ অসীম প্রেম অর্থাৎ দুঃখ গ্রহণের অসীম ক্ষমতা। নারী—যিনি পুরুষের গর্ভধারিণী তিনি ছাড়া এই অপরিসীম ক্ষমতা আর কার আছে? নয়মাস শিশুকে গর্ভে ধারণ করে, তাকে লালন করে, প্রসব যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করে তিনি এই ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। প্রসব যন্ত্রণার চেয়ে বেশী যন্ত্রণা আর কি আছে? কিন্তু সৃষ্টির আনন্দে সে এই কষ্ট ভুলে যায়। দিনে দিনে তার শিশুর পুষ্টির জন্য কে প্রতিদিন কষ্ট স্বীকার করে? তার সেই ভালবাসা সমস্ত মানব জাতির উদ্দেশ্যে প্রসারিত হোক। কখনও সে পুরুষের কামনার বস্তু ছিল কিংবা হতে পারে তা সে ভুলে যাক। তখনই সে পুরুষের পাশে জননী, সৃষ্টিকর্ত্রী ও নীরব নেত্রীরূপে তার গৌরবময় অসন গ্রহণ করবে। যুদ্ধরত পৃথিবী যে শান্তির জন্য তৃষিত সেই শান্তির বিধান দেবার দায়িত্ব তারই। সে সত্যাগ্রহের নেত্রী হতে পারে—তার জন্য পুঁথিবিদ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস ও দুঃখবরণে সক্ষম শক্তিমাণ হৃদয়ের প্রয়োজন আছে।

কয়েক বছর আগে যখন আমি পুণার সাস্থুন চিকিৎসালয়ে রোগ শয্যায় শুয়ে ছিলাম তখন আমার স্নেহময়ী ধাত্রী একটি মহিলার গল্প আমাকে বলেছিল যিনি তার গর্ভস্থ সন্তানের জীবন বিপন্ন হবার ভয়ে ক্লোরোফর্ম নিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাকে একটি যন্ত্রণা-দায়ক অস্ত্রোপচার সহ্য করতে হয়েছিল—তার সন্তানের প্রতি ভালবাসাই তার যন্ত্রণা লাঘবের একমাত্র ওষুধ ছিল। সন্তানের জীবন রক্ষার-জন্য কোন কষ্টই তার কাছে অসহনীয় ছিল না। আপন সমাজের মধ্যে যারা এই রকম বীর রমণীর সন্ধান রাখেন সেই নারীরা যেন নিজেদের কখনই হীন মনে না করেন বা পুরুষ হয়ে জন্মান নাই বলে যেন আক্ষেপ না করেন। সেই বীর রমণীর চিন্তা সময় সময় নারীর আসন সম্বন্ধে আমাকে যে কতখানি ঈর্ষান্বিত করে তোলে তা তিনি সম্ভবতঃ জানেন না। পুরুষের নারী হয়ে জন্মাবার আকাঙ্খার পক্ষে ততখানি যুক্তি আছে যতখানি নারীর পুরুষ হয়ে জন্মাবার জন্যও আছে। কিন্তু এ আশা নিষ্ফল। যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি তাতেই যেন আমরা সুখী হই—যে কর্তব্য প্রকৃতি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন তা যেন সম্পাদন করতে পারি।

নারী ও তার কর্তব্য

প্রশ্ন—

আপনি বলেন যে 'নারীকে আপন গৃহত্যাগ করতে আহ্বান করা বা প্ররোচিত করা—আবার সেই ঘর রক্ষা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে বলা—নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অপমানকর। এ আদিম যুগে প্রত্যাবর্তন ও বিনাশের সূচনা করে।' কিন্তু শস্যক্ষেত্রে ও কারখানায় কর্মরতা লক্ষ লক্ষ নারী শ্রমিক সম্বন্ধেও কি এ প্রযোজ্য? তারা আহার্য সংগ্রহ করার জন্য গৃহস্থালী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আপনি কি শিল্পের যুগ নির্মূল করে প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে চান? এও কি আদিম যুগে ফিরে যাওয়া বা ধ্বংসেরই সূচনা নয়? যেখানে নারীকে পরিশ্রম করতে বাধ্য করার মত অন্যায় থাকবে না এমন কোন্ নয়া সমাজের স্বপ্ন আপনি দেখছেন?

উত্তর—

যদি লক্ষ লক্ষ নারী গৃহস্থালী ত্যাগ করে আহার্য সংস্থান করতে বাধ্য হয় তা অন্যায় সন্দেহ নেই কিন্তু বন্দুক ধারণ করার মত ততখানি অন্যায় নয়। পরিশ্রম করার মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে কোন অন্যায় নেই। নারী আপন গৃহকর্মে মন দিয়েও যদি স্বেচ্ছায় ক্ষেতে কাজ করেন তাতেও আমি অন্যায় কিছু দেখিনা। আমার পরিকল্পিত নয়া সমাজে প্রত্যেকেই ন্যায্য পারিশ্রমিকের জন্য সামর্থ্যমত পরিশ্রম করবে। সেই নতুন সমাজে নারী প্রধানতঃ গৃহকর্মে মনযোগী হবে—অবসর সময়ে শ্রম করবে। যেহেতু বন্দুককে আমি সেই নতুন যুগে এক অপরিহার্য অংগ বলে মনে করি না তাই এর ব্যবহার পুরুষের মধ্যেও কমে যাবে। যতদিন বন্দুকের ব্যবহার থাকবে ততদিন একে একটি আবশ্যকীয় উপদ্রব বলে সহ্য করতে হবে। কিন্তু কোন কারণেই আমি নারীকে এই অমঙ্গলের স্পর্শে আসতে দেবনা।

নারীর বিশেষ ব্রত

"বর্তমান ইউরোপীয় সঙ্কট-অবস্থা সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধগুলো আমি খুব আনন্দের সঙ্গে পড়েছি। এখন আপনি ইউরোপের উদ্দেশ্যে আপনার কথা বলবেন এ খুবই স্বাভাবিক। মানব সমাজ যখন একেবারে ধ্বংসের সীমায় এসেছে তখন আপনি নিজেকে কি করে সংযত রাখতে পারেন?

"জগৎ কি শুনবে?—এটাই প্রশ্ন। ইংলণ্ডীয় বন্ধুদের চিঠিগুলো বিচার করলে এতে কোন সন্দেহ থাকে না যে সেখানকার অধিবাসীরা সেই ভয়াবহ সপ্তাহটি এক দুঃসহ বেদনার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করেছে। একই রকম বেদনায় যে সমস্ত জগৎকেও ভুগতে হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। যে আধুনিক যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত রয়েছে পৈশাচিক অপকৌশল ও ফলস্বরূপ মাত্রাহীন নৃশংসতা ও বর্বরতা তার কল্পনামাত্র আগে কখনও না করলেও—আজ সর্বসাধারণকে নিশ্চিতভাবে চিন্তাকুল করেছে। একজন ইংরাজ বন্ধু লিখছেন—'যুদ্ধের সম্ভাবনা বন্ধ হয়েছে এই খবরে লোকে যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল—ভগবানের প্রতি প্রত্যেক হৃদয় থেকে যে কৃতজ্ঞতা উৎসারিত হয়েছিল তা আমি যতদিন জীবিত থাকবো কখনও ভুলতে পারবো না।' কিন্তু তবুও অবর্ণনীয় যন্ত্রণার ভয়, অন্তরঙ্গতম ও প্রিয় পরিজনকে হারানোর আশঙ্কা কিংবা স্বদেশকে লাঞ্ছিত দেখবার লজ্জার জন্যই কি লোকে যুদ্ধকে ঘৃণা করে? অন্য একটি জাতির লাঞ্ছনা ঘটিয়ে যে যুদ্ধের নিবৃত্তি হয়েছে তাতেই কি আমবা আনন্দিত? আর যদি এই অমর্যাদা আমাদের ওপর আসতো তাহলে কি আমরা ভিন্ন মত পোষণ করতাম? বিবাদ মীমাংসার জন্য যুদ্ধ করা ভুল এ বুঝতে পারি বলেই কি আমরা যুদ্ধ ঘৃণা করি? কিংবা এ সম্পর্কে আমাদের যে ঘৃণা তা সন্ত্রাসেরই প্রকাশ বিশেষ। যদি পৃথিবী থেকে যুদ্ধকে সত্যই নিশ্চিহ্ন করতে হয় তবে এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তব খুঁজে পেতেই হবে।

"এখন তো সঙ্কট শেষ হয়েছে কিন্তু আমরা কি দেখেছি? অস্ত্র সম্ভারের জন্য জোর প্রতিযোগিতা, আর যুদ্ধ যদি বাধে সেই উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুরুষ, অর্থ, কলাকৌশল ও বুৎপত্তি—সম্ভাব্য সব উপাদান সংগ্রহের জন্য আরও ব্যাপক ও নিবিড় ব্যবস্থাপনা। 'যুদ্ধ হবে না' বা 'যুদ্ধ চাই না' এই

দৃপ্ত ঘোষণা কোন জায়গা থেকেই শোনা যায় নি। এতে কি এই মেনে নেওয়া হয় না যে যদিও আজকের মত যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে তবুও প্রবাদে কথিত ডেমোক্লেসের তরবারীর মত তা আমাদের মাথার ওপর এখনও ঝুলছে? নারী বলেই এটা আমার কাছে বিশেষ বেদনার যে নারী তার সহজাত প্রবণতা ও বিশেষ অধিকারে জগতের শান্তি রক্ষায় যে অবদান দিতে পারতো তা সে দেয় নি। আমি যখন পড়ি বা শুনি যে উন্মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা তার পেছনে থেকে সংগ্রামের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করার জন্য স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে নারীদের সংগ্রহ করা হচ্ছে বা নারী সহায়ক বাহিনী সংগঠিত হচ্ছে তখন খুবই দুঃখ পাই। কিন্তু যখন যুদ্ধ আসে তখন এই নারীর অন্তরই ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ে—এই নারীসত্বাই অমেয় লজ্জায় লাঞ্ছিত হয়। সত্যি এ খুব দুর্বোধ্য। এই যুগ-যুগান্ত কালের মধ্যে কেন আমরা যা শ্রেয় তা বেছে নিই নি? কেনই বা আমরা বিনা প্রতিবাদে এই বীভৎস বোধহীন পশুশক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছি? আমাদের অধ্যাত্মিক বিকাশে এ এক মর্মান্তিক কটাক্ষ। আমাদের মহত্তর কর্তব্য সম্পাদনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নারী যদি হৃদয়বতী হতো ও সত্যাগ্রহের মহিমা ও শক্তি সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারতো তবে পৃথিবীতে সব কিছুই ভালো হতো।

"কেন আপনি আমাদের ভারতীয় নারীদের উদ্বুদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করেন না? আমাদের আপনার ডান হাত হিসেবে পেতে কেন আপনি মনোনিবেশ করবেন না? এই উদ্দেশ্যে আপনি একবার সারা ভারত পরিভ্রমণ করুন—এ আমি কতবার যে আশা করেছি। আমি বিশ্বাস করি যে এতে আপনি বিস্ময়কর সাড়া পেতেন। কেননা ভারতীয় নারীর অন্তর যথেষ্ট সবল—পৃথিবীতে আর কোন্ দেশের নারীর ইতিহাসে ত্যাগ ও আত্মাহুতির মহত্তর দৃষ্টান্ত আছে? আমাদের দিয়ে যদি কিছু আপনি করতেন্ তবে এই অশান্ত ও শোকগ্রস্ত পৃথিবীকে শান্তির পথ দেখাতে সম্ভবতঃ নিতান্ত সামান্যভাবে হলেও আমরা সমর্থ হতাম—কে জানে?"—একজন মহিলা।

অনেক ইতস্ততঃ করে আমি এই চিঠি প্রকাশ করলাম। নারী জাগরণে আমার ক্ষমতার ওপর পত্রলেখিকার বিশ্বাস আমাকে অযৌক্তিক আনন্দ দেয়। কিন্তু আমার ক্ষমতার সীমা বিনীতভাবেই

আমি মেনে নিই। আমার মনে হয় আমার ঘুরে বেড়াবার দিন শেষ হয়েছে। লেখার মাধ্যমে যতখানি করতে পারি তা আমি নিশ্চয়ই করে যাবো। এমনিতেই এ একটি সাধনা বিশেষ—সম্ভবতঃ এই সাধনা মহত্তম যার জন্য প্রয়োজন সর্বাধিক মার্জিত একাগ্রতা। অহিংসার সর্বোত্তম ও মহত্তম পরিচয় দেবার ব্রতই নারীর—এ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। 'কিন্তু নারীর অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করার কাজও পুরুষের ওপর কেন? পুরুষ বলে নয়, অহিংসার সমষ্টিগত প্রয়োগের একজন তথাকথিত দক্ষ প্রচারক বলেই এই আবেদন যদি কেবল আমাকেই করা হয়ে থাকে তবুও ভারতীয় নারীদের মধ্যে এই মন্ত্রের প্রচার করবার জন্য ঘুরে বেড়াবার কোন উৎসাহ আমার নেই। পত্র লেখিকাকে আমি এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে আমার মধ্যে আগ্রহের এমন অভাব নেই যা তাঁর আবেদনে সাড়া দিতে আমাকে বাধা দেয়। কেননা আমি মনে করি যে যদি কংগ্রেসের পুরুষ সভ্যরা অহিংসায় তাদের বিশ্বাস অটুট রাখতে পারেন ও অহিংসার কর্মসূচীকে নিষ্ঠার সঙ্গে যথাযথ পালন করতে পারেন তবে নারীরাও নিজে থেকেই দীক্ষিত হবেন। সম্ভবতঃ তাঁদের মধ্যে থেকে এমন কেউ এগিয়ে আসবেন যিনি, আমি যতদূর যাবার আশা করছি, তার চেয়েও অনেক বেশী অগ্রসর হতে পারবেন। অহিংসার নতুন ধারা উদ্ভাবন ও তার বলিষ্ঠ প্রয়োগে নারী পুরুষের চেয়ে বেশী সক্ষম। আত্মাহুতির জন্য নারীর সাহস পুরুষের চেয়ে সব সময়ই বেশী যেমন পশুবলের তেজে পুরুষ নারীর চেয়ে বড়ো।

নারী ও সমরস্পৃহা

ইউরোপে বহু সভায় বিশেষভাবে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে নারী কি করে সমরলিপ্সা দমন করতে সহায়তা করতে পারে? ইটালীর একটি ঘরোয়া বৈঠকে ভারতীয় নারীদের কাছে শেখবার মত এমন কিছু বিষয়ে সেখানকার নারীদের উদ্দেশ্যে বলবার জন্য গান্ধিজীকে অনুরোধ করা হয়েছিল।

প্যারিসে তিনি বলেছিলেন—"তাঁরা অবলা"—নারী যদি এটা ভুলতে পারতো তবে যুদ্ধ প্রতিরোধে পুরুষের চেয়ে তাঁরা যে অনেক বেশী কাজ করতে পারে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো যদি স্ত্রী, বোন ও মায়েরা যে কোন রকমের যুদ্ধ-আয়োজনে অংশ গ্রহণ করা বরদাস্ত করতে অসম্মত হতেন তাহলে তোমাদেব বীর সেনা ও তাদের সেনাপতিরা কি করতেন?

লৌসেনেতে তিনি বলেছিলেন—"তোমরা ইউরোপীয় নারী-জাতির উদ্দেশ্যে যে বাণী আমার কাছে চেয়েছো তা দেবার সাহস বোধ করি আমার নেই। অবশ্য তাঁরা যদি রাগ না করেন তবে আমি তাদের ভারতীয় নারী, যাঁরা এক অখণ্ড সত্তায় আগের বছর উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের অনুগামী হতে বলব। এ আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যদি ইউরোপকে অহিংসার পাঠ নিতে হয় তবে সেই শিক্ষা নারীর মাধ্যমেই নিতে হবে। আমি বিশ্বাস করি নারী মূর্তিমতী আত্মত্যাগ কিন্তু পুরুষের তুলনায় তাঁর যে কি বিরাট সুযোগ রয়েছে দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল সে বিষয়ে সে সচেতন নয়। যেমন টলষ্টয় বলতেন—পুরুষের সম্মোহন প্রভাবেই তাঁরা কষ্টভোগ করছেন। যদি তাঁরা অহিংসার শক্তি অনুধাবন করতে পারতেন তবে তাঁরা নিজেদের অবলা বলে আর স্বীকার করতেন না।

ইটালীর এক মহিলা-দলের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে অহিংসা-সংগ্রামের মাধুর্য এই যে পুরুষের মত নারীও এতে সমান অংশ নিতে পারে। হিংসাত্মক সংগ্রামে নারীর সে সুযোগ নেই। আমাদের গত অহিংস সংগ্রামে পুরুষের চেয়ে ভারতীয় নারীই বেশী কার্যকরী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। একে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। অহিংস সংগ্রামে সবচেয়ে বেশী দুঃখ বরণ করতে হয়। আর নারীর চেয়ে কে বেশী পবিত্রতার সঙ্গে ও মহৎভাবে দুঃখ বরণ করতে পারে? তখন ভারতীয় নারী পর্দা ছিড়ে দেশসেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁদের সংসার-সেবার অতিরিক্ত কিছু দেশ তাঁদের কাছে দাবী করে। তাঁরা বেআইনী লবণ আন্দোলন করেছিলেন—বিদেশী কাপড়ের দোকান ও মদের দোকানের সামনে সত্যাগ্রহ করেছিলেন—ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই উর্ভয়ের কাজ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। গভীর রাত্রিতেও তাঁরা অন্তরের সাহস ও উপচিকীর্ষা নিয়ে মদ্যপদের আড্ডার জায়গা পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা জেলে গিয়েছেন—লাঠির আঘাতও সহ্য করেছেন যা কম পুরুষেই করেছিল। পশু হবার জন্য পাশ্চাত্ত্য নারী জাতি যদি পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তাহলে ভারতীয় নারীজাতির কাছে তাঁদের শিক্ষণীয় কিছুই নেই। স্বামী-পুত্রকে নরহত্যার জন্য পাঠাবার আনন্দ ও সেইমত কাজের সাফল্যকে বীরত্ব বলে অভিনন্দিত করা তাঁদের বন্ধ করতে হবে।

ভারতীয় নারীর প্রতি

প্রসিদ্ধ ডাণ্ডি অভিযানের সময় গান্ধিজী ভারতীয় নারীজাতির উদ্দেশ্যে এই রকম আবেদন করেছিলেন—

কোন কোন বোনের এই সং যুদ্ধে যোগদান করার অধীরতা আমি একটি সুলক্ষণ বলে মনে করি। এই অধীরতা এটাই প্রমাণ করে যে লবণ-আইনের বিরুদ্ধে অভিযান যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন—এর মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ রাখা একটি টাকার বদলে একটি পয়সার মতই হবে। জনতার মাঝে তাঁরা হারিয়ে যাবেন ও যে ক্লেশ বরণের জন্য তাঁরা আকুল তার সন্ধান তাঁরা পাবেন না।

এই অহিংস যুদ্ধে পুরুষের চেয়ে তাঁদের দান অনেক বেশী হওয়া উচিত। নারীকে অবলা বলা অপমানকর—নারীর প্রতি পুরুষের এ অবিচার। যদি ক্ষমতা অর্থে পাশবিক শক্তি বোঝায় তাহলে নিশ্চয়ই নারী পুরুষের মত পশু নয়। যদি শক্তি অর্থে নৈতিক শক্তি বোঝায় তাহলে নারী পুরুষের চেয়ে অপরিমেয়ভাবে শ্রেষ্ঠ। সহজাত বোধশক্তি কি তার বেশী নয়—সে কি বেশী স্বার্থত্যাগী নয়? সহনশীলতার ক্ষমতা কি তার বেশী নয়—সে কি বেশী সাহসী নয়? নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। যদি অহিংসা আমাদের অস্তিত্বের মূলনীতি হয় তবে স্ত্রী-জাতিই ভবিষ্যৎ রচনা করবে।

কয়েক বছর যাবৎ আমি এই চিন্তাই করছি। যখন আশ্রমের মহিলারা পুরুষের সঙ্গী হবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন তখন আমার মনের মধ্যে কেউ যেন আমাকে বলে দিয়েছিল যে কেবলমাত্র লবণ-আইন অমান্য করার চেয়ে এই সংগ্রামে আরও কঠিন কাজ তারা নিশ্চয়ই করবে।

মনে হয় এখন আমি সেই কাজ খুঁজে পেয়েছি। ১৯২১ সালের আন্দোলনে পুরুষের মদের দোকান ও বিলেতী কাপড়ের দোকান

বর্জন আন্দোলন প্রথম কিছুদিন আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করেছিল, কিন্তু তবুও এই আন্দোলন ব্যর্থ হয় কারণ এর মধ্যে হিংসার অনুপ্রবেশ ঘটে। মনে যদি সত্যিকার কোন প্রভাব বিস্তার করতে হয় তবে আবার এই বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করা প্রয়োজন। যদি শেষপর্যন্ত এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ থাকে তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এইই দ্রুততম পন্থা। এ কিছু করতে বাধ্য করার নীতি নয়—বরং যুক্তি দিয়ে নৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রভাবিত করা। আর নারী ছাড়া অন্য কে বেশী মর্মস্পর্শী আবেদন করতে পারে ?

পরিশেষে আইন করে উত্তেজক পানীয় ও জিনিস ব্যবহার বন্ধ ও বিদেশী বস্ত্র বর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি প্রথম থেকেই যথেষ্ট চাপ না দেওয়া হয় তাহলে আইনও হবে না।

জাতির স্বার্থে এই দুটি যে অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় তা কেউ অস্বীকার করবে না। মাদক দ্রব্য ও মদ তাদের নৈতিক অবসাদ ঘটায় যারা এই অভ্যাসের দাস। বিদেশী কাপড় জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে বেকার করে ফেলে। প্রত্যেকটির পরিণতিতে যে দুর্দশা সৃষ্টি হয় তা ভোগ করে পরিবার—অর্থাৎ নারী। মদ্যপ স্বামীর স্ত্রীরাই জানেন যে একসময় যা শান্তি ও শৃঙ্খলার আবাস ছিল এই নেশারূপী দানব তার কি সর্বনাশই না ঘটায়। লক্ষ লক্ষ গ্রামের নারীই জানে যে বেকারত্বের ফল কি। এখনকার চরকাসঙ্ঘের সঙ্গে যেখানে একলক্ষ নারীর সংস্রব রয়েছে সেখানে এই রকম পুরুষের সংখ্যা মাত্র দশ হাজার।

ভারতীয় নারীরা এই দুটি কর্মসূচী গ্রহণ করে তাতে পারদর্শিনী হোন—তাহলে দেশের স্বাধীনতার জন্য পুরুষের চেয়ে তাঁদের দান অনেক বেশী হবে—যে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস সম্বন্ধে নারী এতকাল অজ্ঞ ছিল্ল তা তাঁদের করায়ত্ত হবে।

বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায়ী ও ক্রেতা, পানাসক্ত ও মদের কারবারীদের প্রতি মহিলাদের আবেদন তাদের হৃদয় বিগলিত না করে পারে না। আর যাই হোক না কেন, এই চার শ্রেণীর প্রতি হিংসামূলক আচরণ করবে বা করবার ইচ্ছা থাকবে, নারীজাতির সম্বন্ধে এরকম সন্দেহ কোন ক্রমেই করা যায় না। এরকম প্রতিরোধহীন ও শান্তিপূর্ণ-আন্দোলনকে সরকারও বেশীদিন উপেক্ষা করতে পারে না। এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যই হবে যে নারীই এই আন্দোলন শুরু করবে —ও পরিচালনা করবে। প্রয়োজন মত সব সাহায্য তারা পুরুষের কাছ থেকে নিতে পারে ও নেওয়া উচিতও কিন্তু নারীর সর্বাত্মক কর্তৃত্ব পুরুষকে মেনে নিতে হবে।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হাজার হাজার মহিলা এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। উচ্চশিক্ষিতারাও—আমার আবেদনে সাড়া দিলে—জনসাধারণের সঙ্গে আদর্শগতভাবে ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে সামিল হবার একটি সুযোগ পাবেন।

বিদেশী বস্ত্র বর্জন বিষয়ে অনুশীলন করলে তারা বুঝতে পারবে যে খাদি ব্যবহার ছাড়া এ অসম্ভব। মিল মালিকেরাও স্বীকার করবে যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত বস্ত্র মিল গুলিতে তৈরী করতে পারবে না। উপযুক্ত পরিবেশে আমাদের গ্রাম ও অগণিত ঘরে ঘরে খাদি বোনা যেতে পারে। সাধ্যমত প্রতিটি মুহূর্ত সূতো কাটায় নিয়োগ করে আমাদের নারী সমাজ সেই পরিবেশ সৃষ্টি করার অধিকার অর্জন করুন। খাদি উৎপাদনের অর্থই পর্যাপ্ত পরিমাণে সূতাকাটার ব্যবস্থা। মার্চমাসের গত দশদিনে ঘটনার চাপে যা আগে উপলব্ধি করিনি তক্লীর সেই কার্যকারিতা আবিষ্কার করেছি। এ সত্যিই একটি অত্যাশ্চর্য কারিগর। অন্য কোন কাজের ক্ষতি না করে নিতান্ত খেলাচ্ছলে আমার সঙ্গীরা যথেষ্ট সূতো কেটে দিনে ১২ কাউণ্টেয় চার বর্গগজ খাদি বুনেছে। যুদ্ধের উত্তম হিসেবে এর তুলনা নেই।

এই দুটি সংস্কারের নীতিগত ফল স্পষ্টতঃ খুবই বড়। রাজনৈতিক লাভও বড় কম নয়। উত্তেজক পানীয় ও মাদক দ্রব্য বর্জন অর্থ পঁচিশ কোটি টাকার শুল্কের লোকসান। বিদেশী বস্ত্র বর্জনের অর্থ ভারতের কমপক্ষে ষাট কোটি টাকা সঞ্চয়। অর্থের বিচারে এই দুটি সাফল্যই লবণ-করের প্রত্যাহারের চেয়ে বড়। এই দুটি সংস্কারের নৈতিক মূল্যায়নও অনেক।

কোন কোন বোন এই বলে প্রতিবাদ করতে পারেন যে মদ ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের মধ্যে কোন উদ্দীপনা বা কোন রোমাঞ্চ নেই। বেশ, কিন্তু তাঁরা যদি তাঁদের সমস্ত অন্তর দিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দেন তবে প্রয়োজনের অনেক বেশী উত্তেজনা ও রোমাঞ্চই তাঁরা এতে পাবেন। এমনকি আন্দোলন শেষ হবার আগেই হয়ত তাঁরা নিজেদের জেলে দেখতে পাবেন। এও অসম্ভব নয় যে তাঁরা অপমানিত হতে পারেন—-শারীরিক আঘাতও পেতে পারেন। এইরকম অপমান ও আঘাত সহ্য করাই তাঁদের গৌরব। এইরকম নির্যাতন ভোগে আন্দোলনের সাফল্য তরান্বিত হবে।

ভারতীয় নারীসমাজ যদি আমার আবেদনে সাড়া দেন তবে তাঁদের খুব শীগ্‌গিরই কাজে নামতে হবে। যদি ভারতের সব জায়গায় কাজ এখনই আরম্ভ না করা যায় তবে যে সব প্রদেশ সংগঠনে সক্ষম তারা এখনই শুরু করুক, অন্যান্য প্রদেশ খুব তাড়তাড়ি তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে।

পানাসক্তির অভিশাপ

একজন বোন লিখেছেন—

"……গ্রামে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে মদ্যপানের সর্বনাশা পরিণতির কথা শুনে আমি খুবই ব্যথিত হয়েছি। কয়েকজন মহিলা কাঁদছিলেন। তাঁরা কিই বা করতে পারেন। আমাদের মধ্যে এমন একজন মহিলা নেই যিনি চিরদিনের জন্য মদের নির্বাসন চান না। এই মদ্যপানের ফলে বেশী সাংসারিক দুঃখ, দারিদ্র্য ও দৈহিক স্বাস্থ্যহানি হয়। পুরুষের এই অমিতাচারের ফল স্বভাবতঃই নারীকে ভোগ করতে হয়। আপনিই বলুন, এইসব মহিলাদের কর্তব্য সম্বন্ধে কি পরামর্শ দিতে পারি? ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বোঝাপড়া করা সত্যিই কঠিন। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার অবিচার নিয়ে বুদ্ধি, সময় ও উৎসাহ ব্যয় না করে এই কুঅভ্যাস দূর করার জন্য আমাদের নেতারা একাগ্র চিত্ত হোন্—এ যে আমি কতো আশা করি। কিন্তু সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অবহেলা করতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে আমাদের দেশবাসীর চরিত্রের নৈতিক মান উন্নত হলে এই জাতীয় অকিঞ্চিৎকর সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজেরাই করতে পারতেন। মদ্যপানের সমস্যা সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রতি আপনি কি একটি আবেদন প্রচার করতে পারেন না? এই পাপেই যে লোকেরা সত্যি সত্যি অধঃপাতে যাচ্ছে তা দেখাও কষ্টকর।"

মাতালের প্রতি আমার আবেদন ব্যর্থ হবে এ নিশ্চিত। তারা কখনও হরিজন পড়ে না—পড়লেও অবহেলার সঙ্গে পড়ে। মদ খাওয়ার কুফল সম্বন্ধে কিছু জানবার আগ্রহও তাদের নেই। তারা এই কুঅভ্যাসকেই সমাদর করে। কিন্তু এই বোনটি ও তার মাধ্যমে আমি সব ভারতীয় নারীদের স্মরণ মনে করিয়ে দিতে চাই যে ডাণ্ডি অভিযানের সময় ভারতীয় নারী সমাজ আমার উপদেশে সাড়া দিয়েছিলেন ও মদ্যপানের বিরুদ্ধে অভিযান ও চরকা চালনায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। লেখিকা যেন স্মরণ করেন যে হাজার

হাজার নারী নির্ভয়ে মদের দোকানগুলো ঘিরে রেখেছিলেন ও পানাসক্তদের কাছে এ অভ্যাস ত্যাগ করার আবেদনে সাড়া পেয়েছিলেন। স্বেচ্ছাকৃত এই ব্রত উদযাপনে তাদের মাতালদের কাছ থেকে অনেক কুকথা—কখনও বা তাদের দ্বারা শারীরিক লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হয়েছিল। মদের দোকানের সামনে আন্দোলন করার অপরাধে শত শত মহিলা জেলে পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাদের এই উদ্দীপনাময় কাজে সারা দেশে এক চমকপ্রদ ফল দেখা দিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আইন অমান্য আন্দোলনের বিবৃতিব সঙ্গে এমন কি তার আগেই কর্মপ্রচেষ্টা কমে আসে। এর কারণ খোঁজার আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কর্ম এখনও কর্মীর অপেক্ষায় আছে। নারীর প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ রয়েছে। কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐ প্রতিশ্রুতি গৃহীত হয়নি—বস্তুতঃ সারা ভারতে মদ্যপান নিষিদ্ধ বলে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রতিজ্ঞা পালিত হবে না, কেন না নারীর ছিল মহত্তর ভূমিকা। মানুষের সৎ বৃত্তির প্রতি আবেদন জানিয়ে মদের দোকানগুলো শূন্য করাই ছিল মাদক বর্জনে নারীর ভূমিকা। এই কাজ বিরত না হলে তাদের কমনীয়তার সঙ্গে আগ্রহ মিলে নিশ্চয়ই মাতালদের কুঅভ্যাস থেকে ফিরিয়ে আনতো।

কিন্তু কিছুই বিফলে যায় নি। মহিলারা এখনও এই অভিযান সংগঠন করতে পারেন। লেখিকার উল্লিখিত মহিলারাও ঐকান্তিক আগ্রহে নিশ্চয়ই তাদের স্বামীদের মতের পরিবর্তন করতে পারেন। কল্যাণ কামনায় স্ত্রীরা স্বামীদের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তা তারা জানেন না। তারা অজ্ঞাতসারেই সেই প্রভাব বিস্তার করেন সন্দেহ নেই কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। তাদের এ বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত—এই সচেতনতাই তাদের শক্তি দান করবে—তাদের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সঠিক ব্যবহারের পথ দেখাবে। দুঃখ এই যে অধিকাংশ স্ত্রীই তাদের স্বামীর কাজে

অকাজে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তাঁরা মনে করেন যে এতে তাঁদের কোন অধিকার নেই। যেমন স্ত্রীর চরিত্রগঠনে স্বামীর অভিভাবকের অধিকার থাকে তেমনি স্বামীরও চারিত্রিক বিষয়ে স্ত্রীরও যে অভিভাবিকার ভূমিকা থাকে—এ কথা কখনও তাঁর মনেই হয় না। তবুও এর চেয়ে আর কি সরল হতে পারে যে স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকে প্রত্যেকের দোষ গুণের সমান অংশীদার। কিন্তু নারী ছাড়া স্ত্রীদের নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে কে বাস্তব ভাবে সজাগ করতে পারে? মদ্যপানের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের এ একটি অধ্যায় মাত্র।

সুশিক্ষিত এই রকম অনেক মহিলার প্রয়োজন যারা মদ্যপান বিষয়ে তথ্যগুলি কি বা এই অভ্যেসের কারণ— তার প্রতিবিধানই বা কিসে—এই সব বিষয়ের অনুশীলন করতে পারবে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের এই শিক্ষাই লাভ করা ও অনুধাবন করা উচিত যে মদ্য বর্জনের জন্য মাতালদের কাছে আবেদনই স্থায়ী ফল দেবে না। এই আসক্তিকে একটি রোগ বলে ধরে নিয়ে তার চিকিৎসা করতে হবে। অন্য কথায় কয়েকজন মহিলাকে গবেষণার ছাত্রী হিসেবে আলাদা আলাদা বিষয়ে গবেষণা করতে হবে। সংস্কার-মূলক কাজের সব বিভাগেই নিয়ত অনুশীলন—যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভুল ধারণা জন্মায়—তার প্রয়োজন। যে সব সংস্কার আন্দোলনের গুণগুলো স্বীকৃত হয়েছে সেগুলোরও আংশিক বা সামগ্রিক ব্যর্থতার মূলে রয়েছে অজ্ঞতা। কেননা, সংস্কারের আবরণে পরিচালিত সব পরিকল্পনাই সংস্কার বলে বর্ণিত হবার যোগ্য নয়।

নব দম্পতির প্রতি

হুডলিতে গান্ধী সেবাসঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশনে গান্ধিজী তাঁর নিজের পৌত্রী ও মহাদেব দেশাই-এর বোনের বিবাহ উৎসব সম্পন্ন করেন। উৎসব শেষে তিনি নবদম্পতিকে সম্বোধন করে বলেন—

"তোমরা নিশ্চয়ই জান যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যতটুকু কর্তব্য সাধনের ইচ্ছে আমাদের মনে জাগানো যায় ঠিক ততটুকু ছাড়া এ সব অনুষ্ঠানের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সময় থেকে বরাবর আমি এই মনোভাব পোষণ করে আস্‌ছি। তোমরা যে মন্ত্র আজ উচ্চারণ করলে ও যে শপথ গ্রহণ করলে তা সংস্কৃতে রচিত—অবশ্য তোমাদের জন্য তা অনুবাদ করা হয়েছে। মূলমন্ত্রটুকু আমরা সংস্কৃতে পাঠ করেছি—কারণ আমি জানি যে সংস্কৃত কথাগুলির মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে যার প্রভাবে আসতে আমাদের মন চায়।"

"বধূ সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান পুত্রের জননী হবেন—স্বামীর এই বাসনাটিও এই অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই বাসনা আমাকে বিস্মিত করে নি। এর অর্থ এই নয় যে প্রজনন বাধ্যতামূলক—এতে এই বোঝা যায় যে যদি সন্তান লাভ কাম্য হয় তা হলে যথাযথ ধর্মীয় অনুভূতিসহ অনুষ্ঠিত বিবাহ অত্যাবশ্যক। সন্তানলাভের বাসনা যার নেই তার বিবাহ করা উচিত নয়। যৌন ক্ষুধাতৃপ্তির জন্য বিবাহ—বিবাহ নয়। এ ব্যভিচার মাত্র। অতএব আজকের উৎসবের অর্থ এই যে উভয়েরই যখন সন্তানলাভের বাসনা বলবতী হয় একমাত্র তখনই সহবাস সমর্থনযোগ্য। এই ধারণা আবিলতামুক্ত। অতএব এ প্রক্রিয়াটি উপাসনার মনোভাব নিয়ে করা উচিত। ইন্দ্রিয় লালসা ও উত্তেজনা বাড়াবার জন্য প্রচলিত পূর্বরাগের পরিকল্পনা এতে নেই। সন্তানের ইচ্ছা আর না থাকলে এ রকম মিলন জীবনে একবার মাত্রই হতে পারে। যারা দেহ ও মনে স্বাস্থ্যবান নন তাদের দৈহিক মিলনের প্রয়োজনীয়তা নেই—এবং যদি মিলিত হন তবে তা ব্যভিচার। পাশবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বিবাহ—এই শিক্ষাই যদি তোমরা পেয়ে থাক তবে তা ভুলে যাওয়াই উচিত। এ কুসংস্কার মাত্র। পবিত্র

অগ্নিদেবতার সামনে সমস্ত উৎসব কাজ সম্পন্ন হয়েছে—সেই অগ্নিতে তোমাদের ভিতরকার সকল কামনা ভস্মীভূত হোক্।"

"বর্তমানে বহুপ্রচলিত একটি অন্ধ সংস্কার দূর করতে আমি তোমাদের বলি। এই কথাই বলা হয়ে থাকে যে সংযম ও নিবৃত্তি ভুল ও যৌনক্ষুধার যে কোন প্রকার তৃপ্তি সাধন ও অবাধ ভালবাসা অত্যন্ত স্বাভাবিক জিনিষ।"

"এর চেয়ে সর্বনাশা কুসংস্কার আর নেই। আদর্শলাভে তুমি অসমর্থ হতে পার। তোমার রক্ত মাংসে গড়া শরীর দুর্বল হতে পারে কিন্তু তা বলে আদর্শকে ছোট করো না। অধর্মকে ধর্মের স্থান দিও না। আমি যা বললাম দুর্বল মুহূর্তে তা মনে রেখো। মহিমাব্যঞ্জক এ উৎসবের স্মৃতি তোমাদের সহজেই অবিচলিত ও সংযত করতে পারবে। পাশবিক ক্ষুধার প্রশমন ও দমনই হ'লো বিবাহের প্রধান লক্ষ্য। প্রজননের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যদি বিবাহ সংঘটিত হয় তবে সে অনুষ্ঠানে কিছু মাত্র পবিত্রতা থাকে না।"

"সমভাবে বন্ধুর মত তোমরা বিবাহে মিলিত হলে! যদি পতিকে "স্বামী" বলা যায় তাহলে পত্নীকে "স্বামিনী" বলা যেতে পারে—একজন আরেকজনের প্রভু, একে অপরের সাথী ও জীবনের চলার পথে কর্তব্য ও দায়িত্বপালনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে। ছেলেদের আমি বলব যদি তোমরা উন্নততর বিচার শক্তি ও সমৃদ্ধতর ভাবাবেগের অধিকারী হও তাহলে তোমাদের বান্ধবীদের মধ্যেও তা সঞ্চারিত কর। তাদের আদর্শ শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হও; তাদের সাহায্য কর ও সুপথে চালনা কর; কখনও তাদের প্রতিবন্ধকতা করো না বা তাদের বিপথে নিও না। চিন্তায়, কথায় ও কাজে তোমাদের মধ্যে যেন সম্পূর্ণ ঐক্য বজায় থাকে! পরস্পরের মধ্যে যেন কোন গোপনীয় কিছু না থাকে—তোমরা যেন একাত্ম হতে পার।"

"কপটাচারী হ'য়ো না। সাধ্যাতীত কিছু করবার বৃথা প্রয়াসে স্বাস্থ্য-হানি করো না। সংযম স্বাস্থ্যহানি করে না। যা স্বাস্থ্যহানিকর তা সংযম নয় —বাহ্যিক আত্মনিপীড়নই স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। যথার্থ সংযত ব্যক্তি প্রতিদিন নববলে বলীয়ান হন, এবং উত্তরোত্তর শান্তিলাভ করেন। চিন্তায় সংযমই আত্মসংযমের প্রথম পদক্ষেপ। নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হও ও যতটুকু

সাধ্যে কুলায় ততটুকুই কর। তোমাদের সামনে আমি আদর্শ যথাযথভাবেই তুলে ধরেছি। ন্যায়ের পথে এগিয়ে যাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। যদি সফল নাও হও তা হলেও লজ্জা বা ক্ষোভের কোন কারণ নেই। আমি সরলভাবে এই বুঝিয়েছি যে 'উপনয়ন' যেমন একটি পবিত্র সংস্কার ও নব জন্মলাভ সেরকম বিবাহও একটি পবিত্র অনুষ্ঠান ও নতুন জীবনের সূচনা। আমি যা বললাম তা যেন তোমাদের শঙ্কিত বা দুর্বল না করে। চিন্তায়, কথায় ও কাজে সম্পূর্ণ সঙ্গতি লাভের চেষ্টা কর। সর্বদা নিজের চিন্তাকে অনাবিল রাখার চেষ্টা কর—তাহলেই সব কিছুর মঙ্গল। মনের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছুই নেই। বাক্য চিন্তারই ফল এবং কর্ম বাক্যের। এ পৃথিবী মহতী চিন্তাধারার ফলস্বরূপ এবং চিন্তা মহৎ ও নিষ্পাপ হলে তার পরিণতিও মহান ও নিষ্পাপ হবে। সুতরাং আমি এই চাই যে তোমরা এখান থেকে চলে যাবার সময় এক মহান আদর্শের বর্মে সুরক্ষিত হয়ে এগিয়ে যেতে পার। তাহলে আমি তোমাদের এ আশ্বাস দিতে পারি যে কোন প্রলোভনই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না—কোন আবিলতা তোমাদের স্পর্শ করবে না।"

"যে সব অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা তোমাদের কাছে করা হল তা মনে রেখো। মধুপর্কের মত সাধারণ অনুষ্ঠানের কথাই ধর না কেন। অন্য সকলে তাদের প্রাপ্য অংশ নেবার পর তুমি যদি সে অমৃত বা মধুর অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ কর তবে দেখবে যে সমগ্র বিশ্ব মধুময়—অমৃতময়। এর অর্থ এই যে ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করতে হয়।"

তখন দু'জন বরের একজন প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু যদি সন্তানলাভের কোন বাসনা না থাকে তা হলে কি বিবাহ করা উচিত নয়?"

"নিশ্চয়ই নয়। কামনাহীন বিবাহে আমি বিশ্বাসী নই। অবশ্য কদাচিত কখনও কখনও এমন ঘটে থাকে যে কোন রকম শারীরিক সম্ভোগ ছাড়াও শুধুমাত্র নারীকে রক্ষা করবার জন্যই পুরুষেরা বিবাহ করছে। কিন্তু এ রকম দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই খুবই বিরল। আদর্শ দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে আমি যা লিখেছি তা তোমাদের নিশ্চয়ই পড়া উচিত। মহাভারতে আমি যা পড়েছি তা সর্বদা আমাকে প্রভাবিত করছে। সেখানে ব্যাসদেব কর্তৃক 'নিয়োগ' প্রথার কথা বলা হয়েছে। তিনি

সুপুরুষ বলে বর্ণিত হন নি বরং তার বিপরীতই ছিলেন। তাঁর মূর্তি ভয়ঙ্কর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কামনার উদ্রেক করে এমন কোন আচরণও তিনি করেন নি, শুধু মিলনের আগে তিনি তাঁর সর্বাঙ্গ ঘৃত-লিপ্ত করেছিলেন। কামচরিতার্থের জন্য নয় বরং সন্তান উৎপাদনের জন্যই তিনি সঙ্গম করেছিলেন। সন্তান কামনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং একবার সেই ইচ্ছা পুরণ হলে পুনরায় সঙ্গম করা উচিত নয়।"

"প্রথম সন্তানকে 'ধর্মজ' অর্থাৎ কর্তব্যবোধে জাত এবং প্রথম সন্তান ছাড়া আর সব সন্তানদের 'কামজ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লালসাসম্ভূত সন্তান বলে মনু বর্ণনা করেছেন।"

"যৌন সম্পর্কের সকল বিধান সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ ঈশ্বর পরম বিধান ছাড়া আর কী? ঈশ্বর-আজ্ঞা পালন অর্থই নৈতিক অনুশাসন পালন। মনে রেখো, তোমাদের তিনবার একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে—'আমি কোন প্রকারেই অনুশাসন লঙ্ঘন করব না।' যদি মুষ্টিমেয় কয়েকটি পুরুষ ও নারী এই অনুশাসন পালনে প্রস্তুত থাকতেন তাহ'লে সাহসী ও সত্যাশ্রয়ী স্ত্রী-পুরুষে মিলিত একটি জাতিও নিশ্চয়ই গড়ে উঠতো।"

"মনে রেখো 'বা'র প্রতি কামাতুর দৃষ্টিপাতে বিরত হবার পর থেকেই প্রকৃতভাবে আমার দাম্পত্য জীবনকে উপভোগ করতে আরম্ভ করেছি। আমার পুর্ণস্বাস্থ্য ও যৌবনের মধ্যাহ্নকালেই আমি সংযমের দীক্ষা নেই, যদিও সাধারণভাবে বিবাহিত জীবনকে উপভোগ করার তারুণ্য তখন আমার যথেষ্টই ছিল। আমি যেন বিদ্যুতালোকে দেখতে পেলাম যে অন্যের মত আমিও একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জন্মেছি। বিবাহের সময় এ উপলব্ধি আমার ছিল না। কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে আমি অনুভব করলাম যে, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করেছি বিবাহ যেন তার পরিপুরক হয়—সে বিষয়ে আমার লক্ষ্য রাখতে হবে। এর পরই হৃদয়ঙ্গম করলাম—প্রকৃত ধর্ম কী? ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করার পরই যথার্থ সুখ আমাদের জীবনে আসে। দৃশ্যতঃ ক্ষীণকায়া হলেও 'বা'র শারীরিক গঠন সুন্দর এবং তিনি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করেন। কেবলমাত্র আমার কামনার ভোগ্যবস্তু হলে তিনি কখনই এত পরিশ্রম করতে পারতেন না।"

"কিন্তু তবুও কয়েক বছর আমি দাম্পত্য জীবন যাপন করেছি—এই অর্থে আমার বিলম্বে জ্ঞানোন্মেষ হয়েছে বলা যায়। সময় থাকতে তোমাদের সচেতন করা হয়েছে—এ বিষয়ে তোমরা ভাগ্যবান্। আমার বিবাহ-কালীন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী যতদূর সম্ভব প্রতিকূল ছিল কিন্তু তোমাদের কালে তা খুবই অনুকূল। আমি কিন্তু একটিমাত্র জিনিষের অধিকারী ছিলাম যা আমাকে পার করে দিয়েছে। তা হ'ল সত্যের ধর্ম। এ আমাকে রক্ষা করেছে এবং উদ্ধার করেছে। সত্যই আমার জীবনের পরম ভিত্তি। ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা পরে সত্য থেকে জন্মলাভ করেছে। সুতরাং যা কিছুই কর না কেন নিজেদের কাছে ও জগতের কাছে সত্যপরায়ণ হও। কোন চিন্তাই গোপন করো না। যা প্রকাশ করা লজ্জা-কর তা চিন্তা করা আরও লজ্জাজনক।"

চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত

প্রকাশকের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে উইলিয়ম আর. থারসটন যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর একজন মেজর ছিলেন ও প্রায় দশ বছর তিনি ঐ চাকরী করেছিলেন। এই কয়েক বছরের মধ্যে তিনি চীন ও পৃথিবীর অনেক জায়গা সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর ভ্রমণকালে তিনি বিবাহ আইন ও রীতিনীতির পরিণাম সম্বন্ধে অনুশীলন করেছেন ও সেই কারণে বিবাহ সম্বন্ধে একটি বই লিখবার তাগিদ অনুভব করেছেন। নিউইয়র্কের টিফনী প্রেস থেকে গতবছর প্রকাশিত বড় বড় হরফে লেখা বত্রিশ পৃষ্ঠার "থারসটনস্ ফিলজফি অফ ম্যারেজ" নামে এই বইটি এক ঘণ্টায় পড়ে ফেলা যায়। লেখক বিস্তারিত তর্কজালের অবতারণা করেন নি। শুধু তাঁর সিদ্ধান্তগুলো যাকে প্রকাশক "চমকপ্রদ" বলেছেন কেবল সেগুলোই দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্তগুলো ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, চিকিৎসকের কাছে পাওয়া তথ্য, সামাজিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গাণিতিক পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে লেখা—একথা গ্রন্থকার তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তগুলো এই রকম—

(১) এ কখনই প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল না যে একজন নারী সারা জীবনের মত একই পুরুষের কাছে বাঁধা থাকবে—তার ভরণ-পোষণ সংস্থানের জন্য বা সন্তান ধারণের স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করার জন্য—রাত্রির পর রাত্রি গর্ভাবস্থায় বা অন্য সময়ে তাকে ঐ পুরুষের সঙ্গে একই শয্যার সঙ্গিনী কিংবা একই ঘরের অংশীদার হতে হবে।

(২) বর্তমান বিবাহ বিধি ও প্রথার ফলস্বরূপ পুরুষ ও নারীর দিনরাত্রি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অসংযত যৌনসংগমে প্ররোচিত করে—যা পুরুষ ও নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোর বিকৃতি ঘটিয়ে বিবাহিতা নারীদের শতকরা নব্বুই জনকেই আংশিকভাবে বেশ্যায় পরিণত করে। এইরকম অবস্থা দেখা দেওয়ার কারণ এই যে বিবাহিতা নারীদের মনে এই ধারণাই

জন্মান হচ্ছে যে তাদের এই বেশ্যা-জীবন যাপন স্থায়সম্মত ও স্বাভাবিক কেননা এ আইনসম্মত ও স্বামীর সোহাগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়োজন।

এরপর লেখক ক্রমাগত অসংযত যৌন সংযমের যে ফল বর্ণনা করেছেন নীচে তার সংক্ষিপ্তসার দিচ্ছি—

(ক) এ নারীর স্নায়ুকে অত্যন্ত দুর্বল করে অকালবৃদ্ধা, রোগাক্রান্তা, বিরক্তমনা, চঞ্চল, অসুখী ও সন্তানদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে অক্ষম করে তোলে।

(খ) দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে এ অবাঞ্ছিত বহু সন্তান সৃষ্টি করে।

(গ) ধনীদের মধ্যে অসংযত যৌনসঙ্গম গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যেস সৃষ্টি করে। জন্মনিয়ন্ত্রণ বা অন্য কোন নামে জন্মনিরোধের পথগুলো যদি সাধারণ শ্রেণীর নারীদের অনেককে শেখানো হয় তাহলে জাতি ক্রমে ক্রমে রোগাক্রান্ত, নীতিভ্রষ্ট ও পাপাচারী হয়ে শেষ কালে ধ্বংস হয়ে যাবে।

(ঘ) অতিরিক্ত যৌনসঙ্গম পুরুষের সৎভাবে জীবিকার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনীশক্তিও বিনষ্ট করে। বর্তমানে আমেরিকায় বিপত্নীকের চেয়ে প্রায় ২,০০০,০০ জন বেশী পতিহীনা আছেন। এঁদের মধ্যে যুদ্ধে স্বামী হারিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা তুলনায় কম।

(ঙ) আধুনিক বিবাহিত জীবনে অবশ্যম্ভাবী অতিরিক্ত যৌন সহবাস পুরুষ ও নারী উভয়ের মনেই ব্যর্থতাবোধ সৃষ্টি করে। বড বড় সহরের বস্তিগুলোতে আজকাল যে দৈন্য দেখা যায় তা আধুনিক বিবাহ বিধি ও আনুষঙ্গিক মাত্রাতিরিক্ত ও অসংযত যৌন আচরণের ফল।

(চ) মানব জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো গর্ভাবস্থায় সঙ্গম।

এর পর চীন ও ভারত সম্বন্ধে যে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে তার ভেতর আমার যাবার দরকার নেই। বইটির অর্ধেক এতেই ভরা—বাকী অর্ধেক আছে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা।

প্রতিবিধানের মূল বক্তব্য এই যে স্বামী-স্ত্রী সব সময় আলাদা ঘরে অর্থাৎ আলাদা বিছানায় নিশ্চয়ই শোবেন—দুজনেই, বিশেষ

করে স্ত্রী, সন্তান কামনা করলে তখনই একত্রিত হবেন। বিবাহ আইনের যে সব সংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে আমি তা বলতে চাই না। পৃথিবীর সর্বত্র বিবাহের একটি নিদর্শন দেখা যায়—তা হলো একই ঘরে একই শয্যা—লেখক মাত্রাধিক সাহসে কঠোর ভাষায় এর নিন্দে করেছেন যদিও এই নিন্দে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করতে আমি ভয় পাই না। বিবাহিতেরা একই ঘরে একই শয্যার সঙ্গী হবেন—ধর্মে সমর্থিত এই কুসংস্কারই স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার কারণ—এতে কোন সন্দেহ নেই। এ এমন একটি মনোভাব এনেছে যায় বিষময় ফল সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের মাঝে বাস করে বিচার করা কঠিন।

আমরা আগেও দেখেছি যে লেখক একইভাবে জন্মনিরোধ ব্যবস্থারও বিরোধী। তাঁর প্রস্তাবিত অন্যান্য বিধানগুলোর, আমার মতে, আমাদের কাছে কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই—বিশেষ করে এর জন্য আইনের অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী এই প্রতিজ্ঞা আজই করতে পারেন যে তাঁরা রাত্রিতে এক ঘরে বাস করবেন না বা এক বিছানায় শোবেন না—যে একটি উদ্দেশ্যেই মানুষ ও পশুর উভয়ের জন্য মিলনের ব্যবস্থা প্রকৃতি করেছেন তা ছাড়া তাঁরা ঐ যৌনকার্যে লিপ্ত হবেন না।

পশুর এই বিধান মানবার বিষয়ে কখনই ব্যতিক্রম হয় না। মানুষদের বেলায় ইচ্ছেমত কাজ করবার সুযোগ আছে বলেই সে ইচ্ছেমত কাজ করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে। সব স্ত্রীই জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কোন রকম কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারে। নরনারী উভয়েরই জানা উচিত যে যৌনক্ষুধা তৃপ্তি থেকে বিরত থাকলে রোগ সৃষ্টি হয় না বরং তা স্বাস্থ্য ও শক্তি দান করে অবশ্য যদি দেহের সঙ্গে মনের মিল থাকে। লেখক বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীতে অমঙ্গলের অধিকাংশই আধুনিক বিবাহবিধির জন্যই ঘটে থাকে। প্রস্তাবিত শেষ দুটি সিদ্ধান্তে আসবার জন্য

লেখকের এই গোঁড়া বিশ্বাসে আমার অংশ নেবার দরকার নেই। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে নরনারীর সম্পর্ককে আমি স্বাস্থ্যসম্মত ও নির্মল বলে মনে করি ও নিজেদের যদি ভবিষ্যৎ বংশধরদের নৈতিক কল্যাণের অছি বলে মনে করি তবে বর্তমান দুঃখদুর্দশার অনেকটাই দূরীভূত হবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহী

যে বৃদ্ধ কৃষকটি গরীবের সেবায় তাঁর সব দিয়েছিলেন—শ্রীমতী হাউ মার্টিন ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্ত। তিনি ইংলণ্ডের একজন জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহী—ভারতের দীনজনের ত্রাণে তাঁর অমৃত-বাণী নিয়ে গান্ধিজীর মত পরিবর্তন করতে বা নিজেই মতান্তরিত হতে এসেছিলেন। অবশ্য তিনি এই প্রথম ভারতবর্ষে এলেন এবং এখানকার দরিদ্র জীবনের কিছুই দেখেন নি। তাই তিনি ইংলণ্ডের বস্তি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। শক্তিমান পুরুষের কাছে দুর্বলা নারীর আত্মসমর্পণের বিপক্ষে জোরাল যুক্তির অবতারণা করলেন।

তাঁর যুক্তির প্রথম অবতারণায়ই গান্ধিজী প্রতিবাদ করলেন—"দুর্বলা নারী বলে কেহই নেই। নারী দরিদ্র হলেও পুরুষের চেয়ে শক্তিশালিনী—যদি তুমি ভারতের গ্রামগুলোতে আস তবে তোমাকে তা প্রমাণ করতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সেখানে যে কোন নারীই তোমাকে বলবে যে যদি সে অনিচ্ছুক হয় তবে এই নারীরই গর্ভজাত পুরুষের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে বাধ্য করতে পারে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের অভিজ্ঞতা থেকেও আমি এটা বলতে পারি। আমারটাই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। নিজেকে সমর্পণ করার চেয়ে মৃত্যু যদি বরণ করতে হয় তাহলেও কোন পশুই নারীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারে না। না, এটা পরস্পরের সম্মতি সাপেক্ষ। নারী ও পুরুষ—দুজনের মধ্যেই আছে পশুত্ব ও দেবত্বের সংমিশ্রণ। এই পশুভাবকে যদি আমরা বশ করতে পারি তবেই হবে সকলের কল্যাণ।"

"কিন্তু বেশী সন্তানের দায়িত্ব এড়াবার জন্য স্বামী যদি পরনারীর কাছে যায় তাহলে স্ত্রীর কি করবার আছে?"

"তাহলে এখন তুমি তোমার নিজের যুক্তিই পরিবর্তন করছ। সুরুতেই তুমি যদি ভুল কর তাহ'লে তুমি ভুল সিদ্ধান্তে আসবেই আসবে। কোন কিছু অনুমানের ওপর নির্ভর করে না। পুরুষকে পুরুষ ও নারীকে নারী বলেই মেনে নিতে চেষ্টা করো। তোমার অভ্রান্ত নীতির মূল সূত্রটি আমায় বুঝতে দাও। তোমার জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচারই তোমার যথেষ্ট পরিচয় বলে যখন আমি বলেছিলাম তখন সেই পরিহাসের মধ্যে কিছু গুরুত্ব ছিল—কারণ আমি জানি যে বেশ কিছু নরনারী আছেন যাঁরা মনে করেন যে জন্মনিরোধেই আমাদের পরিত্রাণ। অতএব তোমার কাছে এর মূলসূত্র জানতে ইচ্ছে করি।"

শ্রীমতী হাউ মার্টিন বললেন—"অবশ্য এর দ্বারাই জগতের পরিত্রাণ ঘটবে আমি তা মনে করি না। কিন্তু আমি এ কথাই বলি যে কোন না কোন প্রকারে জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া আমাদের রক্ষা নেই। আপনি একভাবে এর প্রয়োগ করতে চান—আমি অন্যভাবে চাই। আমি আপনার মত সমর্থন করি কিন্তু সবক্ষেত্রে নয়। একটি রমণীয় কাজকে যেন আপনি গর্হিত বলে মনে করছেন। নতুন প্রাণ সৃষ্টির সময় দুটি পশুও যেন দেবতার মত হয়ে ওঠে। এই সৃষ্টিক্রিয়াতে অত্যন্ত সুন্দর একটা কিছু আছে।"

গান্ধিজী বললেন—"আবার তুমি একটা ভুল ধারণা নিয়ে বৃথা পরিশ্রম করছো। নবজন্ম সৃষ্টি যে প্রায় ঐশ্বরিক কিছু তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমি চাই যে স্বর্গীয় ভাব নিয়ে যেন লোকে একাজে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ নবজন্ম সৃষ্টির ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন কামনার বশবর্তী না হয়ে নরনারীর মিলন হওয়াই উচিত। কিন্তু কেবলমাত্র সোহাগময় আলিঙ্গন লাভের জন্যই যখন তারা পরস্পরের কাছে আসে, তখন তারা প্রায় পশুর মত হয়ে ওঠে। মানুষ যে দেবতারই নিকটতম এ কথাটা দুঃখের বিষয় সে ভুলে যায়। নিজের পশুপ্রবৃত্তির দিকে লালায়িত হয়ে সে পশুর চেয়েও হীন হয়ে যায়।"

"কিন্তু কেনই বা আপনি পশুভাবের নিন্দা করেন?"

"আমি করি না। পশু তার প্রকৃতিগত ধর্ম পালন করে। সিংহ তার নিজ মর্যাদায় মহীয়ান এবং আমাকে উদরস্থ করার সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে, কিন্তু নখদাঁত সৃষ্টি করে তোমাকে আঘাত করার কোন অধিকার আমার নেই। তাহলে যে আমি নিজেকেই হেয় করব ও পশুর চেয়ে অনেক—অনেক হীন হব।"

শ্রীমতী হাউ মার্টিন বললেন—"নিজেকে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে না পারায় আমি দুঃখিত। আমি স্বীকার করি, অনেক ক্ষেত্রে এই জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিত্রাণের সহায়ক নয়—কিন্তু উন্নততর জীবনের সহায়ক। আমি কি বলতে চাই নিশ্চয়ই আপনি তা বুঝেছেন—যদিও আমি আমার বক্তব্য আপনার কাছে খুব পরিষ্কার করে বলতে পারিনি।"

"না, না,—আমি তোমার সম্বন্ধে কোন অন্যায় সুবিধা নিতে চাই না। তবু আমার অভিমত তোমাকে বোঝাতে চাই। কতগুলো ভুল ধারণা নিয়ে চলে যেও না। মানুষকে দুটি পথের একটি নিশ্চয়ই বেছে নিতে হবে—হয় সে পথ উপরের দিকে কিংবা নিচের। কিন্তু তার মধ্যে পশুভাব থাকায় সে নিচের দিকই বেছে নেয়, বিশেষতঃ সেই নিচুদিক যখন তার সামনে রমণীয় হয়ে ফুটে ওঠে। পুণ্যের আচরণে পাপ দেখা দিলে মানুষ সহজেই সেখানে হার মানে —ম্যরিষ্টপম্ ও অপর সকলে ঠিক এই-ই করছেন। অসংযমের বাণী যদি আমি প্রচার করতাম তা হলে আমি জানি যে মানুষ তা সহজেই আঁকড়ে ধরতো। আমি জানি যে তোমার মত নিঃস্বার্থ আগ্রহে জনসাধারণ যদি তোমার নীতি জোর গলায় ঘোষণা করতো —তবে তুমি দৃশ্যতঃ হয়ত জয়লাভ করতে। কিন্তু আমি এও জানি যে তুমি যা সর্বনাশ করছ সে সম্বন্ধে তুমি অজ্ঞ থেকেই নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। অধোগতির আবেগ সৃষ্টির জন্য কোন প্রচারের প্রয়োজন নেই—কোন যুক্তিরও নয়। এর আবেগ এর

মধ্যেই নিহিত আছে—আর একে যদি তুমি সংযত না কর তা হলে রোগ ও মহামারীর ভয় আছে।”

শ্রীমতী হাউ মার্টিন যিনি এতক্ষণ পর্যন্ত দেবভাব ও পশুভাবের পার্থক্য মেনে নিয়েছিলেন তিনি হঠাৎ মন্তব্য করলেন—“বস্তুতঃ এমন কোন পার্থক্য নেই, আর সাধারণতঃ যতটা ভাবা হয়ে থাকে তার চেয়ে এদের মধ্যে অনেক বেশী মিল আছে। বাস্তাবিকই সকল জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির মূলেই এই নিকটতার সূত্র আছে—যদিও এর অতি উৎসাহীরা ভুলে যান যে এই নৈকট্যের মাঝেই আছে তাদের যুক্তির চরম দুর্বলতা।”

“তুমি কি তা হলে দেবত্ব ও পশুত্বকে এক বলে মনে কর? তুমি সূর্যালোকে বিশ্বাস করতে? এবং তাই যদি কর তাহলে এও নিশ্চয়ই মান যে অন্ধকারও আছে?” গান্ধিজী এ প্রশ্ন করলেন।

“অন্ধকারকে আপনি পশুত্ব বলেন কেন?”

“ইচ্ছে করলে তুমি এ অবস্থাকে ঈশ্বরহীন বলে মনে করতে পার।”

“অন্ধকারে ভগবান নেই বলে আমি মনে করি না। সর্বত্রই প্রাণ আছে।”

“প্রাণের অস্তিত্বহীনতার একটা অবস্থা আছে। তুমি কি জান যে জীবন প্রাণহীন হওয়া মাত্র হিন্দুরা প্রিয়জনের দেহ ভস্মীভূত করে? সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই মূলতঃ একটি ঐক্য আছে আবার বৈচিত্র্যও আছে—সেই বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান করতে হবে—তবে সেই সন্ধান কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা নয় যা তুমি করতে চাইছো। যেখানে সত্য আছে সেখানে অসত্যও আছে—ও থাকবে। যেখানে আলো, সেখানেই আঁধার। তোমার যুক্তি, বুদ্ধি ও দেহকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে না আনা পর্যন্ত তুমি বৃহত্তর আত্ম-চেতনা লাভ করতে পারবে না।”

শ্রীমতী হাউ মার্টিন বিহ্বলভাবে চেয়ে রইলেন এবং সময়ও তার প্রতিকূলে অতিবাহিত হতে লাগলো। কিন্তু গান্ধিজী

বললেন—"না, আমি তোমাকে আরও সময় দিতে রাজী আছি। কিন্তু সেজন্য নিশ্চয়ই তুমি ওয়ার্ধায় এসে আমার সাথে থাকবে। তোমার মত আমিও এ ব্যাপারে একজন উৎসাহী। হয় আমাকে কিংবা নিজেকে মতান্তরিত না করা পর্যন্ত তোমার ভারতবর্ষ ত্যাগ করা চলবে না।"

পূর্বনির্দিষ্ট অন্যান্য কাজের তাগিদে যে উদ্দীপনাময় আলোচনা শেষ হলো তা শুনতে শুনতে আমার মনে এ্যাসিসির স্যান্ট্ ফ্রান্সিসের সেই মহান বাণীটি মনে পড়লো—"নিম্নে অবলোকন করতঃ অন্ধকার দেখিয়া আলোক বলিলেন, 'ঐ দিকে আমি যাইব'। নিম্নে অবলোকন করতঃ সংগ্রাম দেখিয়া শান্তি বলিলেন 'আমিও ঐ স্থানে যাইব'। নিম্নে অবলোকন করতঃ ঘৃণা দর্শন করিয়া প্রেম বলিলেন 'ঐ স্থানে যাইব আমি'—ইহারই ফলে বাক্য দেহাশ্রিত হইয়া আমাদের ভিতর বাস করিতে লাগিল।" —এম্. ভি।

শ্রীমতী স্যাঙ্গার ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সুবিখ্যাত নেত্রী শ্রীমতী মারগারেট স্যাঙ্গারের ওয়ার্ধা পরিদর্শনের পর থেকে আমি তাঁকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখেছি। গান্ধিজীর সঙ্গে সেই উল্লেখযোগ্য সাক্ষাতের সময় আমি তাঁকে প্রথম দেখি। সেই সময় তিনি ঘন ঘন সন্তান ধারণ সমস্যার সমাধানে কার্যকরী কিছু উপদেশ বা যাঁরা নিজের পরিবারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উদ্বিগ্ন কিন্তু পন্থা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন তাঁদের উদ্দেশ্যে কোন বাণী দেবার জন্য গান্ধিজীর কাছে আবেদন করেছিলেন। গান্ধিজী তাঁর সমস্ত মন দিয়েই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন—এই সব আলোচনায় গান্ধিজীর সঙ্গে কিছু মিল খুঁজতে ও তাঁর সঙ্গে গান্ধিজী যাতে যতদূর সম্ভব একমত হতে পারেন তার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয়েছিল। গান্ধিজীও এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কতদূর একমত তার আভাস দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পরিচয় পাই "ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইণ্ডিয়া"তে তাঁর লিখিত প্রবন্ধে—তাতে তিনি গান্ধিজী যে "হাজার হাজার ভারতীয় নারীর আকাঙ্খা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অবহিত আছেন"—একে একটি বিস্ময়কর দম্ভ বলে উপহাস করেছেন। একটি কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীমতী স্যাঙ্গার ওয়ার্ধায় গান্ধিজীর কাছে এসেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন "লক্ষ লক্ষ নরনারী আপনার বাণীকে ঋষিবাক্য বলে মনে করে" কিন্তু তবুও যাঁর নির্দেশে হাজার হাজার মহিলা কারাবরণ করেছেন তাঁদের আশা-আকাঙ্খা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গান্ধিজীর জ্ঞানের দাবীকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন। গান্ধিজী ভারতীয় মহিলাদের জানেন না শুধু এই প্রমাণ করাই তাঁর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রবন্ধে গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করার সময় তাঁদের মতের কতটুকু সামঞ্জস্য ছিল বা গান্ধিজী কতখানি তাঁর

সঙ্গে একমত ছিলেন সে বিষয়ে একটি কথাও বলেননি। "ওয়ারলড ফেলোশিপ অব্ ফেইথ"-এর সমাবেশে তিনি "উইমেন অব্ দি ফিউচার" বিষয়ে যে রচনা পাঠ করেন তাতে তাঁর তৃতীয় পরিচয় পাই। এ সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করবো।

এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। আমি আগেও বলেছি যে গান্ধিজী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অতি অন্তরঙ্গ বিষয়ও শ্রীমতী স্যাঙ্গারকে জানিয়ে নিজেকে নিঃশেষে উন্মোচিত করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত মতবাদের সীমানা তিনি অকপটেই প্রকাশ করেন। এমন কি তাঁর জীবন-দর্শনের দ্বারা রচিত যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর সে সম্বন্ধেও।

সেই জীবন-দর্শনের আদর্শ হলো আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি। অতএব এই সমস্যার সমাধানের একটি—কেবলমাত্র একটি পথই গান্ধিজীর জানা ছিল। "জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধানে কোন নারী আমার অনুমোদন চাইলে আমি তা দিতে পারবো না। আমি শুধু বলব আমার বিধান তোমার কাজে লাগবে না। পরামর্শের জন্য তুমি অন্যের কাছে যাও।" শ্রীমতী স্যাঙ্গার কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উল্লেখ করলেন। গান্ধিজী বললেন "এরকম জটিল দৃষ্টান্ত আছে আমি স্বীকার করি—অন্যথায় জন্মনিয়ন্ত্রণ উৎসাহীদের কিছুই করবার থাকতো না। আমি বলব নিশ্চয়ই প্রতিকারের পথ খুঁজে বার করো, কিন্তু আজকাল তোমরা যে প্রতিবিধানের পরামর্শ দিচ্ছো নতুন ব্যবস্থা তা থেকে যেন আলাদা হয়। নৈতিক সংস্কারে ব্যাপৃত তুমি ও আমি যদি নিঃসংশয়ে বর্তমান ব্যবস্থাকে বর্জন করি ও যদি বলি যে তোমাদের অন্য প্রতিবিধান গ্রহণ করতে হবে তবে সেই নয়া ব্যবস্থা নিশ্চয়ই উদ্ভাবিত হবে।" এ বিষয়ে দুজনেই একমত হয়েছিলেন যে নারীজাতির মুক্তি বাঞ্ছনীয় ও নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার তারই থাকা উচিত। কিন্তু শ্রীমতী স্যাঙ্গার চেয়েছিলেন যে গান্ধিজী নারীজাতির মুক্তি সাধনে তাঁর মনোমত

পথই গ্রহণ করুন যেমন হিংসায় বিশ্বাসীরা চান যে গান্ধিজী হিংসার পথে ভারতের স্বাধীনতা আমুন—কেননা অহিংসার পথে অভীষ্ট সাধন কিছুতেই সম্ভব নয় বলে তাঁরা নিঃসন্দেহ।

গান্ধিজী ভারতীয় নারীজাতিকে জানেন না—এ প্রমাণ করবার অধীরতায় শ্রীমতী স্যাঙ্গার এই মৌলিক পার্থক্যও বিস্মৃত হয়েছেন। ভারতীয় স্ত্রী তার স্বামীকে সংযত রাখবেন গান্ধিজীর এই আবেদন অবাস্তব—এ মন্তব্য করে শ্রীমতী স্যাঙ্গার গান্ধিজীর অজ্ঞতা প্রমাণ করতে চাইছেন। হ্যা, গান্ধিজী যা বলেছেন তা এই—"আমার স্ত্রীর মধ্যেই আমি নারীজগতের সীমারেখা নির্ধারণ করেছি। তাকে দিয়েই আমি সব নারীকে বিচার করি। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক ইউরোপীয় মহিলার সংস্পর্শে আমি এসেছি—সেখানকার প্রায় প্রত্যেকটি ভারতীয় মহিলাকে আমি চিনতাম। আমি তাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছি। শুধুমাত্র রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়—নিজের নিজের সংসারে তারা তাদের স্বামী বা বাবা-মার দাসী নন—এটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু অসুবিধে এই ছিল যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের স্বামীদের সংযত করতে পারেননি। এর প্রতিবিধান নারীর নিজের হাতেই। তাদের পক্ষে এ রকম সংগ্রাম কষ্টকর—এজন্য আমি পুরুষকেই দোষ দিই কারণ পুরুষই তাদের বিরুদ্ধে আইন রচনা করেছে। পুরুষ নারীকে তার যন্ত্র বলে মনে করেছে। নারীও তার যন্ত্র হতে শিখেছে আর শেষকালে দেখেছে যে এইরকম যন্ত্র হওয়া সহজ ও সুখকর। কারণ একজন আর একজনকে যখন নীচে টানতে থাকে, অধোগতি তখন সহজ হয়। আমি এও অনুভব করেছি যে আমার জীবনের এই বাকী বছরগুলোতে তারা স্বাধীন—এই সত্য যদি আমি ঘরে ঘরে সব নারীর মনে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে ভারতবর্ষে আমাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন সমস্যা থাকবে না। সত্যি! যদি তারা তাদের কামুক স্বামীদের প্রতি শুধু 'না' বলতে পারতো! সব স্বামীই পশুর মত এ আমি মনে করি না—কি করে

তাদের প্রতিহত করতে হয় কেবলমাত্র তাই যদি নারীরা জানতো তাহলে সব কিছু সরল হয়ে যেতো। স্বামীদের প্রতিহত করবার শিক্ষা স্ত্রীদের দিতে আমি সমর্থ হয়েছি। সত্যিকার সমস্যা এই যে অধিকাংশই তাদের পরাঙ্মুখ করতে চায় না। একশোটির মধ্যে নিরানব্বইটির ক্ষেত্রে এই প্রতিরোধ বিরাগ সৃষ্টি করবে না। যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে বলে "না, আমি এ চাইনা"—তাতে তার স্বামী কখনও অশান্তি সৃষ্টি করবে না; কিন্তু নারীকে সে শিক্ষা কেউ দেয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাবা-মা তাকে এই শিক্ষা দেন না। অবশ্য কোন কোন দৃষ্টান্ত আমি জানি যেখানে বাবা-মা তাদের কন্যাদের মাতৃত্বগ্রহণে বাধ্য না করার জন্য জামাতাদের অনুরোধ করেছেন ও এতে সহজেই সাড়া দিয়েছেন এমন স্বামীদের কথাও আমি জানি। আমি নারীদের এই প্রতিরোধের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতে চাই। তাদের ধারণা এ অধিকার তাদের নেই।"

গান্ধিজী ভারতীয় মহিলা বা নারীজাতিকেই জানেন না, ওপরের মন্তব্যে এটা প্রমাণ করবার মত কি আছে তা আমি বুঝতে পারি না। আপন রক্তের অক্ষরে যিশুখৃষ্ট দুটি বাণী দিয়েছেন—"শত্রুকে ভালবাসিও ও অন্যায়কে হিংসা দ্বারা প্রতিরোধ করিও না"—যেহেতু এ দুটি বাণীর সার্থক উপলব্ধি থেকে আমরা বহুদূরে তাই বলে কি যিশুখৃষ্টের এই বাণী মানবজাতি সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত?

শ্রীমতী স্যাঙ্গার কয়েকটি অলীক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যেমন "মিঃ গান্ধীর উপদেশ মত চললে ঘরে ঘরে ঝগড়া ও অতৃপ্ত কামনার প্রকাশ হবে ও সপ্রেম দৃষ্টিবিনিময়, প্রেমালাপ, রাত্রির মিলনচুম্বন এই সবই তিরোহিত হবে"—কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও তার অশালীন আনুসঙ্গিকগুলোও আমেরিকাতে অসংখ্য ঝগড়া-বিবাদ, বিবাহ-বিচ্ছেদ বা নিকৃষ্টতর ঘটনাও সৃষ্টি করছে। কিন্তু আপটন সিনক্লেয়ারের মত বাস্তববাদী সংস্কারকদের বর্ণিত যে আমেরিকার কথা আমরা জানি মনে হয় তা শ্রীমতী স্যাঙ্গারের

বর্ণিত আমেরিকার চেয়ে আলাদা। আত্মসংযম অভ্যাসের ফলে স্নায়বিক ও মানসিক বৈকল্যের অনেক উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। রোজকার অসংখ্য চিঠির জ্ঞান থেকে গান্ধিজী বললেন যে, এই দৃষ্টান্তগুলো অপরিণতবুদ্ধি মানুষের পরীক্ষার ফল। সংযমী কোন সুস্থমনা লোকের পরীক্ষা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা মোটামুটি সংযত জীবনযাপনে অভ্যস্ত নয়। এই সব স্নায়ুরোগ বিশারদেরা ধরে নেন যে অনিয়মিত জীবনযাপনের কোন পরিবর্তন না করেও তারা আত্মসংযমে সফল হবেন। ফলে তারা আত্মসংযমে অভ্যস্ত না হয়ে বরং উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়। এই রকম অনেক লোকের সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে যোগাযোগ আছে ও তারা তাদের অসুস্থতার কথা আমার কাছে বর্ণনা করেন। আমি শুধু বলি যে এই জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রণালী যদি তাদের গ্রহণ করতে বলতাম তাহলে তারা বেশী অসুখী জীবনযাপন করতো।

তিনি তাঁকে আরও বললেন যে কলকাতায় গেলে তিনি অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে জানতে পারবেন যে জন্মনিরোধক জিনিষগুলো অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদেব মধ্যে কি সর্বনাশ আনছে। হয়ত কেবল আলোচনার জন্যই শ্রীমতী স্যাঙ্গার বিবাহিতদের মধ্যেই জন্মনিয়ন্ত্রণের জ্ঞান প্রচার সীমিত রাখার কথা বলেছেন।

অবিরত জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলস্বরূপ অমিতাচার ও উশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে গান্ধিজীর বিশেষ আশঙ্কাকে শ্রীমতী স্যাঙ্গার উপহাস করেছেন ও বিশেষভাবে প্রশ্ন তুলেছেন "তিনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে নারীর নয়মাস গর্ভকালেও সেই রকম অমিতাচার ঘটতে পারে?" এই যুক্তির অবতারণা করে শ্রীমতী স্যাঙ্গার নিজেদের প্রতি অবিচার করেছেন একথা আমাকে বলতেই হবে। অস্বাভাবিক বা অপরিতৃপ্ত কামুক ছাড়া অন্য কেউ গর্ভাবস্থায় আইনসম্মত হলেও যৌনসঙ্গমে সম্মত হন না। যৌন আবেগ দমন করতে উৎসুক অথচ অক্ষম দম্পতিদের বিষয় কি করা যায়?

এরপর শ্রীমতী স্যাঙ্গার যৌন-প্রেম সম্বন্ধে তাঁর নতুন তথ্য রাখলেন। তাঁর মতে এই প্রেম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ও একাত্ম সম্বন্ধ সৃষ্টি করে যার ফলে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও বেশী নৈতিক আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়। নিশ্চয়ই এ একটি নির্দোষ প্রস্তাব। কিন্তু যখন কেউ এক নিঃশ্বাসে লালসা ও ভালবাসাকে একাকার করে ফেলেন আবার পরমুহূর্তেই এদের আলাদা করতে প্রয়াসী হন তখন এই প্রস্তাব বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। ভালবাসা ও লালসার মধ্যে গান্ধিজী যে পার্থক্যের কথা ভেবেছেন নীচের আলোচনার অংশ থেকে তা স্পষ্ট হবে।

গান্ধিজী—কৃতকর্মের পরিণতির দায়িত্ব স্বীকার না করে যখন দুজনেই পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায় সেক্ষেত্রে তা প্রেম নয়—কাম মাত্র। যদি ভালবাসা নিরলস হয় তবে তা পারস্পরিক আবেগের ঊর্ধ্বে উঠবে ও নিজেকে সংযত রাখবে। রিপু দমন বিষয়ে আশানুযায়ী শিক্ষা আমাদের ছিল না। যখন কোন স্বামী বলেন "আমাদের দৈহিক সম্বন্ধ অটুট থাক কিন্তু সন্তান যেন না হয়"—সেক্ষেত্রে এ পাশবিক কামনা ছাড়া আর কি? বেশী সন্তান লাভের ইচ্ছে যদি নাই থাকে তবে সঙ্গমে তারা অসম্মত হতে পারেন। যে মুহূর্তে তুমি ভালবাসায় সম্ভোগবৃত্তি চরিতার্থ কর সেই মুহূর্তেই তা লালসায় রূপান্তরিত হয়। খাওয়ার বিষয়েও এই নিয়ম খাটে। রসনাতৃপ্তির জন্যই খেলে তা লালসা নিশ্চয়ই। খিদে মেটাবার জন্য তুমি চকোলেট খাও না—রসনাতৃপ্তির জন্যই তা খাও, ও পরে ওষুধের জন্য ডাক্তারের কাছে যাও। হয়ত বা তুমি ডাক্তারকে বললে যে মদ তোমার মাথা গুলিয়ে দেয়—তিনিও তোমাকে প্রতিষেধক ওষুধ দিলেন। কিন্তু চকোলেট বা মদ মোটেই না খাওয়া ভাল নয় কি?

শ্রীমতী স্যাঙ্গার—না, আমি এ উপমা মানি না।

গান্ধিজী—তুমি অবশ্য এ উপমার যৌক্তিকতা স্বীকার করবে না

কারণ তোমার মতে সন্তান-কামনা ছাড়াও যৌন আবেগের প্রকাশ অন্তরের নিবিড় আকাঙ্খা। আমি অবশ্য এই মত সমর্থন করি না।

শ্রীমতী স্যাঙ্গার—সত্যিই, যৌন আচরণ একটি নৈতিক প্রয়োজন —একটি প্রকাশ এবং আমি এও দাবী করি যে এর পরিণতির চেয়ে এই আচরণের মাধুর্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরিণতি যাই হোক না কেন এই আবেগের মাধুর্যটুকু আমরা দেখতে পাই। আমরা সবাই জানি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানেরা বাবা-মার গর্ভ-সঞ্চারের কোন ইচ্ছে ছাড়াই আকস্মিক ঘটনা হিসেবে জন্মলাভ করে। ক্বচিৎ স্বামী-স্ত্রী কেবলমাত্র সন্তান কামনায় লিপ্ত হয়। আপনি কি এ সম্ভব বলে মনে করেন যে একটি সুখী ও প্রণয়ী দম্পতি তাদের যৌনজীবনকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যাতে কেবলমাত্র সন্তান কামনায়ই তারা দুবছরে একবার মাত্র উপগত হবেন?

গান্ধিজী—হ্যা, এরকম আচরণের সৌভাগ্য আমার নিজেরই হয়েছিল এবং নিশ্চয়ই আমি এর একমাত্র দৃষ্টান্ত নই।

সন্তান কামনায় সঙ্গমই প্রেম, ও যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মিলন কাম মাত্র—এই দুইএর মধ্যে একই কাজকে এইভাবে অভিহিত করা শ্রীমতী স্যাঙ্গার অযৌক্তিক বলে মনে করেন। গান্ধিজী তখুনি নতি স্বীকার করে বললেন যে সব সঙ্গমকেই কামবৃত্তিপ্রসূত বলে মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত। নিজের জীবনের ঘটনার উল্লেখ করে তিনি নিজের বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করলেন। তিনি বললেন "আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে যতদিন আমার স্ত্রীকে আমি লালসার পাত্রী হিসেবে দেখেছি ততদিন আমাদের মধ্যে সত্যিকার আত্মীয়তা গড়ে ওঠেনি। তখন পর্যন্ত আমাদের প্রেম উঁচুস্তরে পৌঁছোয়নি। যদিও আমাদের মধ্যে প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল তবুও যতই আমরা, বিশেষ করে আমি, সংযত হয়েছি ততই ধীরে ধীরে দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়েছি। আমার স্ত্রীর মধ্যে কখনও সংযমের অভাব ছিল না। প্রায়ই তিনি নিজেকে সংযত রাখতেন কিন্তু ক্বচিৎ

তিনি আমাকে পরান্মুখ করেছেন যদিও প্রায়ই তিনি তাঁর অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন। এই সময়ে আমি নিজের ইন্দ্রিয় সুখই চেয়েছি—আর সেজন্য তাকে সুখী করতেও পারিনি। যে মুহূর্তে আমি এই ইন্দ্রিয় সুখের জীবন ত্যাগ করেছি তখন থেকেই আমাদের সব সম্বন্ধ আন্তরিকতায় নিবিড় হয়েছে। লালসার অবসান হয়েছে —পরিবর্তে প্রেম বিরাজ করেছে।"

কিন্তু প্রতিটি আলিঙ্গনে প্রেমের প্রকাশ ও গ্লানি সত্ত্বেও যৌন মিলন ছাড়া বিবাহিত জীবন নীরস ও নির্জীব বলে শ্রীমতী স্যাঙ্গার সম্ভবতঃ মনে করেন। গান্ধিজীর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত তার ওপর কোন রেখাপাত করেনি। যারা নিজেদের যৌন-উদ্দীপনাকে সৃষ্টিধর্মী কাজে রূপান্তরিত করে গান্ধিজীর জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তারা একটি আদর্শবাদীর ছোট্ট উপদল—এদের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা দেখে মনে হয় যে তিনি একে একটি কঠোর আদর্শ বলে বাতিল করলেন। সমস্ত আলোচনার মধ্যে গান্ধিজী একবারও কংগ্রেস বা কংগ্রেস কর্মীদের কথা উল্লেখ করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। তিনি ভুলে গেছেন যে আদর্শবাদীদের ছোট্ট গোষ্ঠীর আচরণ অনুযায়ীই সব নীতিবাদী আন্দোলনের প্রসার হয়। তাঁর নিজের আন্দোলনেরও যতটুকু সার্থকতা দেখা যাচ্ছে তাও নির্ভর করে তিনি কি কৌশলে তাঁর প্রচারিত নীতিকে আদর্শ-রঞ্জিত করতে পারেন আর এই পৃথিবীর বাসিন্দাদের সব বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, সাহস, দূরদৃষ্টি ও দায়িত্ববোধ নিয়ে উত্তরণের পথে যাবার আহ্বান বলে বর্ণনা করেন। এই পৃথিবীতে মানবজাতির ভবিষ্যতকে সার্থক করার এই একমাত্র পথ।

গান্ধিজী আদর্শ বিলাসী—এটা প্রমাণ করতে শ্রীমতী স্যাঙ্গার এত ব্যাকুল যে তাঁর কাছে উপস্থাপিত বাস্তব পথ ও উপায়গুলোও তিনি বিস্মৃত হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "সারাজীবনে মাত্র তিন-চার বারই কি দৈহিক মিলন হওয়া উচিত ?"

গান্ধিজী উত্তর দিলেন "এ শিক্ষা কেন সকলকে দেওয়া হবে না যে তিনটি বা চারটির বেশী সন্তান-জন্ম নীতি বিরোধী ও ঐ সংখ্যক সন্তানলাভের পর স্বামী-স্ত্রীর শয্যা আলাদা হওয়া উচিত। যদি তারা এই শিক্ষাই পায় তবে এ অভ্যেস ক্রমশঃই একটি সামাজিক রীতিতে পরিণত হবে। সমাজ সংস্কারকেরা যদি এ ধারণা সাধারণকে গ্রহণ না করাতে পারেন তাহলে আই৹' দিয়েও কি তা সম্ভব নয়? চারটি সন্তানলাভের পর স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে যথেষ্ট ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এর পর তাদের প্রেম উঁচুস্তরে উন্নত হতে হবে। তাদের দেহের মিলন তো আগেই হয়েছে। ঈপ্সিত সংখ্যার সন্তানলাভ করার পর তাদের প্রেম দেহাতীত আত্মীয়তায় রূপান্তরিত হবে। যদি এই সব সন্তানের মৃত্যু হয় ও তারা আরও সন্তান চান তবে তারা আবার মিলিত হতে পারেন। মানুষ যখন অন্য প্রবৃত্তির দাস নয় তখন এই বিশেষ প্রবৃত্তির দাসই বা হবে কেন? জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার সময় তুমি তাদের এও বলবে যে এই সংযম অবশ্যকরণীয়। তাদের তুমি একথাও বলবে যে এই কর্তব্যে ত্রুটি হলে তাদের আধ্যাত্মিক ক্রম-বিকাশ ব্যাহত হবে। এমনকি তুমি নিয়ন্ত্রণের উল্লেখও কর না —জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার পর তুমি একথাও তাদের বল না যে 'এ পর্যন্তই—আর বেশী নয়।' তুমি যখন পরিমিত মদ্য পানের উপদেশ দাও মনে হয় যেন ঐ সব লোকের পক্ষে যে কোন পরিমিতি মেনে নেওয়া সম্ভব। আমি অবশ্য এরকম অনেক মিতা-চারী পুরুষকে জানি।"

তবুও শ্রীমতী স্যাঙ্গারকে এত বেশী আগ্রহী দেখে গান্ধিজী এরকম একটি প্রস্তাব রাখলেন যা তাঁর বিচারে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। সে উপায়টি হল যে মাসের মধ্যে প্রায় 'নিরাপদ' দশদিনের জন্য যৌন মিলন ছাড়া অন্য বিপজ্জনক দিনগুলোতে আত্মসংযম অবশ্য পালনীয় বলে মেনে নেওয়া। এটা শ্রীমতী স্যাঙ্গারের

মনোমত হল কিনা আমি জানি না। কিন্তু সত্যান্বেষী গান্ধিজী এই রকমই বলেছিলেন। শ্রীমতী স্যাঙ্গার তাঁর সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় বা তাঁর 'ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি'র প্রবন্ধে কোথাও এর উল্লেখ করেননি। সম্ভবতঃ জন্মনিয়ন্ত্রণকারীরা যদি এই সরল ব্যবস্থায়েই সন্তুষ্ট হতে পারতেন তবে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকেন্দ্রগুলো বন্ধ হতো ও তার প্রচারকেরা বেকার হতেন।

কিন্তু আমি শ্রীমতী স্যাঙ্গারের এই প্রস্তাবের তৃতীয় পর্যায় সম্বন্ধে বলব। "ওয়ারলড ফেলোশিপ অব্ ফেইথ"-এর সম্মেলনীতে তাঁর ভাষণ খুব প্রাঞ্জল। সেখানে তিনি তাঁর স্বদেশের বিষয়ে অকপটেই বলেছেন "জগতের যে কোন দেশের চেয়ে সেখানে বেশী বেআইনী গর্ভপাত করানো হয়। প্রত্যেক বছর মোট গর্ভপাতের সংখ্যা ২,০০০,০০০-এর ওপর বলে হিসেব করা হয়েছে। ওষুধ বা যন্ত্র দিয়ে গর্ভবতী নারীর স্বেচ্ছাকৃত গর্ভপাতের সংখ্যা এই হিসেবের মধ্যে নেই।" এ প্রসঙ্গে কেবলমাত্র বিবাহিতাদের কথাই চিন্তা করা হয় নি—এটা যেন স্মরণ থাকে অবিবাহিতা মহিলাদের ক্ষেত্রেও জন্মনিরোধক জিনিষগুলো সরবরাহে শ্রীমতী স্যাঙ্গার বিশেষ কিছু আপত্তি করেননি। তিনি বলেছেন "জন্মনিরোধের যথাযথ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গর্ভপাতের মত জটিল সমস্যা এড়ানো যেতে পারে।" এখনকার সামাজিক অবস্থায় গর্ভপাত অনিবার্য; আর সেই কারণেই জন্মনিরোধও অপরিহার্য। তর্কের বেড়াজালটি সম্পূর্ণ হলো। "মানব প্রকৃতির সর্বোত্তম সৃজনী-শক্তির শোচনীয় অপব্যবহার ও অপব্যয়" দূর করার জন্য শ্রীমতী স্যাঙ্গার উদাত্তভাবে আবেদন করেছেন। তিনি ভুলে গেছেন যে এই কৃত্রিম জন্মনিরোধ-ব্যবস্থাকে সেই অপব্যয় ও অপব্যবহারের জন্য একটি নারকীয় যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

কিন্তু তাঁর ভাষণে আমি একটি বিস্ময়কর যুক্তি পেয়েছি যা এ বিষয়ে অন্যান্য যুক্তিগুলোর সব গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করবে। জন্ম

সংখ্যা বাড়ানোতে জাপান তার রেকর্ড ভেঙ্গেছে। প্রাচ্যের এই সঙ্কট যা সমস্ত বিশ্বশান্তির পক্ষে সর্বনাশা তার সবটুকুই নিহিত আছে এশীয় জাতিগুলোর মধ্যে শিশু-জন্মের এই অবাধ প্রতিযোগিতায়। "লীগ অফ নেশনসের" বা বিশ্ববিচারালয়ের এই সঙ্কট-সঙ্কেতের প্রতি দৃষ্টি দেবার সময় কি আসেনি? এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার স্রোতকে বহির্মুখী করার জন্য জাপান স্থিরসংকল্প—এ চীনের বিরুদ্ধে তথাকথিত অঘোচিত যুদ্ধকে তরান্বিত করছে—মানচুকুওর পুতুল রাষ্ট্র গঠন, শান্তিচুক্তি ভঙ্গ ও অন্য একটি বিশ্বযুদ্ধের বীজ বোনাও তরান্বিত করেছে। এ কি আর একটি সঙ্কটের সূচনা? এ কি কোন মানব কল্যাণকামীব উক্তি বা এমন কারুরও যিনি সেই কল্যাণ সাধনা থেকে বহু দূরে আছেন? আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি।

—এম. ভি.

অরণ্যে রোদন

"সম্প্রতি আমি জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচারক শ্রীমতী স্যাঙ্গারের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকালের আলোচনা পড়েছি। আমি এত গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি যে আপনার মতের প্রশংসা করে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। আপনার সাহসের জন্য ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

"গত তিরিশ বছর ধরে আমি ছোট ছেলেদের শিক্ষকতা করে আসছি। সবসময় আমি দৈহিক সংযমে ও নিঃস্বার্থ জীবনযাপনে ছাত্রদের উৎসাহ দিয়েছি।

"শ্রীমতী স্যাঙ্গার যখন আমাদের গ্রামে এসেছিলেন তখন উঁচু স্কুলের ছেলেমেয়েরা অবৈধ সংগমের পরিণতি বিষয়ে কোনরকম ভয় না করবার তথ্যের পুর্ণ সুযোগ নিয়েছিল। শ্রীমতী স্যাঙ্গারের পথই যদি নেওয়া হতো তাহলে এমন একটা সময় আসতো যে সমস্ত জগৎ ইন্দ্রিয় সুখই খুঁজতো, আর প্রেমের মৃত্যু হতো। আমি একথা বুঝতে পারি যে মহৎ আদর্শের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যাবে কিন্তু সেই চেষ্টায় আমাদের আর দেরী করা উচিত নয়। ভয় হয় ভালবাসাকে তিনি কামনা বলে ভুল করেন কারণ প্রেম অন্তরের—কখনও লালসা থেকে জাত নয়। ডাঃ এ্যালেকেসে ক্যারেল আপনার সঙ্গে একমত যে যারা অত্যধিক ইন্দ্রিয় সম্ভোগের ফলে বিকৃত স্বভাবের তারা ছাড়া অন্য কারুর পক্ষেই যৌনসংযম ক্ষতিকর নয়। অধিকাংশ চিকিৎসকের মতে যৌন সংযম অনিষ্টকর—শ্রীমতী স্যাঙ্গারের এই মত ভুল। আমেরিকান সোশ্যাল হাইজিন এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত বিখ্যাত ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকেরা সংযম উপকারী এই মত পোষণ করেন বলে আমি জানি।

"আপনি একটি মহৎ কাজ করছেন। আপনার জীবন ব্যাপী সংগ্রামের সব সাফল্য ও অসাফল্যের ইতিহাস আমি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। যে অল্প কয়েকজন এই দৈহিক মিলন বিষয়টিকে বৃহত্তর নৈতিক দিক থেকে বিচার করে দেখেন আপনি তাদের অন্যতম। সমুদ্রের এপার থেকে আমি আপনার প্রতি আমার প্রীতির হাত প্রসারিত করছি—এই আপনাকে জানাতে চাই।

"এই মহৎ প্রয়াস যেন অব্যাহত থাকে যাতে তরুণেরা সত্যের সন্ধান পায় কারণ তারাই ভবিষ্যতের আশা।

"ছাত্রদের প্রতি আমার ভাষণ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—
'সৃষ্টি কর—সব সময় সৃষ্টি কর। কিছু সৃষ্টি করা মহৎ, উদ্দীপক ও উন্নতি-সাধক। কিন্তু সৃজনীশক্তির উপভোগের মাধ্যমে যে মুহূর্তে কেবলমাত্র নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাও তখনই তোমরা সৃষ্টিকে অবহেলা কর ও তোমাদের অন্তরের উন্নত আত্মিক শক্তি নষ্ট করতে আরম্ভ কর। নিশ্চিত নৈরাশ্যেই এর পরিণতি।

'দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব সৃষ্টিতেই আছে আনন্দ ও জীবনের প্রকাশ। সৃজনের কথা ভুলে এমন কি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে যদি তোমরা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় সুখ খোঁজ তাহলে তোমরা তোমাদের স্বভাব বিকৃত করবে ও নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি নষ্ট করবে।

'পরিণামে আসবে অসংযত উত্তেজনা—ক্লান্তি, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা। এ দিয়ে কখনই সেই সব মহৎ গুণের বিকাশ হয় না যার ওপর আমরা নৈতিক শক্তির অধীশ্বর নরনারীর একটি নতুন জাতি তৈরী করতে পারি।

'আমি জানি এটা ভবিষ্যৎ-বক্তার অরণ্যে রোদনের মত কিন্তু এর সত্যতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ—ও আমি কেবল মাত্র সেই পথের নির্দেশ দিতে পারি।' "

জন্মনিয়ন্ত্রক জিনিষ ব্যবহারের নিন্দে করে আমেরিকা থেকে আমি মাঝে মাঝে যে সব চিঠি পেয়ে থাকি এটি তার অন্যতম। যে কুসংস্কারের শেকলে আমাদের দেহমন আবদ্ধ ও পরম সুখ থেকে বঞ্চিত করে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে—সেই কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার এই যে আধুনিক পদ্ধতি—একমাত্র নির্বোধ ও জড়বুদ্ধিরাই এর প্রতিবন্ধকতা করে—অন্ততঃ দূর প্রতীচ্য থেকে যে আধুনিক সাহিত্য সপ্তাহে সপ্তাহে আমদানী করা হয়ে থাকে তা পড়ে আমাদের সেই বিশ্বাসই জন্মাবে। স্বাভাবিক পরিণতির বিন্দুমাত্র ঝুঁকি না নিয়ে ঐ প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হবার যে শিক্ষা এই সাহিত্যে আছে তা পড়েও সেই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এক ক্ষণিক উত্তেজনার

সৃষ্টি হয়। হরিজন পাঠকদের সামনে আমি পাশ্চত্ত্য থেকে পাওয়া ব্যক্তিগত নিন্দাসূচক চিঠিগুলোই কেবল রাখি না। আমার মত সত্যান্বেষীর কাছে সেগুলোর মূল্য থাকলেও সাধারণ পাঠকের কাছে এর প্রয়োজন খুব কমই। কিন্তু তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন একজন শিক্ষকের এই চিঠির বিশেষ মূল্য আছে। ভাবের বন্যায় ভেসে যান এমন সাধারণ নরনারী ও ভারতীয় শিক্ষকদের এ পথ দেখাবে। জন্মনিয়ন্ত্রক জিনিষ ব্যবহারের আকর্ষণ মদের বোতলের প্রতি আকর্ষণের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু এই বর্ণোজ্জ্বল পানীয়টির মারাত্মক নেশার মত এই সব জিনিষ ব্যবহারের মধ্যেও কোন নীতির সমর্থন নেই। আবার এদের ব্যবহারের ক্রমঃপ্রসার দেখে এর প্রতিরোধ চেষ্টাও বন্ধ করা যাবে না। এই অভিযানের নীতিতে যদি আস্থা থাকে তাহলে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কেননা অরণ্যে রোদনকারীর একার কণ্ঠে এমন একটি শক্তি আছে যা বহুজনের উচ্চারিত কণ্ঠেও নাই। তার কারণ এই একক কণ্ঠের মধ্যে ধ্যান, বিশ্লেষণ ও অজেয় বিশ্বাসের বল আছে—অপর দিকে বহুজনের কলরবের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত উপভোগের অভিজ্ঞতা বা অবাঞ্ছিত শিশু বা তাদের রুগ্না মায়েদের প্রতি ভাবালুতার অসার অনুকম্পা ছাড়া আর কিছুই নেই। কোন মাতালের কাজের মূল্য যতটুকু এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নজীরের মূল্যও ঠিক ততটুকু। অনুকম্পার যুক্তি একটি জালের মত, তাতে জড়িয়ে পড়া বিপদ। অবাঞ্ছিত সন্তান বা সেইরকম অনভীপ্সিত মাতৃত্বের কারণে যে দুর্দশা হয় তা কল্যাণী প্রকৃতি-নির্দিষ্ট শাস্তি বা সাবধানবাণী মাত্র। সংযম ও শৃঙ্খলার বিধি অমান্য করলে আত্মবিনাশ হবেই। বর্ত্তমান অবস্থা হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার। যদি আমরা নিয়মানুবর্তিতার ভার বইতে অস্বীকার করি তবে আমরা ব্যর্থতার আমন্ত্রণ জানাবো—কাপুরুষের মত সংগ্রাম না করে জীবনে চরম আনন্দলাভে বঞ্চিত হব।

জন্মনিয়ন্ত্রণ—(১)

জন্মনিয়ন্ত্রণের "নিরাপদ-সময়" পদ্ধতি আমি অনুমোদন করি এ জেনে একজন মনোযোগী পাঠক বিচলিত হয়েছেন। আমি বন্ধুটির কাছে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি যে জন্মনিরোধক জিনিষ ব্যবহারের তুলনায় "নিরাপদ সময়"-পদ্ধতিটি আমার কাছে সমান বর্জনীয় নয়—আর এই পদ্ধতিটি কেবলমাত্র বিবাহিত দম্পতিরাই গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গ আলোচনার সময় অপ্রত্যাশিত অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। আমার বন্ধুটির কাছে এই "নিরাপদ সময়" পদ্ধতিটিও জন্মনিরোধক জিনিষের মত সমানভাবে বর্জনীয়—এ জেনে আমি বুঝতে পারিলাম যে তার বিশ্বাসমত সংযম সাধারণ নরনারীর পক্ষে সম্ভব ও স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশমত কেবলমাত্র সন্তান কামনায়ই স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন হওয়া উচিত। যদিও এই বিধানটির কথা আমি জানতাম তবু আলোচনা প্রসঙ্গে এর তাৎপর্য আমি নতুন-ভাবে অনুধাবন করলাম। অনেকদিন ধরে সর্বগুণান্বিত হবার জন্য এটিকে আমি একটি নির্দেশ বলে মনে করেছি—তা ভাষাগত অর্থে পালন করা সম্ভব বলে নয়। এও মনে করেছি যে সম্ভাব্য গর্ভের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা না করেও যদি বিবাহিত দম্পতিরা কেবলমাত্র পরস্পরের সম্মতি নিয়ে যৌন মিলনে লিপ্ত হন সেক্ষেত্রে স্মৃতি-শাস্ত্রের নির্দেশ লঙ্ঘন না করেই বিবাহের উদ্দেশ্য পালন করা হবে। কিন্তু যখন নতুন করে এই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানটিকে বিশ্লেষণ করলাম তখন তা নতুনভাবে আমার কাছে প্রতিভাত হল। আগে কখনও না বুঝলেও এখন আমি নিশ্চিত বুঝলাম যে বিবাহিত দম্পতিরা স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানগুলো যদি ঠিক ঠিক মেনে চলেন তাহলে অবিবাহিত সদাচারী লোকদের মত তাদেরও সমানভাবে ব্রহ্মচারী বলা চলে।

নতুন বিচারে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে যৌন মিলনের উদ্দেশ্য সন্তান প্রজনন—যৌন-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা কখনও নয়। বিবাহের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সাধারণ ভাবে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাও কামাবেগ বলেই বিচার করতে হবে। যে উপভোগকে এতদিন নির্দোষ ও বৈধ বলে মনে করা হয়েছে সে সম্বন্ধে এরকম বিচার কঠোর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমি কোন রীতি নিয়ে বিচার করছি না। হিন্দু ঋষিদের আদিষ্ট বিবাহের বৈজ্ঞানিক সূত্রটিই আমার বিচার্য। হতে পারে এ ভুল বা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কিন্তু আমার মতে যারা স্মৃতিশাস্ত্রের বহু বিধানকে স্বতঃস্ফূর্ত ও বহু অভিজ্ঞতালব্ধ বলে মনে করেন তাদের কাছে এই বিধানগুলোর তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিষয়গুলোর সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় ও প্রাচীন বিধানগুলোর যথার্থ প্রয়োগবিধি বিশ্লেষণ করার জন্য অন্য কোন পথ আমার জানা নেই—সেই বিশ্লেষণ যতই কষ্টের বা সিদ্ধান্তগুলো যতই অপ্রিয় হোক না কেন।

আমার বিচারে কৃত্রিম পদ্ধতিতে বা জন্মনিরোধক জিনিষের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত ভুল। আমি আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই একথা লিখছি। শ্রীমতী মারগারেট স্যাঙ্গার ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় তিনি আমার মনে বিশেষভাবে ছাপ রেখেছেন। আমি জানি যে অবাঞ্ছিত সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনের দায়িত্ব বহন করার জন্য যেসব মহিলাকে কষ্ট ভোগ করতে হয় তাদের জন্য তাঁর গভীর সহানুভূতি আছে। এও আমি জানি যে অনেক প্রটেষ্টাণ্ট যাজক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা যাঁদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে ও যাঁদের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে তাঁরা এই পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেন। কিন্তু আমি যদি আমার পাঠক ও এই পদ্ধতির সমর্থকদের কাছ থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস গোপন করি

তাহলে যে ঈশ্বর আমার কাছে সত্য ও একমাত্র সত্য বলেই প্রতিভাত তাঁর কাছেও মিথ্যাচারী হব। যদি আমার ধারণা গোপন রাখি তাহলে এই ধারণা ভুল হলেও আমার গোচরে আসবে না। তা ছাড়া যে সব নরনারী এই জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ও অন্যান্য অনেক নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আমার উপদেশ বা নির্দেশ গ্রহণ করেন তাদের জন্যও আমার মতের প্রকাশ প্রয়োজন।

জন্মনিয়ন্ত্রণ বা নিরোধের প্রয়োজনীয়তা কৃত্রিম উপায়ের সমর্থক বা এ মতের সকলেই স্বীকার করেন। আত্মসংযমের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ-নীতি যে কঠিন তাও অস্বীকার করা যায় না। তবুও মানব জাতির ঈশ্বর নির্দিষ্ট ব্রত উদযাপনের লক্ষ্যে পৌছুবার অন্য কোন পথ নেই। আমার বদ্ধমূল ধারণা যে এই আলোচ্য পদ্ধতিটি সকলে গ্রহণ করলে মানবজাতির অধঃপতন হবে। পদ্ধতির প্রচারকেরা যদিও প্রায়ই অনেক রকম বিপরীত তথ্য উত্থাপন করেন তবুও আমি একথাই বলব।

আমার বিশ্বাস আমার কোন কুসংস্কার নেই। সত্য প্রাচীন বলেই যে মর্যাদা পেয়েছে তা নয়। আবার প্রাচীন বলেই যে তাকে সন্দেহের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে তাও নয়। জীবনের এমন কয়েকটি মূল নীতি আছে ব্যক্তিগত জীবনে এর প্রয়োগ কঠিন বলেই সহজেই ত্যাগ করা চলে না।

আত্মসংযমের দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ কঠিন সন্দেহ নেই কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেননি বা কৃত্রিম জিনিষ ব্যবহারের চেয়ে এ যে ভাল সে সম্বন্ধেও নয়।

সুতরাং আমি মনে করি যে যৌন মিলনকে চরম আনন্দ লাভের উৎস বলে মনে করার চেয়ে শাস্ত্রীয় অনুশাসনে এই ক্রিয়াটি বিশেষভাবে সীমিত করার যে নির্দেশ আছে তা মেনে চললে আত্মসংযম সহজ হয়। বিবাহিত দম্পতির মাধ্যমে সর্বোন্নত বংশ সৃষ্টি করাই জননেন্দ্রিয়ের কাজ। যখন দুপক্ষই শুধু যৌন

মিলন নয়—বরং ঐ মিলনের ফলে সন্তান কামনা করে—কেবল তখনই তা সম্ভব। এই রকম মিলন যদি বংশ সৃষ্টি করার ইচ্ছে ছাড়া হয় তবে তা নীতি বিরোধী মনে করা উচিত ও তা সংযত করা উচিত।

পরের সংখ্যায় সাধারণ মানুষের পক্ষে এ রকম সংযম কতখানি সম্ভব তা আলোচনা করা হবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ—(২)

আত্মসংযমের সহায়ক এমন কিছুই আজকাল আমাদের সমাজে নেই। আমাদের লালন-পালন ব্যবস্থাই এর প্রতিকূল। কোন রকমে সন্তানদের বিবাহ দেওয়াই যেন বাবা-মা'র প্রধান কর্তব্য যাতে তারা খরগোশের মত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। মেয়েদের বেলায় তাদের মানসিক কল্যাণ বিবেচনা না করেই যতদূর সম্ভব অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহ-অনুষ্ঠান মানে বিরাট খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার ও অর্বাচীন চপলতার যন্ত্রনাদায়ক প্রকাশ। গৃহকর্তার জীবনেও থাকে অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার স্পৃহা—এ বিলাসের সম্প্রসারণ মাত্র। উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে তা স্বভাবতঃই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে সবচেয়ে বেশী স্বাধীনতা দেয়। সাধারণতঃ যে সাহিত্য আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাও পাশবিক বৃত্তিরই ইন্ধন যোগায়। অতি আধুনিক সাহিত্যও এই শিক্ষাই দেয় যে বাসনাই কাম্য আর সর্বাঙ্গীন সংযম পাপ বিশেষ।

যৌনক্ষুধার সংযম একেবারে অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? অতএব যদি আত্মসংযমের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে কাম্য ও যুক্তিযুক্ত হয় ও সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ পদ্ধতি হয় তবে সামাজিক আদর্শ ও পরিবেশকে আমাদের বদলাতে হবে। ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুবার একমাত্র উপায় এই যে যারা আত্মনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করেন তাদের নিজেদেরই তার প্রথম দৃষ্টান্ত হতে হবে। আর এই প্রদীপ্ত বিশ্বাসের আলোয় পরিবেশকে উজ্জ্বল করতে হবে। গত সপ্তাহে বিবাহের সংজ্ঞা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি সে সম্পর্কে এ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। এর যথার্থ অনুধাবন মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে।

এ কেবলমাত্র কয়েকজন নির্বাচিত লোকের জন্যই নির্ধারিত হয়নি। মানবগোষ্ঠীর সম্বন্ধে অনুশাসন হিসাবে এর প্রবর্তন। এ লঙ্ঘনের ফলে হয় মানুষের মর্যাদাহানি, আসে নিয়তপ্রসারী ব্যাধি ও কর্তব্য পালনে মানসিক বৈকল্য। এটা সত্যি যে নিরোধক জিনিষের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ নবাগতদের সংখ্যা কিছু পরিমাণে কমাতে পারে ও অল্পবিত্ত লোকেরা তার ফলে শোচনীয় দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু এ দ্বারা সমাজের ও ব্যক্তির যে ক্ষতি হয় তার সীমা নেই। কামবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই যারা তা গ্রহণ করে—কেবল ঐ একটি কাজের ফলেই তাদের জীবন-দর্শনের আমূল পরিবর্তন হয়। বিবাহ তাদের কাছে ধর্মানুষ্ঠান বলে মনে হয় না। এর অর্থ, এতদিন যে সামাজিক আদর্শকে অমূল্য সম্পদ বলে মনে করা হয়েছে তার নতুন মূল্যায়ন। অবশ্য বিবাহের এই প্রাচীন আদর্শকে যারা কুসংস্কার বলে মনে করেন তাদের কাছে এই যুক্তির যে কোন আবেদন নেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা বিবাহকে ধর্মাচরণ বলে মনে করেন ও নারীকে ইন্দ্রিয় সুখের যন্ত্র বলে মনে করেন না বরং মনে করেন তিনিই মানবজননী ও বংশধরদের 'অছি' কেবল তাদের উদ্দেশ্যেই আমার এই মতবাদের প্রবর্তনা।

ব্যক্তিগত ও সহকর্মীদের সংযমের অভিজ্ঞতায় আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। বিবাহ সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণার স্বচ্ছ আলোয় তা এক দুর্নিবার শক্তি লাভ করেছে। আমার কাছে বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী হয়েছে ও বিবাহের মতই তা এখন সরল মনে হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্য প্রক্রিয়া অর্থহীন ও অভাবনীয় বলে মনে হয়। নরনারী যদি একবার ভাবতে শেখে যে জননেন্দ্রিয়ের সর্বোত্তম ও একমাত্র কাজ হলো প্রজনন তবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সংগমে বীর্যের অপব্যয় তারা অপরাধ বলে মনে করবে ও ক্রিয়াটির ফলে যে অযথা উত্তেজনা পুরুষ ও নারীর মধ্যে আসে তাও শক্তির দূষণীয় অপচয়। এখন এটা

স্পষ্টই বোঝা যায় যে কেন প্রাচীন বৈজ্ঞানিকেরা রেতঃকে এত মূল্য দিতেন—কেনই বা সামাজিক উন্নতির জন্য এর সর্বোত্তম রূপান্তরের ওপর এত জোর দিতেন। তাঁরা সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে নারী বা পুরুষ নিজের জননশক্তিকে পূর্ণভাবে সংযত করতে পারলে দেহে, মনে ও নীতিতে তিনি যে শক্তি॰ অধিকারী বা অধিকারিণী হন তা পার্থিব কোন শক্তিরই অধিগম্য নয়।

এরকম বিরাট একজন বা অনেক ব্রহ্মচারীর জীবন্ত নিদর্শনের অভাবে পাঠকেরা যেন বিচলিত না হন। আজকাল আমাদের চারিদিকে যেসব ব্রহ্মচারী নজরে পড়ে তারা পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী নন। খুব বেশী হলে তারা দেহের সংযম রক্ষার প্রত্যাশী—মনের নয়। প্রলোভনকে তারা নিশ্চয়ই জয় করেননি। ব্রহ্মচর্যপালন এত কঠিন বলেই যে এরকম হয়ে থাকে তা নয়। সামাজিক পরিবেশ তাদের পরিপন্থী আর যারা নিষ্ঠার সঙ্গে এ বিষয়ে প্রয়াসী হন তাদের অনেকেই অজ্ঞাতসারে দেহজ উত্তেজনাকে অন্যান্য উত্তেজনা থেকে আলাদা করে ফেলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃতকার্য হতে গেলে মানুষ যে যে প্রবৃত্তির প্রলোভনে পড়তে পারে সে সবের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। যদিও ব্রহ্মচর্য পালন সাধারণ নরনারীর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয় তবু এটা মনে করা উচিত নয় যে বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে কৃতসঙ্কল্প কোন ছাত্রকে যে পরিশ্রম করতে হয় তার চেয়ে অল্প শ্রমেই এই ব্রহ্মচর্য লাভ হবে। জীবন-বিজ্ঞানে প্রকৃত জ্ঞানলাভই হলো ব্রহ্মচর্যলাভ—এটাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য।

একজন আমেরিকাবাসিনীর সাক্ষ্য

মণ্টানার কুমারী ম্যাবেল ই সিম্পসন (ইউ. এস. এ.) সম্পাদকের কাছে লিখছেন—

"যে কোন বিষয়ের মূল অনুধাবনের স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে রচিত মিঃ গান্ধির 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' বিষয়ে প্রবন্ধটি আমি খুব আনন্দের সঙ্গে পড়েছি। কুড়ি বছর আগে যখন আমেরিকাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ অননুমোদিত ছিল তখন যদি তিনি আমেরিকায় আসতেন তবে আজকাল সেখানে যখন এটা পূর্ণোদ্যমে চলেছে তার ফলে কি নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে তা তিনি জানতে পারতেন। কিন্তু তিনি কারুরই মত বদলাতে পারবেন না। কারণ এই অভ্যাসে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অন্ধতা জন্মায়, ফলে এর সমর্থকেরা উঁচুস্তরের আধ্যাত্মিক মান বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। যদি ভারতবর্ষ এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণ করে তবে তা দুটি অমূল্য ও মনোরম 'রত্ন' হারাবে—একটি অপত্যস্নেহ অপরটি মা-বাবার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা। আমেরিকা এই দুইই হারিয়েছে—এ ক্ষতির খোঁজও রাখে না। ব্রহ্মচর্যের তাৎপর্য কি এ বিষয়ে আপনি কি একটি আবেদন প্রকাশ করবেন? অনেক লোক আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এ বিষয়ে আমার একটা ধারণা আছে মাত্র; অন্যকে ভাল করে বোঝাতে পারি সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয় নই। আপনাকে ধন্যবাদ।"

এই প্রামাণ্য বিষয়ে আমার পাঠক-পাঠিকারা তাদের ইচ্ছেমত মূল্য দিতে পারেন। আমি অবশ্য বলব যে জন্মনিরোধক ব্যবহারে সুফল পেয়েছেন বলে যারা দাবী করেন তাদের চেয়ে এর বিরুদ্ধে প্রমাণ অনেক মূল্যবান। তার কারণ অনেক স্পষ্ট। উপকার অর্থাৎ সন্তানের জন্মনিয়ন্ত্রণ যে হয় তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রতিপাদ্য হলো এই প্রক্রিয়ায় জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে যে নৈতিক অনিষ্ট হয় তা সত্যি অপরিসীম। কুমারী সিম্পসন এই রকম অনর্থের একটি পরিমাপ দিয়েছেন।

এখন আমি ব্রহ্মচর্যের সংজ্ঞা ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে বলছি। এর অভিধানিক অর্থ হলো এই যে ব্রহ্মচর্যের আচরণ-বিধি যা একজনকে ঈশ্বরের সংস্পর্শে আনে তা অন্য সব ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ সংযমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই হলো এই কথার প্রকৃত ও সঙ্গত অর্থ। অবশ্য সাধারণ ভাবে এ অর্থই করা হয় যে এতে কেবল জননেন্দ্রিয়ের সংযমই বোঝায়। এই সংকীর্ণ ব্যাখ্যাই ব্রহ্মচর্যকে বিকৃত করেছে আর এর অভ্যেস প্রায় অসাধ্য করেছে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে না পারলে কেবল উপস্থের সংযম সম্ভব নয়। এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই স্থূলভাবে রয়েছে মন। তাই মন জয় না করে দেহের সংযম, তা অল্প সময়ের জন্য সম্ভব হলেও, নিতান্তই অকিঞ্চিংকর ও মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়।

কৃত্রিম জন্মনিরোধকের সমর্থনে

একজন পত্রলেখক লিখছেন—

"সম্প্রতি 'হরিজনে' প্রকাশিত মহাত্মাগান্ধী ও মিসেস স্যাঙ্গারের সাক্ষাৎকার বিষয়ে নিবন্ধের ওপর আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। সর্বোপরি মানুষ যে একজন স্রষ্টা ও শিল্পী এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আলোচনার বিষয়ীভূত হয়নি ও সাক্ষাৎকারের বিবরণে আমি তা খুঁজেও পাইনি। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষে তার পরিতৃপ্তি নেই—বর্ণ, রস ও সুন্দরকে তার পেতেই হবে। মহামতি মহম্মদ বলেছেন—'যদি কেবল একটি পয়সা থাকে তবে তাহা দ্বারা আহার্য ক্রয় করিও—যদি দুইটি থাকে তবে একটি দ্বারা খাদ্য ও অপরটি দ্বারা একটি কুসুম ক্রয় করিও।' এর মধ্যে একটি মহান মনস্তাত্ত্বিক সত্য নিহিত আছে—সেই সত্যটি হল যে মানুষ স্বভাবতঃই একজন শিল্পী, কেবলমাত্র দেহধারণের প্রয়োজন ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু করবার প্রয়াসেই সে নিজের বেশবাস রচনা করে। নিছক প্রয়োজন মেটাবার প্রয়াসকে সে একটি শিল্পে পরিণত করেছে ও সেই প্রয়াসে সে অপরিসীম ক্লেশ স্বীকারও করে। তার সৃষ্টির আগেই সে নতুন বাধা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে, আবার তার সমাধানও করে। যতটা সরল হলে রুশো, রাসকিন, টলষ্টয়, থোরিও ও গান্ধিজী সুখী হতেন সে ঠিক ততটা হতে পারে না। অপরিহার্য বলে সংগ্রাম তাকে করতেই হবে আর সেই সংগ্রামকেও সে একটি মহৎ শিল্পে রূপান্তরিত করেছে।

"প্রকৃতির উল্লেখের সব আবেদন তার কাছে ব্যর্থ হবে কারণ এ তার আপন সত্তার বিপরীতধর্মী। প্রকৃতি তার গুরু হতে পারে না। যারা এ বিষয়ে প্রকৃতির উল্লেখ করেন তারা ভুলে যান যে প্রকৃতির মধ্যে শুধু পাহাড় পর্বত উপত্যকা ও কুসুম শয্যাই নেই আবার বন্যা, ঝঞ্ঝা ও ভূমিকম্পও আছে। দেবদ্রোহী নীটসে বলেন যে শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি আদর্শ নয়। এ কোথাও অতিরঞ্জিত, বিকৃত আবার কোথাও শূন্যতা সৃষ্টি করে। প্রকৃতি আকস্মিক ঘটনামাত্র—শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাছে এ মূল্যহীন। প্রকৃতির থেকে শিক্ষা নেওয়া অশুভ নিদর্শন বলে আমার মনে হয়—

সামান্য ঘটনার সংঘাতে যা ধূলিস্যাৎ হয় তা কুশলী শিল্পীর সৃষ্টির অযোগ্য। বস্তুতঃপক্ষে ভিন্নমতাবলম্বী যারা—যারা শিল্পবিরোধী বা বাস্তববাদী তাদের কর্মপদ্ধতি জানতে হলে নিজেকে জানতে হয়। আস্বাদনের জন্য নয়, দেহধারণের প্রয়োজনেই বন্য পশুরা কাঁচা মাংস খায় বলে আমরা জানি। সৃজন ঋতু ছাড়া অন্য কোন সময় তারা যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয় না বলেও আমরা জানি। কিন্তু আমাদের দার্শনিকের মতে পুরুষ স্বভাবতঃই শিল্পী—তার এরকম আচরণ ঠিক নয়। আমাদের দার্শনিকের মত এই যে জননের ইচ্ছা ছাড়া যৌন মিলন বর্জন বা কেবল মাত্র বংশ সৃষ্টির জন্য যৌন মিলন অতি হিসাবী অতি স্বাভাবিক ও অতি বাস্তব বলেই সুস্থ শিল্পী মনে করবেন। অতএব তার মতে যৌন ভালবাসার সম্পূর্ণ অপর একটি দিক আছে যা সংখ্যাবৃদ্ধির বাসনা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত—সেই ভালবাসার কথাই হ্যাভ্‌ল্ কেলিস ও ম্যারিস্টোপস্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই ভালবাসা আত্মা থেকে উৎসারিত হলেও দৈহিক মিলন ছাড়া এ সম্পূর্ণ হয় না এবং যতদিন আমরা আত্মাকে আলাদা ভাবে লাভ না করতে পারি ততদিন এই দেহযন্ত্রের ভেতর দিয়েই তাকে লাভ করতে হবে। এই মিলনের পরিণতির মোকাবিলা সম্পূর্ণ একটি পৃথক সমস্যা এবং তার জন্যই এই জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রয়োজন। কিন্তু যদি কোন বাহিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালনকে এক নৈতিক পুনর্বিন্যাসে পর্যবসিত করা হয়—কারণ আত্মসংযম এর থেকে আলাদা কিছু নয়—তবে আমরা নিঃসন্দেহে এটা বলতে পারব না যে এই প্রয়াস বা জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন যা মনস্তত্ত্বেরও পর সুপ্রতিষ্ঠিত নয় তা আমাদের অভীপ্সিত ফললাভে সহায়তা করবে।

"আত্মসংযমজাত শৃঙ্খলাবোধ যাকে ব্যবহারিক অর্থে ব্রহ্মচর্য বলা হয় —তার কোন মূল্য হ্রাস করতে চাই না—এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। যৌন বৃত্তির পুর্ণ সংযমের এ সুচারু পদ্ধতি বলে আমি সবসময় এর প্রশংসা করবো। অন্যান্য শিল্পের পুর্ণ বিকাশ যেমন (নীয়েটসী বর্ণিত) পূর্ণ সত্তা বা প্রাণ বিজ্ঞানের সঙ্গে সংঘাত ঘটায় না কিংবা জীবনের বিচিত্র মূল্যায়ণ সম্পর্কেও যেমন কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না সেই রকম জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মূল্যায়ণ ব্রহ্মচর্য আদর্শের

দ্বারা প্রভাবিত হতে আমি আপত্তি করবো—জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত সমস্যার সমাধানে অস্ত্র হিসেবে তো কখনই নয়। এ সমস্যাকে আমরা এই রকম অপদেবতা রূপে সৃষ্টি করেছি। যুদ্ধকালীন জারজ সন্তানদের কথা আমরা শুনেছি। যারা আপন রক্তে নিজ দেশবাসীর জন্য বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করেছেন সেই সৈনিকদের শুধুমাত্র যুদ্ধকালীন জারজ সন্তানদের পিতৃত্বের কারণে যথাযথ সম্মান দিতে আমাদের অস্বীকার করা উচিত কি ? কেউই তা করবে না। আমার বিশ্বাস এরকম পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়ণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ধর্মগ্রন্থে (প্রশ্নোপনিষদ) বলা হয়েছে যে "ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্ রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্জতে" অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র রাত্রিকালে যৌন সংযম ঘটে সেক্ষেত্রেও ব্রহ্মচর্য পালিত হয়। অর্থাৎ দিনের বেলায় অস্বাভাবিক রতিক্রিয়া নিষিদ্ধ। এখানে স্বাভাবিক যৌন-জীবনকেও ব্রহ্মচর্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জীবনের সকলক্ষেত্রে মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তনের পরেই ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে এই অনমনীয় মনোভাবের সৃষ্টি হয়।"

আমি সানন্দে এই চিঠিটি প্রকাশ করছি যেমন আমি প্রকাশ করবো এই রকম যে কোন চিঠি যাতে কোন সরব অস্বীকৃতি, কটূক্তি বা অভিসন্ধির আরোপ নেই। দু'দিক দিয়ে প্রশ্নটি বিচার করলেই একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে পাঠক সমর্থ হবেন যা বিজ্ঞানসম্মত ও কল্যাণকর বলে দাবী করা হয় ও যার অনেক বিশিষ্ট সমর্থক আছেন। আমি এর উজ্জ্বল দিকটুকু দেখতে সচেষ্ট থাকা সত্ত্বেও কেন যে এ আমার মনে বিরূপতার সৃষ্টি করে তা জানতে আমি নিজেই উৎসুক।

অতএব আমার কাছে এ সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়নি যে বিবাহিত জীবনে যৌন মিলনেই মিলনানুরাগীদের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত। বরঞ্চ আমার ব্যক্তিগত বহু বন্ধুর অভিজ্ঞতা থেকে এর বিপরীত দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করতে পারি। এর দ্বারা আমাদের কেউই কোন মানসিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক কল্যাণ লাভ করেছেন বলে আমি অবহিত নই। ক্ষণিক উত্তেজনা ও তার প্রশমন অবশ্যই ছিল কিন্তু শেষে এ অবশ্যম্ভাবী অবসাদ এনেছে। অবসাদ কেটে

যাওয়ামাত্র আবার সম্ভোগ ইচ্ছা জেগে উঠেছে। আমি সর্বদাই একজন বিবেক অনুরাগী কর্মী, তাই সুস্পষ্টভাবে এ আমি মনে করতে পারি যে এই সম্ভোগস্পৃহা আমার কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই সম্ভোগ-ক্ষমতার সীমা বিষয়ে সচেতনতাই আমাকে আত্মসংযমের পথের নির্দেশ দিয়েছে ও আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে দীর্ঘকাল ধরে যে আমি অসুস্থতা থেকে অনেকাংশে মুক্ত আছি আর প্রত্যক্ষদর্শীরা আমার যে শারীরিক ও মানসিক হুরকম উত্তম ও কর্মনিষ্ঠাকে অলৌকিক বলে বর্ণনা করেছেন তাও আত্মসংযমের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।

আমার ভয় হয় যে পত্রলেখক তার অধীত বিদ্যার অপপ্রয়োগ করেছেন। পুরুষ নিঃসন্দেহে একজন শিল্পী ও স্রষ্টা—আর এও সন্দেহাতীত যে সুন্দরের সাধনা তাকে করতেই হবে অতএব তার বর্ণেরও প্রয়োজন আছে। ব্যঞ্জনাহীন বর্ণ সমষ্টি সুন্দরের নিদর্শন নয় বা সকল আনন্দের অনুভূতিতেই যে কল্যাণ নেই—পুরুষ তার শিল্পী ও স্রষ্টা-স্বভাব থেকে এই বিচার করতে শিখেছে। যা কল্যাণ-কর তার সাধনায়ই আনন্দলাভ—তার শিল্পীচেতনা তাকে এ শিক্ষাই দিয়েছে। এজন্যই বিবর্তনের প্রথম অধ্যায়েই সে শিখেছে যে শুধুমাত্র আহারের জন্যই সে খাদ্য গ্রহণ করে না যেমন এখনও কেউ কেউ করে থাকেন—বরং প্রাণধারণের জন্য তাকে আহার করতে হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে সে আরও শিখেছে যে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই জীবনধারণে কোন সৌন্দর্যও নেই আনন্দও নেই বরং অন্যান্য প্রাণীর সেবা ও তার মাধ্যমে স্রষ্টার সেবা করার জন্যই জীবন-ধারণ করতে হবে। এই ভাবে সে যখন যৌন সংগমের সুখের মুহূর্তটি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করল তখনই সে বুঝতে পারল যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মত এই জননেন্দ্রিয়েরও কু ও সু ব্যবহার সম্ভব। সে আরও বুঝতে পারল যে একমাত্র সৃজনের মধ্যে নিবদ্ধ রাখাতেই এর নির্দিষ্ট কাজ ও যথার্থ ব্যবহার। সে দেখল যে এর অন্য কোন ব্যবহার

কুৎসিৎ—সে আরও বুঝতে পারল যে এর অন্য ব্যবহার ব্যক্তি ও জাতি দু-এর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। এ তর্ক বেশী বিস্তারিত করার প্রয়োজন নেই।

পত্রলেখক ঠিকই বলেছেন যে নিতান্ত প্রয়োজন মেটানোকেও মানুষ এক শিল্পে পরিণত করেছে। প্রয়োজন মেটাবার তাগিদেই যে আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে শুধু তাই নয়, অনেক শিল্পসৃষ্টির পেছনেও সেই তাগিদ রয়েছে। অতএব যে শিল্প সাধনা প্রয়োজনভিত্তিক নয় তার সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।

সব রকম চাহিদাই অত্যাবশ্যকতার সম্মান পাবে না। পুরুষের মনোজগৎ একটি পরীক্ষাস্থল। এ অবস্থায় সৎ ও অসৎ শক্তির মাধ্যমে তার পরীক্ষা হয়। সদাই তার প্রলোভনের বশে যাবার সম্ভাবনা। প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম ও তাকে প্রতিরোধ করেই তার পৌরুষ প্রমাণ করতে হয়। যদি সে তার কাল্পনিক বহিঃশত্রুর সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ করে অথচ অন্তরের অগণিত শত্রুর বিরুদ্ধে অঙ্গুলি হেলনেও অক্ষম হয় বা যা মন্দতর সেই শত্রুদের বন্ধু বলে ভুল করে তবে সে কখনও বীর নয়। যুদ্ধ তাকে করতেই হবে। কিন্তু পত্র-লেখক ভুল করেন যখন তিনি বলেন যে এর অপরিহার্য পরিপূরক হিসেবে এই সংগ্রামকে পুরুষ একটি মহান শিল্পে রূপান্তরিত করেছে। বস্তুতঃ সে এখনও রণকৌশল অল্পই শিখেছে! মিথ্যা সংগ্রামকে সে সত্য বলে ভুল করে যেমন আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় আবেগকে আহুতি না দিয়ে মনুষ্যেতর অনেক নির্দোষ প্রাণীকে বলি দিয়েছেন বা আজও অনেকে দিয়ে থাকেন। সংগ্রামের সত্যিকার তাৎপর্য শিখতে আমাদের এখনও বাকী আছে। অ্যাবিসিনিয়ার সীমান্তে এখন যা ঘটছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সৌন্দর্য নেই, শিল্পকলাও নেই। লেখক তার দৃষ্টান্তগুলোব স্বপক্ষে উপযোগী অনেক নামের উল্লেখ করেছেন। রুশো, রাসকিন, থোরিও ও

টলষ্টয় তাঁদের সময়কার প্রথম সারির শিল্পী ছিলেন। আমাদের মধ্যে অনেকে মৃত, সমাহিত ও বিস্মৃত হওয়ার পরেও তাঁরা স্মৃতিতে জীবিত থাকবেন।

লেখক 'প্রকৃতি' শব্দটির অপপ্রয়োগ করেছেন বলে মনে হয়। প্রকৃতির অনুশীলন বা অনুকরণ করবার জন্য যখন মানুষের কাছে আবেদন করা হয় তখন তাকে সরীসৃপের অনুকরণ করতে বলা হয় না বা অরণ্যরাজ্যেরও নয়। মানুষের প্রকৃতিতে যা সর্বোত্তম তাই তাকে অনুশীলন করতে হবে অর্থাৎ আমাব মতে তার সৃজনধর্মী স্বভাবের অনুশীলন তা যাই হোক না কেন। সম্ভবতঃ এই পুনরুজ্জীবিত স্বধর্মকে জানতে হলে সবিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। প্রাচীন উপদেষ্টা-গণের উল্লেখ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। নীয়েটসী বা প্রশ্নোপনিষদের উল্লেখ করাও এখানে নিষ্প্রয়োজন—এই আমি পত্রলেখককে বলতে চাই। আমার কাছে সমস্যাটি উদ্ধৃতি অধ্যায়ের অতীত। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে নীরস যুক্তি দিয়ে কি বলবার আছে? কেবলমাত্র সৃজনকাজে নিবদ্ধ রাখাই জননেন্দ্রিয়ের যথার্থ ব্যবহার ও এর অন্য কোন ব্যবহার অপব্যবহার—এ বলা কি ভুল? বা ঠিক? যদি ঠিক হয় তবে এর যথাযথ ব্যবহারে ও তার অপব্যবহার পরিহার করাতে সত্যান্বেষী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে না।

মহিলা সংস্কারকদের সমর্থনে

আমার কোন একজন বোনের সঙ্গে এক গুরুতর আলোচনার পরে আমার ভয় হয়েছে যে জন্মনিরোধক জিনিষ ব্যবহার সম্বন্ধে আমার মত যথাযথভাবে বোধগম্য হয় নি। পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে আনীত হয়েছে বলেই আমি এগুলোর বিরোধিতা করছি—তা নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক জিনিষ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ব্যবহার করি অবশ্য যদি আমি বুঝি সেগুলো যেমন পাশ্চাত্ত্যদেশের তেমনি আমাদেরও উপকারে লাগে। গুণাগুণের বিচারেই জন্মনিরোধক সম্বন্ধে আমার আপত্তি।

আমি ধরে নিচ্ছি যে জন্মনিরোধের বুদ্ধিমান সমর্থকেরা ঐ সব জিনিষ ব্যবহার শুধু সেই রমণীদের মধ্যে সীমিত রাখতে চান যারা নিজেদের ও স্বামীদের যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে ইচ্ছুক অথচ সন্তান কামনা করেন না। আমার মত এই যে এরকম ইচ্ছে মানব জাতির পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি সেই ইচ্ছাপূরণ মানব পরিবারের নৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক। এই মতের বিরুদ্ধে অন্যান্যদের সঙ্গে 'পেনসেলভেনিয়ার' লর্ড ডসনের নিম্নলিখিত অভিমত উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে।

> "পৃথিবীতে যৌনপ্রেম সবচেয়ে সোচ্চার ও প্রভাব বিস্তারী শক্তিগুলোর অন্যতম। এ এমনই একটিবৃ ত্তি তা যেমন মৌলিক তেমনি প্রভুত্বব্যঞ্জক যার প্রভাব স্বীকার করতেই হবে, আর দমন একে কোন মতেই করা যায় না। আপনি একে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত করতে পারেন কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। আর সেই অভিব্যক্তির পথ যদি যথেষ্ট প্রশস্ত না হয় বা অযথা বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে তা অস্বাভাবিক স্রোতে প্রবাহিত হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের একটা সীমা আছে এবং যদি কোন সমাজে বিবাহ কঠিন হয় বা দেরীতে হয় তাহলে অবৈধ মিলনের সংখ্যা অনিবার্যভাবে বেড়ে যাবে। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে অন্তর ও আত্মার

মিলনের সহযোগেই দেহের মিলন হওয়া উচিত আর এ বিষয়েও সকলে একমত যে সন্তান পালন একটি উল্লেখযোগ্য আদর্শ। সৃজনের কোন চিন্তা বা উদ্দেশ্য ছাড়া বারংবার যৌনমিলন কি প্রেমের দেহধর্মী প্রকাশ নয়? আমরা সকলেই কি ভুল করেছি? কিংবা এ কথাই কি মানতে হবে যে খৃষ্টধর্মে জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে প্রাণবন্ত কোন বন্ধন নেই? যার ফলে খৃষ্টধর্ম ও জনসাধারণের মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। কোন কর্তৃত্বের কাছে—যার মধ্যে আমি খৃষ্টধর্মের কর্তৃত্বকে অন্তর্ভুক্ত করি—যুবকেরা নতি স্বীকার করবে না যদি না সেই কর্তৃত্ব অনেক বেশী নির্ভীক ও সরল হয় আর বাস্তবতার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যদি না তার যোগ থাকে।

"পিতৃত্বের আকাঙ্খা ছাড়াও যৌনপ্রেমের নিজস্ব একটি প্রয়োজনীয়তা আছে। দাম্পত্যজীবনে সুখ ও স্বাস্থ্য বিধানের এ অপরিহার্য অঙ্গ। যদি যৌন মিলন ঈশ্বরের দান হয় তবে তার সম্ভোগ সম্বন্ধে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আপন সীমার মধ্যে এই যৌন মিলনকে এমনভাবে উপভোগ করতে হবে যাতে এ দুজনেরই দৈহিক আনন্দ ঘটায়—কেবল মাত্র একজনের নয়। পারস্পরিক সম্ভোগ-সুখলাভের মাধ্যমে উভয়ের বিবাহবন্ধন স্থায়িত্বলাভ করে। অপর্যাপ্ত ও অতিব্যস্ততায় সংঘটিত যৌন মিলনে যত বিবাহের ব্যর্থতা ঘটে অতি মিলনে তত নয়। কামাবেগ আমাদের একটি পরম সম্পদ আর পৌরুষ যাদের আছে সেইসব পুরুষই এই কামোপভোগে সমর্থ। কামাবেগ ছাড়া যৌন মিলন নিষ্প্রাণ প্রক্রিয়া। পক্ষান্তরে ঔদারিকতার পর্যায়ে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অমিতাচার মাত্র। এখন যখন বাইবেলের পুনঃসংস্করণের কথা ভাবা হচ্ছে তখন আমি সবিনয়ে বিবেচনার জন্য এটুকু বলতে চাই যে বিবাহ সম্বন্ধে একটি নতুন সংযোজন করে উপাসনায় এই কটি কথা বলা হোক 'এই পুরুষ ও এই রমণীর ভালবাসার পুর্ণ উপলব্ধি হউক—ইহারা একে অন্যের জন্য'।

"এখন আমি জন্মনিয়ন্ত্রণের অতি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চাই। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখানে থাকবেই—এ স্বতঃসিদ্ধ, আর ভালর জন্যই হোক বা মন্দর জন্যই হোক একে মেনে নিতে হবে। নিন্দে করে একে বিনষ্ট করা যাবে না। যে যে কারণে মা-বাবারা তাদের সন্তানসংখ্যা

সীমিত রাখতে চান তা কখনও বা স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পেছনে পর্যাপ্ত যুক্তি থাকে ও তা আত্মমর্যাদাও বাড়ায়। বিবাহের ইচ্ছা, জীবন-সংগ্রামে সুশিক্ষিত সন্তান পালনের যোগ্যতা, অপ্রতুল আয়, জীবনযাত্রার মানরক্ষা, দুঃসহ করভার—এর সবগুলোই যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। উপরন্তু শিক্ষিত নারীসম্প্রদায়ের মধ্যে জীবন-যুদ্ধের অভিলাষ ও আপন স্বামীর জীবনে সহকর্মিনী হবার ইচ্ছেও আছে—আর সেই ইচ্ছাপুরণ বারংবার গর্ভসঞ্চারের দ্বারা সম্ভব নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকলে দেরীতে বিবাহ ঘটবে আর তার ফলে অবৈধ সহবাস ও তার অকল্যাণকর ফলশ্রুতি অনিবার্য। একদিকে অবৈধ মিলনের নিন্দে ও অন্যদিকে ঠিক সময়ে বিবাহের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা—দুইই অর্থহীন। অনেকে বলে থাকেন যে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হতে পারে তবে তা শুধু সেই ক্ষেত্রেই সমর্থনযোগ্য যে ক্ষেত্রে সংযম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। এরকম নিবৃত্তি হয় ফলপ্রসূ হবে না কিংবা যদিও বা ফলপ্রসূ হয় তাহলে তা অবাস্তব ও পরস্পরের স্বাস্থ্য ও শান্তির বিশেষ ক্ষতিকর হবে। পরিবারের আকার যদি চারটি সন্তানের মধ্যেই সীমিত রাখতে হয় তবে বিবাহিত দম্পতিকে দীর্ঘকাল সম্ভোগ থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে আর তা প্রায় কৌমার্য রক্ষার মত হবে ; আবার যখন এও মনে রাখতে হয় যে বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে—যখন সংগম স্পৃহা সর্বাধিক—আর ঠিক যখন অর্থনৈতিক কারণে এই সংযম অভ্যেস বেশী কঠোরতার সঙ্গে পালন করতে হয়, আমার ধারণা সেই অবস্থায় এই স্বেচ্ছাসংযমের প্রত্যাশা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুরণ করা সম্ভব হবে না—আর এই সেচ্ছাসংযমের প্রয়াসে এমন এক ক্লেশদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হবে যা তাদের নীতিবোধের পক্ষেও সমূহ বিপদের কারণ হবে। এ একটি অবাস্তব পরিকল্পনা। আপনি যেন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির সামনে জল রেখে তাকে তা পান করতে বারণ করছেন। না, নিবৃত্তির মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ হয় নিরর্থক কিংবা যদিও বা সফল হয় তা মারাত্মক।

"জন্মনিয়ন্ত্রণকে অস্বাভাবিক ও মূলেই নীতিবিরুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। সভ্যতার লক্ষণই হলো প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে করায়ত্ত করে মানুষের ইচ্ছেমত ব্যবহার করা। প্রসবকালে অনুভূতি অসাড় করবার জন্য যখন

প্রথম ঔষধের ব্যবহার আরম্ভ হয় তখনও এই ব্যবহারকে নিন্দনীয় ও অস্বাভাবিক বলে রব উঠেছিল কারণ নারীদের যন্ত্রনা দেওয়াই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণেও বেশী কিছু অস্বাভাবিকতা নেই। জন্মনিযন্ত্রণের যথাযথ প্রয়োগ মঙ্গলকর যেমন এর অপব্যবহার মন্দ। আমি খৃষ্টধর্মের কর্তৃপক্ষের কাছে এই আবেদন করে শেষ করতে পারি কি যে তারা যেন অনুরূপ অন্য কয়েকটি সমস্যার মত এটিকেও নতুন জ্ঞানের আলোকে নতুন পৃথিবীর প্রয়োজনে ও যে সব পুরানো প্রথার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাদের অস্বীকার করে প্রশ্নটি বিচার করেন।"

লর্ড ডসনের খ্যাতি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে তাঁর প্রাধান্যের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়ে তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলবার আগ্রহ আমার হচ্ছে; বিশেষতঃ এই কারণে যে তার এই যুক্তি যে সমস্ত নরনারী সংযমী জীবনযাপন করে কোনরকম শারীরিক বা নৈতিক ক্ষতি ভোগ করেননি তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিরোধী। চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ সেইসব লোকেরই সংস্পর্শে আসেন যারা স্বাস্থ্যের বিধি লঙ্ঘন করায় কোন না কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। অতএব তারা প্রায়ই রুগ্ন লোকদের নিরাময় হবার জন্য যা করার প্রয়োজন তারই বিধান দিয়ে থাকেন। কিন্তু একটি বিশেষ আদর্শে উদ্বুদ্ধ স্বাস্থ্যবান নরনারী কতখানি করতে সক্ষম তা তারা সবক্ষেত্রে নাও জানতে পারেন। সুতরাং সংযম বিবাহিত দম্পতির ওপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সে সম্বন্ধে লর্ড ডসনের বক্তব্য বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বিবাহিত নরনারীর মধ্যে যৌনসুখ বিধি-সম্মত এরকম মনে করবার প্রবণতা আছে। কিন্তু আজকাল যখন আমরা কিছুই নিঃসর্তে গ্রহণ করি না, আর যখন প্রতিটি মতই যুক্তি-সঙ্গতভাবে যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হয় তখন এরকম বলা নিশ্চয়ই ভুল হবে যে যেহেতু আমরা এতাবৎ বিবাহিত জীবনে অমিত যৌন সম্ভোগ করেছি সেই কারণে এই অভ্যেস বিধিসম্মত বা স্বাস্থ্যকর। পুরোনো

বহু আচার বর্জিত হয়েছে আর তার ফলও ভালই হয়েছে। অতএব এই বিশেষ অভ্যাসটিকেই বা বিশ্লেষণের বাইরে রাখা হবে কেন? বিশেষতঃ যখন দেখা যায় যে বিবাহিত এমন অনেক নরনারী আছেন যারা সংযত জীবনযাপন করে পারস্পরিক দেহ ও মনের মঙ্গলসাধনই করেছেন।

ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার কথা ভেবেও জন্মনিরোধক জিনিষগুলো সম্বন্ধে আমার আপত্তি। ভারতীয় যুবকেরা যৌনসংযম কাকে বলে জানে না—এ তাদের ত্রুটি নয়। শিশু বয়সেই তাদের বিয়ে হয়—এ তাদের সামাজিক রীতি। বিবাহিত জীবনে সংযম অভ্যেসের কথা কেউই তাদের বলে না। বাবা-মায়েরা নাতি-নাত্‌নীর মুখ দেখবার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন। অসহায়া বালিকাবধূদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জননী হবার উৎসাহ তাদের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকে। এরকম পরিবেশে জন্মনিরোধক ব্যবহার আরও গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি করবে। বেচারী মেয়েরা—যাদের স্বামীর কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করবারই কথা তাদের এখন এক নতুন শিক্ষা দেওয়া হবে যে সন্তান ধারণের ইচ্ছে ছাড়াও যৌন পরিতৃপ্তিতে ভালই হবে, আর এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনে তাদের জন্মনিরোধকের স্মরণ নিতে হবে।

আমার মতে বিবাহিত নারীর পক্ষে এরকম শিক্ষা মারাত্মক। আমি বিশ্বাস করি না যে নারীদের ক্ষেত্রে যৌন লিপ্সা পুরুষের মত তীব্র। পুরুষের চেয়ে নারীর পক্ষেই আত্মসংযম অভ্যেস বেশী সহজ। আমার ধারণা এই দেশে সত্যিকারের শিক্ষা হলো এই যে স্ত্রীরা যেন তাদের স্বামীদের "না" বলবার সাহস অর্জন করেন। তারা এও যেন শেখেন যে স্বামীদের হাতের কেবলমাত্র যন্ত্র বা খেলার পুতুল হওয়াই তাদের উচিত নয়। তার যেমন কর্তব্যও আছে তেমনি অধিকারও আছে। যারা সীতার মধ্যে শুধুমাত্র রামের অনুগতা এক আগ্রহী ক্রীতদাসীকে দেখেন তারা উপলব্ধি করতে

পারেন না যে সীতার স্বাতন্ত্র্য কত মহিমাময়, বা সব বিষয়ে রাম তার প্রতি কত সংবেদনশীল। আপন সম্ভ্রম রক্ষায় অসমর্থা একটি দুর্বলা রমণী সীতা ছিলেন না। ভারতীয় নারীদের জন্মনিরোধক জিনিষ ব্যবহার করতে বলা ঘোড়ার আগে গাড়ী রাখার মত।

সর্বাগ্রে তাদের মন থেকে দাসভাব দূর করতে হবে—তাদের দেহের পবিত্রতা সম্বন্ধে তাদের অবহিত করতে হবে আর দেশের ও দশের সেবার যে মর্যাদা ও গৌরব সে বিষয়ে তাদের সচেতন করতে হবে। ভারতীয় নারীদের মুক্তিলাভের কোন আশা নেই অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য জন্মনিরোধক ব্যবহারের সকল পাঠ তাদের নিতেই হবে আর তাতেই তাদের যেটুকু স্বাস্থ্য আছে তা অটুট থাকবে—এ মনে করা সঙ্গত হবে না।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সন্তান ধারণ করতে বাধ্য এই নারীদের দুঃখের কথা ভেবে আমার বোনেরা যেন অধীর না হন। ঈপ্সিত ফল রাতারাতি পাওয়া যাবে না—এমন কি জন্মনিরোধকের পক্ষে প্রচারের মাধ্যমেও নয়। প্রতিটি পদ্ধতি শিক্ষা সাপেক্ষ। আমি শুধু সঠিক পদ্ধতির পক্ষে।

আত্মসংযম

"আত্মসংযমের ওপর আপনার সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলো যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আপনার মতের সঙ্গে যাদের মিল আছে তারাও দীর্ঘকালের জন্য আত্মসংযম অভ্যেস কঠিন বলে মনে করেন। তাঁরা এরকম যুক্তি দেখান যে আপনি আপনার নিজের অভিজ্ঞতা ও অভ্যেসগুলো সমস্ত মানবজাতির ওপর প্রয়োগ করছেন। এমন কি আপনি এও স্বীকার করেছেন যে আপনি নিজেও সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মচারী হতে পারেননি, কারণ আপনি নিজেও পশুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন। যেহেতু বিবাহিত দম্পতিদের সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অপনি একমত সেজন্য সাধারণ মানুষের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মনিয়ন্ত্রক জিনিষ ব্যবহার করাই একমাত্র কার্যকরী পন্থা।"

আমার চারিত্রিক ত্রুটিগুলো আমি সবসময়ই মেনে নিই। কিন্তু সংযম ও কৃত্রিম নিরোধকের বিরোধে ঐ ত্রুটিগুলোই আমার গুণ-স্বরূপ। কারণ আমার ত্রুটিগুলো নিঃসন্দেহে এই প্রমাণ করে যে আমিও অধিকাংশের মতই রক্তমাংসে গড়া মানুষ আর অসাধারণ কোন গুণের অধিকারী আমি নই। আমার আত্মসংযমের লক্ষ্যও খুব সরল—তা হলো এই যে দেশের ও মানবতার সেবার উদ্দেশ্যে বংশধরদের সংখ্যা সীমিত করা। দশের ও দেশের সেবার সুদূর লক্ষ্যেব চেয়ে বড় পরিবার পালনের অক্ষমতাই এ বিষয়ে বেশী উৎসাহের সঞ্চার করবে। পয়ত্রিশ বছর ধরে আত্মসংযম করেও আজও যে আমার ভেতরের পশুটির উপর সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হয় তাতেই নিঃসন্দেহে এই প্রমাণিত হয় যে আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। সুতরাং আমি নিবেদন করি যে যা আমার পক্ষে সম্ভব তা যে কোন মানুষের পক্ষেই সাধ্যমত চেষ্টা করলেই করা সম্ভব।

কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধের প্রচারকদের সঙ্গে আমার মত-বিরোধ এই কারণে যে তারা ধরে নিয়েছেন যে সাধারণ মানুষেরা

আত্মসংযমে অসমর্থ। নিজের নিজের ক্ষেত্রে তাদের যতই খ্যাতি থাকুক না কেন আমি তাদের সবিশেষ বিনয়ে ও গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে জানাতে চাই যে সংযম সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁদের অনভিজ্ঞতার কারণেই তাঁরা এরকম বলছেন। মানবতার শক্তির ওপর সীমা আরোপ করার কোন অধিকার তাঁদের নেই। এসব ক্ষেত্রে আমার মত একজনের অভিজ্ঞতা, অবশ্য যদি তা বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে তা শুধুমাত্র বেশী মূল্যবানই নয় উপরন্তু তা স্থির সিদ্ধান্তে আনবে। যেহেতু জনসাধারণ আমাকে 'মহাত্মা' বলে মনে করেন সেই কারণে বিশ্লেষণের জন্য আমার দৃষ্টান্তকে অবহেলা করা উচিত নয়।

আর একজন বোনের যুক্তির মধ্যে অনেক বেশী সারবত্তা আছে। মূলতঃ তিনি বলেছেন 'আমরা যারা কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থক তারা খুব সম্প্রতিই এ বিষয়ে অবহিত হয়েছি। আপনারা আত্মসংযমীরা যুগ যুগ এমন কি হাজার হাজার বছর ধরে অবাধে আপনাদের মত প্রচার করেছেন। তার ফলে আপনাদের মতের সমর্থনে কিছু ঘটেছে কি? জগৎ কি সংযমের শিক্ষা গ্রহণ করেছে? অতি ভারে অবসন্ন পরিবারগুলোর দুঃখ মোচনে আপনারা কি করেছেন? অবহেলিত মাতৃত্বের কান্না কি আপনারা শুনতে পেয়েছেন? বেশ তো, এখনও ক্ষেত্র আপনাদের জন্য খোলাই আছে। আপনাদের আত্ম-সংযমের প্রচারে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। স্বামীর অবাঞ্ছনীয় সমাদর থেকে হয়তো বা স্ত্রীকে রক্ষাও করতে পারেন—সেই সম্ভাবনায় আপনাদের সার্থকতাও কামনা করি। কিন্তু আমাদের গৃহীত পন্থাগুলো যা মানুষের সাধারণ দুর্বলতা স্বীকার করে নেয় ও তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করে আর যে পন্থাগুলো ঠিকমত অনুসৃত হলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সার্থক হয়—সেগুলোর নিন্দে আপনারা কেন করেন?'

এই ব্যঙ্গোক্তি ক্রমবর্ধমান সন্তান সংখ্যার কারণে সব সময় অভাবগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সংবেদনশীলা এক বোনের তীব্র মনো-বেদনা থেকে উৎসারিত হয়েছে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় পাথরের

হৃদয়ও বিচলিত হয় বলে শোনা যায়। উন্নতমনা বোনেদের এ কি করে অভিভূত না করে পারে? কিন্তু এই আবেগ বিপথেও নিয়ে যেতে পারে—যদি কেউ পদস্খলিত হন ও ডুবে যাওয়া মানুষের মত ভাসমান তৃণ টুকুকে আঁকড়ে ধরতে চান।

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন মূল্যবোধের পরিবর্তন খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে। ফললাভে মন্থরতা দেখা দিলে আমরা অখুশী হই। শুধু নিজের নিজের সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধনেই আমরা তৃপ্ত নই এমন কি শুধু আমার দেশের মঙ্গল সাধনেও নয়। আমরা সমগ্র মানব জাতিব জন্য ভেবে থাকি বা ভাবতে চাই। মানব জীবনের আদর্শলাভের প্রয়াসে এ খুবই সহায়ক।

অধীর হয়ে যা কিছু প্রাচীন তা শুধু প্রাচীন বলেই বর্জন করলে মানব জাতির দুঃখ দূর করবার পথ খুঁজে পাব না। আজও যে স্বপ্ন আমাদের উৎসাহে উদীপ্ত করছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা হয়তো বা অস্পষ্টভাবে সেই স্বপ্নই দেখেছেন। একই রোগের যে প্রতিষেধক তারা প্রয়োগ করেছিলেন আজ দৃষ্টির সীমা আশাতীতভাবে বিস্তৃত হলেও হয়তো বা সেই প্রতিষেধক একইভাবে প্রযোজ্য। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই যুক্তি দিতে পারি যে সত্য ও অহিংসা যেমন সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেকের দৈনন্দিন অভ্যাসের জন্য—নির্বাচিত কয়েকজনের জন্য নয়—তেমনই আত্মসংযমও শুধুমাত্র কয়েকজন মহাত্মার জন্য নয় বরং সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য। আজও যেমন অনেক লোক মিথ্যেবাদী বা হিংসা-ধর্মী রয়েছেন আর এই কারণেই যেমন মানবজাতির আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় না তেমনি যদি অনেকে হয়তো বা অধিকাংশ লোকই আত্ম-সংযমের আহ্বানে সাড়া দিতেও অক্ষম হন তবু আমরা আমাদের আদর্শ ছোট করবো না—পরাজয় স্বীকার করবো না।

মামলা কঠিন হলেও কোন বিজ্ঞ বিচারক ভুল বিচার করেন না। বাইরে তিনি নিজেকে কঠিনহৃদয় বলে পরিচিত হতে দেবেন

কেননা তিনি জানেন যে মন্দ বিধান রচনার দ্বারা ন্যায়সম্মতভাবে কল্যাণ সাধন করা যায় না।

দেহের অন্তরস্থ অবিনশ্বর আত্মার দোহাই দিয়ে আমরা মরদেহের দুর্বলতাগুলোকে সমর্থন করতে পারব না। যে নৈতিক বিধান আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেব দেহকেও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। আমার বিনীত অভিমত এই যে এই বিধানগুলোর সংখ্যাও যেমন অল্প তেমনই অপরিবর্তনীয়—পরিবারের সকলেই এগুলো বুঝতেও পারে, অনুসরণও করতে পারে। বিধিগুলোর প্রয়োগমাত্রার পার্থক্য ঘটলেও প্রয়োগপদ্ধতির ব্যতিক্রম কখনই নয়। যদি বিশ্বাস থাকে তবে আমরা তা কখনই হারাবো না কারণ হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর অতিবাহিত না হলে মানবতার লক্ষ্যের উপলব্ধি কিংবা তার সমীপবর্তী হওয়া বা তার অভিমুখে নিশ্চিত পদক্ষেপ সম্ভব হবে না। জওহরলালের ভাষায় আমাদের আদর্শ যেন নির্ভুল থাকে।

কিন্তু আমার বোনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আত্মসংযমীরা অলস হয়ে বসে নেই—তাঁরা তাঁদের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের পদ্ধতি যেমন কৃত্রিম জন্মনিরোধ থেকে আলাদা তেমনই আলাদা তাদের প্রচার পদ্ধতি, আর তা হতেই হবে। আত্ম-সংযমীদের কোন ক্লিনিকের প্রয়োজন নেই, তাঁরা তাঁদের ওষুধের কোন বিজ্ঞাপনও দিতে পারেন না। তার সহজ কারণ এই যে এ এমন একটি জিনিষ যা বিক্রি করাও যায় না—দান করাও যায় না। কিন্তু কৃত্রিম নিরোধক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের সমালোচনা বা এগুলো ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধানবাণীই তাঁদের প্রচারকাজের অঙ্গ। অবশ্য এর একটি গঠনমূলক দিকও আছে কিন্তু স্বভাবতঃই তা চোখেও দেখা যায় না অনুভবও করা যায় না। আত্মসংযমের প্রচার কোন সময়েই বন্ধ হয় নি। দৃষ্টান্তেই প্রচারের সবচেয়ে বেশী সার্থকতা। সৎলোকেরা যত বেশী সংখ্যায় সার্থকতার সঙ্গে সংযম অভ্যেস করবেন—প্রচারকাজও তত বেশী ফলপ্রসূ হবে।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য

একজন বন্ধু লিখছেন—

"সার্থক জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য আত্মসংযমই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলে বহুদিন যাবৎ আমি আপনার সঙ্গে এক মত পোষণ করে আসছি। একমাত্র প্রজননের জন্যই যে যৌনক্রিয়ার প্রয়োজন ও এ ছাড়া যে কোন ভাবে বা প্রণালীতেই এ ঘটুক না কেন তা স্বভাববিরুদ্ধ রতিসুখ বা কামাচার হবে এতে কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু কখনও কখনও এর ফলে গভীর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যদি বা কোন ক্ষেত্রে এক বা দুবার রতিক্রিয়ার ফলে গর্ভসঞ্চার না হয় সেই অবস্থায় কি করা উচিত? কি ভাবে এর সংখ্যাসীমা নির্দ্ধারণ করা যাবে? সন্তানলাভের আশা একেবারেই ত্যাগ করা খুবই কঠিন। অন্যদিকে মাত্রাহীন যৌন সম্ভোগ নিশ্চিতই মানুষের জীবনী-শক্তি নিঃশেষিত করবে। আবার এক বা দুবার চেষ্টায় সন্তানলাভের ব্যর্থতাকে ভাগ্যের বিড়ম্বনা মনে করে সেই কারণে সঙ্গমক্রিয়া থেকে বিরত থাকাই কি উচিত হবে? কিন্তু এইরকম ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে অসাধারণ আত্মসংযম ও নৈতিক শক্তির অধিকারী হতে হবে। পূর্ণ যৌবনেও পৌরুষের তুঙ্গে থাকাকালীন বারবার ব্যর্থ হলেও বিগত যৌবনে সার্থক প্রজননের দৃষ্টান্তও একেবারে অজানা বা বিরল নয়। এই কারণে পূর্ণসংযম অভ্যাস বেশী কঠিন ও অবস্থাটি আরও জটিল হয় যখন স্বামী বা স্ত্রীর শারীরিক কোন পঙ্গুতা থাকে না ও অন্য সব বিষয়েও স্বাস্থ্যবান হয়।"

এ যে কঠিন তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই জটিলতা সমস্যার মধ্যেই রয়েছে। যে কোন অগ্রগতির পথেই এই রকম বহু বাধা থাকে ও বিবর্তনের পথে মানুষের অগ্রগতি ঠিক ততটুকুই হয় যতটুকু সে এই প্রতিকূলতাকে কৃতিত্বের সঙ্গে জয় করতে পারে। হিমালয় জয় করার প্রচেষ্টার কাহিনীই ধরা যাক, যতই ওপরে উঠবে আরোহণ ততই কঠিন হবে। আবার আরোহণের পথ এতই

খাড়া হয় যে সবচেয়ে উঁচু শিখরটি শেষপর্যন্ত অপরাজিতই থেকে যায়। এর আগে এই অভিযানে মূল্য স্বরূপ অনেক প্রাণের আহুতি দিতে হয়েছে। তবুও প্রতি বছরই নতুন নতুন অভিযান সুরু হয় অবশ্য পরিণতিতে আগের মতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবুও অভিযাত্রীদের আগ্রহ কিছুমাত্র কমেনি। হিমালয় জয়ের বিষয়েই যদি এই হয় তাহলে যা বেশী কঠিন ও যার পুরস্কার বেশী মূল্যবান সেই কঠোরতর আত্মজয়ের ব্যাপারে কি অবস্থা হতে পারে? হিমালয় আরোহণে খুব বেশী হলে স্বল্পস্থায়ী জয়ের আনন্দ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আত্মজয়ের পুবস্কারে এমন একটি আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ লাভ হয় যার ক্ষয় নেই এবং যা উত্তরোত্তব বাড়তে থাকে। ব্রহ্মচর্যবিজ্ঞানের এ একটি সুপরিচিত নীতি যে যিনি যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্যের বিধিগুলো পালন করেছেন তার ক্ষেত্রে প্রজনন কখনও ব্যর্থ হতে পারে না—হওয়া উচিতও নয়। মানুষ যখন সম্পূর্ণভাবে তার পশুত্বকে জয় করে তখন কোন অনভিপ্রেত ইন্দ্রিয়পবায়ণতা অসম্ভব হয় ও কেবলমাত্র রতিসুখেব জন্য যৌনআবেগ সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়। তারপর কেবলমাত্র সন্তানকামনার উদ্দেশ্যেই যৌন সঙ্গম হয়। বিবাহিত ব্রহ্মচর্য বলে যা বর্ণিত হয়েছে এ তারই তাৎপর্য। যিনি এই নিয়ম পালন করেন তিনি যদিওবা বিবাহিত জীবনযাপন কবেন তবু তিনি, যিনি সম্পূর্ণভাবে যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকেন তার সমকক্ষ ও সমগুণ সম্পন্ন হবেন কেননা যৌন-ক্রিয়া কেবলমাত্র প্রজননের জন্য—আত্মসুখের জন্য নয়। বাস্তব দিক থেকে এ অবশ্যই ঠিক যে এই আদর্শকে কদাচিৎ কেউ উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু আমাদের আদর্শ রচনায় আমরা দুর্বলতা বা সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু এখন হাওয়া অন্যদিকে বইবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে,—জন্মনিরোধের প্রচারকেরা ইন্দ্রিয়সুখলিপ্সাকে প্রায় তাদের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে। এই ইন্দ্রিয়লিপ্সা নিশ্চয়ই কখনও আদর্শ হতে পারে না।

আদর্শলাভের প্রয়াসে কোন সীমা থাকতে পারে না। কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন যে অবাধ ইন্দ্রিয়ভোগের ফলে নিজের ও নিজের জাতির নিশ্চিত বিনাশ ঘটানো হয়। সুতরাং একমাত্র সংযমই আমাদের আদর্শ হতে পারে—প্রাচীনকাল থেকে এই রকমই বিবেচনা করা হচ্ছে। অতএব সংযমের সার্থকতার জন্যই আমাদের চেষ্টা করতে হবে—একে এড়াবার জন্য নয়।

আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে ব্রহ্মচর্য অভ্যাস সম্বন্ধে যে সমস্ত অসুবিধে ভোগ করা হয়ে থাকে তা ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলির অজ্ঞতার কারণেই হয়, তাই এগুলো জানলে অসুবিধে আপনা থেকেই দূর হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে পত্র লেখকের উল্লিখিত সমস্যাটি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ অনুকূল পরিবেশে এইরকম পরিস্থিতি কখনই উদ্ভব হতে পারে না কারণ স্বাভাবিক সুস্থ দম্পতি যারা শিশুকাল থেকে ব্রহ্মচর্যনীতি পালন করেছেন তাদের ক্ষেত্রে যৌনসঙ্গম কখনই গর্ভসঞ্চার না করে পারে না। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে সময় সময় অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। এইরকম ক্ষেত্রে একমাত্র যে নিয়মের কথা বলা যেতে পারে তা এই যে গর্ভসঞ্চার না হওয়া পর্যন্ত মাসিক ঋতুর শেষে একবার মাত্র সঙ্গম অনুমোদনযোগ্য। এই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া মাত্রই এ ত্যাগ করা উচিত; কারণ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই কখনও এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে দেহের ও মনের পবিত্রতা রক্ষার অনুপাতে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা যে বস্তু মানুষের মত এক আশ্চর্য প্রাণীর সৃষ্টি করতে সক্ষম তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হলে অতুলনীয় শক্তি ও বীর্যে রূপান্তরিত না হয়ে পারে না। শাস্ত্রের এই উক্তির সত্যতা ব্যক্তিগত অভ্যাসের মাধ্যমে যে কেউ পরীক্ষা করতে পারেন। এই নিয়ম পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন নারীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ-

ভাবেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রকৃত সমস্যা এই যে অন্তরে কামনা পোষণ করে এর বহিঃপ্রকাশ থেকে আমরা মুক্ত থাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করি—ফলে দেহে ও মনে আমাদের সম্পূর্ণ বৈকল্য আসে ও গীতার ভাষায় আমাদের জীবন একটি জীবন্ত মিথ্যা ও কপটতার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

নৈতিক সমস্যা

একজন বন্ধু লিখছেন—

"প্রায় আড়াইবছর আগে এই সহরে একটি শোকাবহ সামাজিক ঘটনা খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। একজন বৈশ্য ভদ্রলোকের একটি ষোড়শী কন্যা ছিল। মেয়েটির একুশ বছর বয়সের এক মাতুল ছিল—সে ঐ সহরেরই এক কলেজে পড়তো। তারা গোপনে পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। শোনা যায় মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়। শেষে সত্যি ঘটনা যখন জানাজানি হল প্রেমিক দুজন বিষপ্রয়োগে আত্মহত্যা করে। মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় ও এর দুদিন পরে হাসপাতালে যুবকটিও মারা যায়। এই ঘটনায় তর্কবিতর্কের এক আলোড়ন উঠেছিল ও লোকের মুখে মুখে এ এমনভাবে সঞ্চালিত হতে লাগলো যে হতভাগিনী মেয়েটির মা-বাবার পক্ষে ঐ সহরে বাস করা কঠিন হয়ে উঠ্‌লো। আস্তে আস্তে সঙ্কট কেটে গেল কিন্তু ঘটনাটির স্মৃতি আজও অধিবাসীদের মনে রয়েছে—সেই রকম প্রসঙ্গ উঠ্‌লেই প্রায়ই এই ঘটনার উল্লেখ করা হয়। ঠিক সেই সময় যখন নিন্দাবাদের ঝড় সবচেয়ে বেশী ছিল—যখন মৃত হতভাগ্য প্রণয়ীদের জন্য এতটুকু সহানুভূতিও কেউ দেখাতো না তখনই আমি সকলকে স্তম্ভিত করে এই মত প্রকাশ করেছিলাম যে ঘটনার পরিস্থিতিতে প্রণয়ীদের স্বনির্বাচিত পথ অনুসরণ করতে দেওয়াই উচিত ছিল কিন্তু আমার ঐ কথা অরণ্যে রোদনই হলো। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত ?"

আমি ইচ্ছে করেই পত্রলেখকের নাম ঠিকানা ও ঘটনাস্থলের নাম অবশ্য পত্রলেখকের অনুরোধেই গোপন রেখেছি, কেননা লেখক চান না যে পুরোনো প্রসঙ্গের পুনরালোচনা করে এর তিক্ততা পুনরুজ্জীবিত হয়। সে যাই হোক্ আমার মনে হয় যে এই রকম সঙ্কোচজনক প্রসঙ্গের সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমার মতে বিশেষ কোন সমাজে নিষিদ্ধ এই রকম বিবাহকে একেবারে এককথায় বা একজনের ইচ্ছেয় স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

আবার এই রকম বিবাহে ইচ্ছুক তরুণদের ওপর নিজেদের ইচ্ছে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বা তাদের ইচ্ছেমত কাজ করার স্বাধীনতা কেড়ে নেবার কোন অধিকার সমাজের বা সংশ্লিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের নেই। সংবাদদাতার উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে দুই পক্ষই সম্পূর্ণভাবে পরিণত-বুদ্ধি—নিজের ভালমন্দ বুঝবার বয়সও তাদের হয়েছিল। তারা পরস্পরকে বিয়ে করতে চাইলে জোর করে বাধা দেবার অধিকার কারুরই ছিল না। খুব বেশী হলে সমাজ হয়ত এই বিবাহকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করতো কিন্তু এইভাবে তাদের আত্মহত্যার পথে নিয়ে যাওয়া উৎপীড়নের এক চরম দৃষ্টান্ত।

বিবাহ সম্বন্ধে নিষেধ-বিধি সার্বজনীন নয়—সামাজিক প্রথার ওপরই তা রচনা করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ও এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশের মধ্যে রীতিনীতির পার্থক্য আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সুপ্রতিষ্ঠিত সব সামাজিক রীতিনীতি ও নিষেধই যুবকেরা ইচ্ছেমত অবহেলা করবেন। এইরকম করবার আগে জনমতকে তাদের অনুকূলে আনতে হবে। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ধীরভাবে অনুকূল সময়ের জন্য অপেক্ষা করবেন আর যদি তারা তা না পারেন তবে সামাজিকভাবে শ্রেণীচ্যুত হবার ফল ধীর ও শান্তভাবে মেনে নেবেন।

আবার সমাজেরও উচিত যে যদি কেউ প্রচলিত রীতি অবহেলা করে বা লঙ্ঘন করে তবুও তার প্রতি নির্মম বিমাতৃসুলভ আচরণ না করা। এই দৃষ্টান্তে—যার বর্ণনা লেখক আমার কাছে দিয়েছেন অবশ্য তা যদি সত্যিই নির্ভুল বর্ণনা হয় তবে এই তরুণ-তরুণী দুটিকে আত্মহত্যায় চালিত করার পাপ সমাজের ওপরই ন্যস্ত হবে।

বিবাহের আদর্শ

একজন বন্ধু লিখছেন—

'হরিজন সেবকের' সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নৈতিক সমস্যা প্রবন্ধে আপনি মন্তব্য করেছেন যে বিবাহ বিষয়ে অনেক নিষেধাজ্ঞাই সামাজিক রীতি থেকে এসেছে বলে মনে হয়। কোন ক্ষেত্রেই তারা অত্যাবশ্যক নৈতিক বা ধর্মীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয় না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নিজের মত এই বলে যে সম্ভবতঃ এই নিষেধাজ্ঞাগুলো প্রজনন উৎকর্ষতার জন্যই করা হয়েছিল। প্রজনন-বিজ্ঞানের এ একটি সুপরিচিত নীতি যে অন্যগোত্রে সংগমজাত সন্তানের একগোত্র সংগমজাত সন্তানের চেয়ে গুণগত যোগ্যতা বেশী। এই কারণেই হিন্দু ধর্মে সগোত্র ও সপিণ্ডে বিবাহ নিষিদ্ধ। আবার যদি কেবল সামাজিক রীতি এই রকম নিষেধাজ্ঞার একমাত্র যুক্তি বলে মেনে নেওয়া হয় তবে ঐ রীতির গুণগত বৈচিত্র্য বা পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও কাকা-ভাইজী বা ক্ষেত্রবিশেষে ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পক্ষে প্রবল যুক্তি থাকে না। আপনার কথানুযায়ী যদি সন্তান প্রজননই বিবাহের একমাত্র বৈধ উদ্দেশ্য হয় তবে সাথী নির্বাচনেও কেবলমাত্র বংশগত সামঞ্জস্যের প্রশ্ন ওঠে। অন্য সব সংশ্লিষ্ট বিচার্য বিষয়গুলো কি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে হবে? যদি তা না হয় তাহলে এদের পারম্পর্য কিভাবে করতে হবে? আমি এগুলো এইভাবে ঠিক করতে চাই।

(১) পারস্পরিক আকর্ষণ বা প্রেম।

(২) বংশগত যোগ্যতা।

(৩) সংশ্লিষ্ট পরিবারের অনুমোদন, অনুমতি ও নিজ সম্প্রদায়ের মঙ্গলের প্রশ্ন।

(৪) আধ্যাত্মিক উন্নতি।

এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

"হিন্দু শাস্ত্র প্রজননকেই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে স্থির করেছেন। ভাবী গৃহবধূকে তার গুরুজনেরা বিয়ের সময় যখন সেই প্রাচীন আশীর্বাদ

করেন যে 'তুমি আটটি সন্তানের সৌভাগ্যবতী জননী হও' তা থেকেই এই ধারণা হয়। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কখনই নয়—কেবলমাত্র সন্তান প্রজননের উদ্দেশ্যেই বিবাহে সঙ্গম করা উচিত—আপনার এই যুক্তি এর দ্বারা সমর্থিত হয়। কিন্তু আপনি কি এই আশা করেন যে বিবাহিত দম্পতি একটি মাত্র সন্তানলাভ করেই সন্তুষ্ট থাকবেন—সে সন্তান পুত্র বা কন্যা যাই হোক না কেন ? এ ছাড়া বংশ ক্ষা করার বাসনা—যার অস্তিত্ব আপনি অত্যন্ত সঙ্গতভাবে স্বীকার করেছেন, পুত্র সন্তানের মাধ্যমেই তা শুধু সম্ভব এই রকম একটি বদ্ধ ধারণা আমাদের মধ্যে আছে—সেই কারণেই পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তান লাভ অপেক্ষাকৃত কম আনন্দের হয়। পুত্র সন্তান লাভের এই ব্যাপক আকুলতার জন্য আপনার কি মনে হয় না যে কেবল মাত্র একটি সন্তান লাভের জন্য আপনার যে আদর্শ তা বদলানো দরকার—এবং সম্ভাব্য কন্যা সন্তানের ওপর একটি পুত্র সন্তান লাভও এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ?

"আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে বিবাহিত ব্যক্তি যদি তার যৌনজীবন কেবলমাত্র প্রজননের মধ্যেই সীমিত রাখেন তবে তাকে ব্রহ্মচারীই বলা যাবে। আমি আপনার সঙ্গে এতেও একমত যে বিয়ের আগে ও পরে পবিত্রতা ও আত্মসংযমের নির্দেশ যারা পালন করেছেন এমন বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে একবারের সংগমেই গর্ভধান হয়। আপনার প্রথম অভিমতের সমর্থনে শাস্ত্রে বর্ণিত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ বণিতা অরুন্ধতীর বিখ্যাত কাহিনীটি আছে। যে বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞা বহিঃপ্রকৃতিকেও মানতে হতো তিনিও অরুন্ধতীকে তাঁর শতপুত্র সত্ত্বেও পূর্ণব্রহ্মচারিণী বলেই সম্বর্ধনা করেছিলেন কারণ অরুন্ধতীর স্বামীসঙ্গ কেবল মাত্র মাতৃত্বের দায়িত্ব ও পূর্ণবিকাশের প্রয়াসেই নিহিত ছিল। কিন্তু একটি মাত্র সন্তান-লাভই উচিত—তা পুত্র বা কন্যাই হোক আপনার এই আদর্শ হিন্দুশাস্ত্রও অনুমোদন করবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং মনে হয় যদি বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে আপনার আদর্শ কিছুটা শিথিল করেন যাতে সম্ভাব্য কন্যা সন্তানের ওপরেও একটি পুত্র সন্তানের জন্মদান অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে তা অনেক বিবাহিত দম্পতিকে অনেকটা সন্তুষ্ট করতে পারবে। নয়তো আমার ভয় হয় যে অনেকের পক্ষেই একেবারে বিয়ে না

করার চেয়ে পুত্র বা কন্যা যাই হোক একটি মাত্র সন্তান জন্মাবার পর সম্পূর্ণ যৌন জীবনের পরিসমাপ্তি করে পরবর্তী সারাজীবন পুর্ণ যৌন সংযম পালন করা খুব কঠিন বলে মনে হবে। ধীরে ধীরে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছি যে যৌন আবেগ মানুষের এক আদিম প্রবৃত্তি ও আত্মসংযম একটি আয়াসলভ্য গুণ—স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী এই গুণ মানুষের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিকাশের দিকে উন্নত হবার পদক্ষেপ স্বরূপ। এই কারণেই আত্মসংযম এত মর্যাদা লাভ করেছে। একমাত্র প্রজননের জন্য ইন্দ্রিয় সংগমের আদর্শকে যিনি জীবনে রূপায়িত করেছেন তাকে আমি শ্রদ্ধা করি—অবস্থা নির্বিশেষে সংগম ক্রিয়াকে অসংযত ইন্দ্রিয় পরায়ণতা বলে আমি স্বীকার করি। কিন্তু একে একটি গর্হিত পাপ বলে নিন্দে করতে বা যে স্বামী-স্ত্রী তাদের স্বাভাবিক আবেগ দমনে অসমর্থ তাদের ধর্মচ্যুত বলে তুচ্ছ অনুকম্পা বা অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বিচার করতেও আমি রাজী নই।"

দাম্পত্য আচরণ সম্বন্ধে নানারকম সামাজিক নিষেধের বৈজ্ঞানিক যুক্তি কি আমি জানি না। কিন্তু এটি আমার কাছে স্পষ্ট বলে মনে হয় যে কোন সামাজিক রীতিনীতি বা প্রথা যা আত্মসংযম ও সদাচারে উৎসাহ দেয় তার প্রতি নৈতিক সমর্থনও থাকা উচিত। যদি নিজের ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে প্রজনন বিজ্ঞানে-নিষিদ্ধ হয়ে থাকে তবে সেই নিষেধ নিশ্চয়ই নিকট-আত্মীয়ের বিবাহ ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযোজ্য। অতএব যদি কোন সমাজে কোন আচার বিষয়ে কিছু নিষেধ থাকে তবে বৈধ আচরণ নির্ধারণ স্থির করার জন্য সেই সব নিষেধ সব সময়ই মেনে চলা উচিত। পত্রলেখকের উল্লিখিত আদর্শ বিবাহ সম্বন্ধে নিয়মগুলো সাধারণভাবে মেনে নিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু তাদের পারম্পর্য কিছুটা বদ্‌লে আমি প্রেমকে তালিকার সবশেষে রাখবো। ভালবাসাকে প্রথম স্থান দিলে তুলনায় মাত্রাধিক্য গুরুত্বলাভ করে অন্যান্য নিয়মগুলোকে প্রায় নিরর্থক করে তুলবে। সুতরাং বিবাহে সাথী নির্বাচনে নৈতিক উন্নতিকেই প্রধান স্থান দেওয়া উচিত। অর্থনৈতিক অবস্থা তার

পরে ও সামাজিক স্বার্থ তৃতীয় স্থান লাভ করবে—পারস্পরিক আকর্ষণ বা প্রেমের চতুর্থ স্থান পাওয়াই উচিত। এর অর্থ অপর চারটি সর্ত পূর্ণ না হলে একমাত্র প্রেমকেই বিবাহের যুক্তি বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়। ঠিক একই কারণে অপর চারটি নিয়ম সম্পূর্ণ প্রতিপালিত হওয়া সত্বেও প্রেম বর্জিত বিবাহ সমানভাবেই পরিহার্য। বংশগত যোগ্যতার সর্ত আমি বা" দিতে চাই কারণ সন্তান প্রজনন বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় প্রজনন সঙ্গতিকে একমাত্র একটি সর্ত বলে মনে করা যায় না। বস্তুতঃ এ বিবাহের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

হিন্দুশাস্ত্রে অবশ্য পুত্র সন্তানের ওপর বিশেষ পক্ষপাত রয়েছে কিন্তু এ সেইসময় সৃষ্টি হয়েছিল যখন মল্লযুদ্ধ সমাজে প্রচলিত ছিল ও পর্যাপ্ত দৈহিক শক্তি প্রাণরক্ষায় অপরিহার্য ছিল। অতএব সেইসময় একজনের পুত্র সংখ্যাই পৌরুষ ও শক্তির নিদর্শন বলে মনে করা হতো অর্থাৎ পুত্র সন্তানের সংখ্যা দিয়ে সেই সময় একজনের পৌরুষ ও ক্ষমতার পরিমাপ করা হতো। এমন কি বেশী সন্তান প্রজননের সুবিধার জন্য বহু-বিবাহ বিধিসম্মত ছিল ও তাতে উৎসাহ দেওয়া হত। কিন্তু আমরা বিবাহকে যদি একটি পবিত্র সংস্কার বলে মনে করি তাহলে এতে একটিমাত্র সন্তানেরই স্থান আছে--এই কারণেই আমাদের শাস্ত্রে প্রথম সন্তানকে 'ধর্মজ' অর্থাৎ 'ধর্মজাত' ও পরের সব সন্তানকে 'কামজ' অর্থাৎ 'কামজাত' বলে বর্ণনা করা হয়। আমি পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না। আমার মতে এই রকম পার্থক্য বিচার বৈষম্যমূলক ও ভ্রান্ত। পুত্র অথবা কন্যা লাভ সমভাবেই সমাদৃত হওয়া উচিত।

কেবলমাত্র সন্তানের জন্য যৌনসংগম ব্রহ্মচর্যের মহৎ আদর্শের বিচারে অসঙ্গত নয়—এই নীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ কাহিনী সুন্দর কিন্তু এই কাহিনীর সবটুকুই ভাষাগতভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। কামনাতৃপ্তির জন্য যৌনসঙ্গম—পশুজীবনের

পুনরাবৃত্তি; অতএব এর উর্ধ্বে উঠ্‌বার প্রয়াসই মানুষের উচিত। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই রকম চেষ্টার ব্যর্থতাকে কোনমতেই পাপ বা নিন্দনীয় বলে মনে করা উচিত নয়। এ সংসারে লক্ষ লক্ষ লোক কেবলমাত্র রসনাতৃপ্তির জন্য আহার করেন—সেই রকম লক্ষ লক্ষ স্বামী-স্ত্রী তাদের কামতৃপ্তির জন্য যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হন ও এরকম তারা করতেই থাকবেন ও পরিণামে অসংখ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনের অনিবার্য দণ্ড পাবেন। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য বা বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ কেবলমাত্র তাদের জন্যই যারা উন্নততর আধ্যাত্মিক জীবন লাভে অভিলাষী কেননা এই রকম জীবনের জন্য এ অপরিহার্য।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন

অত্যন্ত আপত্তিকর একটি বইএর বিজ্ঞাপন সমেত কোন একটি সুপরিচিত পত্রিকার অংশবিশেষ পাঠিয়ে দিয়ে একজন বোন আমাকে একটি চিঠি লিখেছেন—

"……পত্রিকাটির ওপর চোখ বোলাবার সময় এই বিজ্ঞাপনটি আমার চোখে পড়ে। আপনি এই পত্রিকা পান কিনা আমি জানি না। যদিও বা আপনি পান তাহলেও এর ওপর মনযোগ দেবার সময় আপনার আছে বলে আমার মনে হয় না। এর আগেও একবার আমি আপনাকে অশ্লীল বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বলেছিলাম। কোন এক সময়ে আপনি এ বিষয়ে লিখবেন বলে আমি কত যে আশা করি। বিজ্ঞাপিত বইএর মত বইএ বাজার ছেয়ে গ্যাছে, এ খুবই সত্য কিন্তু দায়িত্বসম্পন্ন পত্রিকার কি এসব বিক্রির জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত? এ আমার নারীর সম্ভ্রমবোধকে এত গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ করেছে যে আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি এ সম্বন্ধে লিখতে পারি না। ঈশ্বর স্পষ্টতঃ এক অভীষ্ট সাধনের জন্য নারীকে যা দান করেছেন তা এক অসৎ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হবে তা চিন্তা করাও নিন্দনীয়। আপনি এ বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাগুলোর দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু লিখবেন বলে আমি আশা করি। আপনার সমালোচনার জন্য যে নমুনাটি পাঠালাম তা কোনমতেই এরকম বিজ্ঞাপনের প্রথম প্রকাশন নয়।"

বিজ্ঞাপনটি থেকে আমি কোন অংশ উদ্ধৃত করতে চাই না। পাঠককে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে বিজ্ঞাপিত বইটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব অশ্লীলভাবে এই বিজ্ঞাপনে বর্ণনা দেওয়া আছে। বইটির নাম "সেক্সুয়ল বিউটি অফ দি ফিমেল ফরম্"—বিজ্ঞাপনদাতা পাঠককে জানাচ্ছেন যে এই বইএর সঙ্গে ক্রেতাকে "নিউ নলেজ ফর দি ব্রাইডস" ও "সেক্সুয়ল এম্ব্রেস অর হাউ টু প্লিজ ইওর পারটনার" নামে আরও ছুটি বই বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

এইরকম বইএর বিজ্ঞাপকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা বা এইসব বইএর প্রকাশক বা সম্পাদকদের এইরকম প্রকাশনের মুনাফালাভ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে আমার ওপর আস্থাস্থাপন, ভাঙ্গা লাঠির ওপর ভর করা হবে বলে আমার ভয় হয়। এই আপত্তি-কর বই বা বিজ্ঞাপন প্রকাশকদের কাছে আমার কোন আবেদনই ফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু এই পত্রলেখিকা বা তার মত শিক্ষিতা অন্য বোনদের আমি এটুকু বলতে চাই যে তারা প্রকাশ্যে আসুন এবং যে কাজ বিশেষভাবে ও একান্তভাবে তাদেরই সেই কর্ত্তব্য পালন করুন। অনেক সময় কোন একজনের হয়ত দুর্ণাম দেওয়া হল ফলে সময় কালে তিনিও নারী বা পুরুষ যাই হোন নিজেও ঐ দুর্ণামে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন। নারীকে দুর্বলা বলে অভিহিত করা মর্যাদাহানিকর। কি ভাবে যে তিনি দুর্বলা হলেন তাও আমার জানা নেই। পুরুষের মত সমান পশুশক্তি নারীর নেই বা একেবারেই নেই এই যদি এর মর্মার্থ হয় তবে অবশ্য এ অভিযোগ মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা হলেও নারী সত্যিই তিনি যা অর্থাৎ শ্রেয়তর। আঘাত করতে তিনি যদি দুর্বলা হন তবে আঘাত সইতে তিনি বেশী বলীয়ান। আমি নারীকে মূর্ত্তিমতী ত্যাগ ও অহিংসা বলে বর্ণনা করেছি। নিজের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য পুরুষের ওপর নির্ভর না করার শিক্ষা তাকে নিতে হবে। আমি এরকম কোন উদাহরণ জানি না যেক্ষেত্রে পুরুষ নারীর সম্মান রক্ষা করেছে। ইচ্ছে থাকলেও সে তা করতে পারে না। সীতার সম্ভ্রম রাম রক্ষা করতে পারেন নি—যেমন দ্রৌপদীকে রক্ষা করতে পারেননি পঞ্চপাণ্ডব। নিজের পবিত্রতার প্রচণ্ড শক্তিতে এই দুই মহিয়সী নারী নিজের নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করেছিলেন। নিজের সম্মতি ছাড়া কেউই আত্মসম্মান বা আত্মমর্যাদা হারান না। পুরুষের বেলায় যদি কোন নারী ওষুধ দিয়ে বিহ্বল করে তাকে দিয়ে নিজের ইচ্ছে পূরণ করেন সেক্ষেত্রে যদি পুরুষের সম্ভ্রমহানি না হয় তবে নারীর

বেলায়ও যদি কেউ পশুবলে তাকে সংজ্ঞাহীন করে তার ওপর বলাৎকার করে তাতে তারও সম্ভ্রম হানি হয় না।

পুরুষের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে কোন বই রচনা হয়নি। এটা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কেবলমাত্র পুরুষের পাশবিক আবেগ উত্তেজিত করার জন্য সব সময় সাহিত্য রচনা হবে কেন? তার কারণ কি এই যে পুরুষ নারীর ওপর যে বিশেষণ আরোপ করেছে নারী নিজেকে তারই যোগ্য করতে ব্যগ্র? তার দেহ-সৌন্দর্য পুরুষ উপভোগ করুক এই কি সে চায়? পুরুষের সামনে শুধু দৈহিক সৌন্দর্য নিয়েই কি সে আসতে চায়—এবং কেন? আমার শিক্ষিত বোনেরা নিজেদের এইসব প্রশ্ন করবেন এই আমার ইচ্ছে। এ রকম বিজ্ঞাপন বা সাহিত্যে যদি তারা ক্ষুব্ধ হন তবে তাদের উচিত এ সবের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অনমনীয় ভাবে সংগ্রাম করা—তাহলেই এসব শিগ্‌গিরই বন্ধ হবে। অমঙ্গল করার শক্তি যদি তার থাকে ইষ্ট সাধনের ক্ষমতাও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে—এ উপলব্ধি নারীর আসুক। নারী দুর্বলা ও পুরুষের খেলার পুতুল হওয়ার যোগ্যতাই শুধু তার আছে অবশ্য এ ধারণা যদি সে ত্যাগ করতে পারে তবেই তার সে শক্তি আসবে—তবেই সে এই সাংসারিক জীবনকে স্বামী-পুত্র, পিতা ও নিজের পক্ষে আরও আনন্দের করে তুলতে পারবে। জাতির বিরুদ্ধে জাতির উন্মাদ সংগ্রাম বা যা আরও সর্বনাশা সেই নৈতিক জীবনের মূলনীতিগুলোর ওপর আক্রমণ করে যদি মানব সমাজ ধ্বংস না হয় তাহলে তার নিজের ভূমিকার দায়িত্ব নিতেই হবে—অবশ্য সে দায়িত্ব নারীজনোচিতভাবেই পালন করা হবে—কেউ কেউ ইচ্ছে করলেও পুরুষোচিতভাবে নয়। প্রাণবিনাশের শক্তি-লাভের জন্য অনেক ক্ষেত্রে অর্থহীন ভাবে পুরুষের সঙ্গে রেষারেষি করে নারী মানব সমাজের কল্যাণ করতে পারবে না। পুরুষকে তার ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার বিশেষ অধিকার নারীরই থাক কারণ ঐ ভুলের ফলে পুরুষের সঙ্গে নারীরও সর্বনাশ হবে।

নারীকে দেবী বলা ভুল

আমেদাবাদে গুজরাটি সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে নারী আন্দোলনের ভারপ্রাপ্তা জয়ন্তী সংঘ নামে এক সংস্থার মহিলারা গান্ধিজীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। নারী চরিত্র বর্ণনার যে প্রবণতা আজকাল সাহিত্যে দেখা যায় তার নিন্দে করে যে প্রস্তাব তাঁরা নিয়েছেন সেই প্রস্তাবের একটি অনুলিপিও ঐ চিঠির সঙ্গে ছিল। গান্ধিজী বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে বলেন—

"তাদের অভিযোগের মূল বক্তব্য এই যে আজকালকার লেখকেরা নারীজাতির একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ছবি দিয়ে থাকেন। যে বিকৃত ভাবপ্রবণতায় তোমরা তাদের বর্ণনা কর বা যে রকম অশালীন ভাবে তাদের দেহসৌন্দর্যের আলোচনা কর তাতে তারা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন। নারীর সব শক্তি ও সৌন্দর্য কি কেবল তার দেহসৌষ্ঠব বা পুরুষের কামদৃষ্টি চরিতার্থ করার দক্ষতার মধ্যেই নিহিত আছে? পত্র লেখিকা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন করেছেন—কেন চিরদিন এই পরিচয়ই আমাদের থাকবে যে আমরা নিরীহ গোবেচারা নারী মাত্র—সংসারের সব হীন কাজেই আমাদের বিশেষ অধিকার আর স্বামী ছাড়া আমাদের আর কোন ভগবান নেই? আমাদের যথার্থ রূপ কেনই বা চিত্রিত হবে না? তারা বলছেন—আমরা আকাশের পরী নই বা কতগুলো স্নায়ু ও আবেগের সমষ্টিমাত্র নই। পুরুষেরা যতটুকু আমরাও ততটুকু মানুষ—স্বাধীনতালাভের আগ্রহ আমাদের সমানভাবেই আছে। আমি তাদের সত্যি সত্যিই জানি ও তাদের মনও আমার পরিচিত বলে দাবী করি। একসময় আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন অগণিত মহিলার মাঝে ছিলাম যাদের বাড়ীর সব পুরুষ আত্মীয়েরা জেলে গিয়েছিলেন। প্রায় ষাটটি আশ্রমবাসী ছিলেন আর আমি ছিলাম সব

মহিলা ও ছোট মেয়েদের ভাই ও পিতার মত। আমি তোমাদের বলতে চাই যে তারা আমার তত্ত্বাবধানে এমন শক্তি ও মনোবল অর্জন করেছিল যে তারা নিজেরাও শেষে কারাবরণ করেছিল।

নারীদের দেবীরূপে অতিরঞ্জিত বর্ণনায় আমাদের সাহিত্য ভরা —আমাকে এরকম বলা হয়। আমি বলি যে মানবীর এই দেবী পরিচয় একেবারে ভুল। তোমাদের আমি একটি সরল প্রশ্ন করতে চাই। যখন তোমরা তাদের সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ কর তখন কোন্ আলোতে তারা তোমাদের কাছে প্রতিভাত হয়? আমি প্রস্তাব করি যে কাগজের ওপর রেখাপাত করবার আগে নারীকে নিজের মায়ের মত কল্পনা কর। এবং আমি তোমাদের এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে যেমন আকাশ থেকে নির্মল বৃষ্টিপাতে তৃষিত পৃথিবী প্লাবিত হয় তেমনি তোমাদের লেখনী থেকেও সবচেয়ে সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্য নিঃসৃত হবে। মনে রেখো, কোন একটি নারী তোমার স্ত্রী হবার আগে আর একটি নারী তোমার জননী ছিলেন। নৈতিক প্রয়োজন মেটানো দূরে থাক, কোন কোন লেখক নারীদের ইন্দ্রিয় আবেগের উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকেন আর তা এতদূর পর্যন্ত যায় যে হতভাগিনী অনভিজ্ঞা নারী কি করে উপন্যাসের বর্ণনার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন সেই ভাবনায় সময়ের অপব্যয় করেন। আমি অবাক হয়ে ভাবি কি করে তাদের দেহসৌষ্ঠবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সাহিত্যের অপরিহার্য বিষয় হতে পারে? উপনিষদ, কোরাণ বা বাইবেলে কি তোমরা এরকম কিছু দেখতে পাও? আর এসত্ত্বেও একথা কি তোমরা জান যে বাইবেল ছাড়া ইংরাজী ভাষা অসার বলে মনে করা হয়? ইংরাজী ভাষার তিন ভাগ বাইবেল ও এক ভাগ সেক্সপীয়র বলা চলে। কোরাণ ছাড়া আরব ভাষা বিস্মৃত হতো আর তুলসীদাসকে বাদ দিয়ে হিন্দী ভাষার কল্পনা কর। তোমরা এর মধ্যে নারীর বিষয়ে আধুনিক সাহিত্যের মত কি কিছু খুঁজে পাও?

ছাত্র সমাজের লজ্জা

পাঞ্জাবের এক কলেজে পড়া তরুণীর একটি মর্মস্পর্শী চিঠি প্রায় ছ্মাস যাবৎ আমার চিঠিপত্রের মধ্যে পড়ে আছে। উত্তর আমার জানাই আছে কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর এড়াবার জন্য সময়াভাবের অজুহাত দেওয়া চলে। ইতিমধ্যে বিশেষ অভিজ্ঞ আমার এক বোনের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলাম যে কলেজের এই ছাত্রীর অতিবাস্তব সঙ্কট নিয়ে আলোচনার দায়িত্ব আমি আর উপেক্ষা করতে পারি না। তার চিঠিটি শুদ্ধ হিন্দীতে লেখা। চিঠিটির যথাযোগ্য আলোচনা করতে আমাকে সচেষ্ট হতেই হবে কারণ তা পড়ে আমি বেশ বুঝতে পারছি যে লেখিকার আবেগ কত গভীর। চিঠিটির একটি অংশের ভাষান্তর আমি দিচ্ছি।

"কিশোরী বা বেশী বয়সের মহিলাদের হয়ত কখনও এমন প্রয়োজন আসে যখন ইচ্ছে না থাকলেও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বা সহরের এক পল্লী থেকে অন্য পল্লীতে একা যাবার ঝুঁকি নিতেই হয়, আর তাদের একা দেখতে পেয়ে মন্দ লোকেরা বড়ই উত্যক্ত করে। পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা অশোভন এমন কি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে আর ভয় পেয়ে বাধা না দিলে তারা বেশী অপমান করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এরকম পরিস্থিতিতে অহিংসার ভূমিকা কি হতে পারে, তা আমি জানতে ইচ্ছুক। হিংসাত্মক ব্যবহার অবশ্য ঐ সব ক্ষেত্রে সম্ভব। তরুণীটি বা মহিলাটির যদি পর্যাপ্ত সাহস থাকে তবে দুর্বৃত্তদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য সাধ্যমত যে কোন ব্যবস্থা প্রয়োগ করবেন। অন্ততঃপক্ষে হৈ-চৈ করে আশেপাশের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন ফলে পাষণ্ডদের চাবকে দেবার ব্যবস্থাও হতে পারে; কিন্তু আমি জানি যে এরকমভাবে শাস্তি দিয়ে যন্ত্রণায় সাময়িক নিবৃত্তি ঘটলেও রোগের স্থায়ী নিরাময় হবে না। যদি অসদাচরণকারীরা পূর্বপরিচিত হয় তবে সেক্ষেত্রে তারা নিশ্চয়ই যুক্তি বা বিনয় ও প্রীতির আচরণে সাড়া দেবে। কিন্তু যদি কোন শ্রীমান সাইকেলে

করে যাওয়ার সময় পুরুষ সঙ্গী ছাড়া কোন ছোট মেয়ে বা তরুণীকে দেখে অশ্লীল উক্তি করতে থাকে তবে তার সম্বন্ধে কি করা যায়? তার সঙ্গে যুক্তিতর্ক করার কোন সুযোগই আপনার নেই। তার সঙ্গে আবার দেখা হবার কোন সম্ভাবনাও নেই। এমন কি আপনি তাকে নাও চিনতে পারেন। তার ঠিকানাও আপনার জানা নেই। এরকম অবস্থায় দুর্ভাগা তরুণী বা মহিলা কি করতে পারেন? দৃষ্টান্ত হিসেবে গতরাত্রি ২৬শে অক্টোবর আমার অভিজ্ঞতা আপনাকে জানাতে চাই। আমি আমার এক মেয়ে বন্ধুর সাথে একটি বিশেষ কাজে রাত সাড়ে সাতটার সময় যাচ্ছিলাম। সে সময় একজন পুরুষ সঙ্গীকে পাওয়া একরকম অসম্ভব ছিল, আবার কাজটিও ফেলে রাখা সম্ভব ছিল না। পথের মাঝে এক শিখ যুবক পাশ দিয়ে সাইকেলে চলে গেল ও আমাদের কানে যাতে না আসে সেই ভাবে অনুচ্চস্বরে কিছু বলতে লাগলো। তা যে আমাদের উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছিল তা আমরা জানতাম। নিজেদের অপমান লাগলো আর অস্বস্তিও লাগলো। রাস্তায় কোন ভীড় ছিল না। আমরা কয়েক পা না এগোতেই সাইকেল আরোহী ফিরে এলো। বেশ কিছুটা দূরে থাকলেও আমরা তখুনি তাকে চিনতে পারলাম। সাইকেলে চড়েই সে আমাদের দিকে আসতে লাগলো—অবশ্য তার অভিসন্ধি শুধু আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাওয়াই ছিল, না, সে নেমে পড়বার জন্য আসছিল তা ভগবানই জানেন। আমরা বিপদে পড়েছি এরকম মনে হতে লাগলো। আমাদের শারীরিক শক্তির ওপর কোন আস্থাই ছিল না। সাধারণ তরুণীদের তুলনায় আমি নিজেও দুর্বল। কিন্তু আমার হাতে একটা মোটা বই ছিল। কি করে যেন হঠাৎ আমার মধ্যে সাহস এলো। আমি জোরে ভারী বইটা সাইকেল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ফেললাম, আর—আবার তোমার বাদরামি করার স্পর্ধা এখনও আছে?—এই বলে গর্জে উঠলাম। সে কোনমতে ভারসাম্য রেখে তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে পালিয়ে গেল। আমি যদি তখন বইটা সাইকেল লক্ষ্য করে না ছুঁড়তাম তবে সে আমাদের সারাটি যাত্রাপথ তার ঐ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগে উত্যক্ত করতো। এ একটি সাধারণ সম্ভবতঃ খুবই তুচ্ছ ঘটনা—তবু আমার ইচ্ছে হয় আপনি যদি একবার লাহোরে এসে আমাদের মত অভাগাদের দুঃখের কথা শুনতেন আপনি নিশ্চয়ই একটি সঠিক সমাধান খুঁজে বার করতে পারতেন। প্রথমতঃ

আমাকে জানান যে এইরকম পরিস্থিতিতে কি ভাবে অহিংসা নীতির প্রয়োগ করে নারীরা আত্মরক্ষা করতে পারে? দ্বিতীয়তঃ মহিলাদের অপমান করবার এই ঘৃণ্য অভ্যাস থেকে তরুণদের কি ভাবে মুক্ত করা যেতে পারে? আপনি নিশ্চয়ই এই প্রস্তাব করবেন না যে কষ্ট স্বীকার করেও আমাদের প্রতীক্ষা করতে হবে যতদিন না স্ত্রীজাতির প্রতি যথাযথ সম্মানদানে আবাল্য শিক্ষিত নতুন একটি বংশের উদ্ভব হয়? বড় বড় নেতাদের তো প্রশ্ন শুনবার সময় নেই। দুষ্কৃতকারী কোন তরুণকে কোন তরুণী শাস্তি দিয়েছে এরকম ঘটনার কথা কানে এলে কেউ কেউ বলে ওঠেন—'বাঃ বেশ করেছে—সব তরুণীরই এরকম করা উচিত।' ছাত্রদের এরকম অসৎ আচরণের বিরুদ্ধে আবেগময়ী ভাষণ দিতেও কোন কোন নেতাকে দেখা যায়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে এই গভীর সমস্যার সমাধানের জন্য কেউই মনোনিবেশ করেন না। আপনি জেনে বিস্মিত হবেন যে দেওয়ালী বা সেই রকম উৎসবের দিনে যাতে মহিলারা আলোকসজ্জা দেখতেও নিজের বাড়ীর গণ্ডীর বাইরে না যাওয়ায় সাবধান হন এরকম বিজ্ঞাপন খবরের কাগজগুলোতে দেওয়া হয়। পৃথিবীর এই অংশে আমরা যে কোন্ স্তরে নেমে গেছি এই একটি তথ্যতেই আপনি তা বুঝতে পারবেন। ওপরের বিজ্ঞপ্তি যাঁরা রচনা করেন বা পড়েন তাঁরা কেউই এরকম ঘোষণার মধ্যে নিহিত অমর্যাদার ইঙ্গিত সম্বন্ধে সচেতন নন।"

অন্য একটি পাঞ্জাবী মেয়ে যাকে আমি চিঠিটি পড়বার জন্য দিয়েছিলাম সেও তার কলেজ জীবনে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বৃত্তান্ত সমর্থন করে, আর বলে যে আমার সংবাদদাতা বর্ণিত ঘটনা অধিকাংশ তরুণীর ক্ষেত্রে নিতান্ত সাধারণ অভিজ্ঞতা।

অন্য চিঠিটিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন মহিলা লক্ষ্ণৌতে তার বান্ধবীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। সিনেমা হলে মহিলারা তাদের পেছনে বসা তরুণদের দ্বারা অপমানিত হয়ে থাকেন আর যে ভাষা তখন ব্যবহার করা হয় তা যে অশালীন এ আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি। তাদের রসিকতা কখনও বা সক্রিয়ভাবেই প্রকাশ পায়—যার বর্ণনাও লেখিকা দিয়েছেন, আমি অবশ্য তার পুনরাবৃত্তি করবো না।

ব্যক্তিগতভাবে আপাততঃ নিস্তার পাওয়াই শুধু যদি প্রয়োজন হতো তবে যে ব্যবস্থা নিজে থেকে ঐ দুর্বলা তরুণীটি গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ সাইকেল আরোহীর ওপর বই ছোঁড়া—বস্তুতঃ তা-ই চিরাচরিত ব্যবস্থা, এই সব রচনাতে আমি বলেছি যে যদি কেউ বল প্রয়োগ করতে চায় তবে শক্তির সার্থক প্রয়োগে তার দৈহিক দুর্বলতা কোন অন্তরায় হবে না—এমন কি শারীরিক বলে বলীয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধেও নয়। আমরা এও জানি যে আজ দৈহিক বল প্রয়োগের এত কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে যে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী একটি মেয়েও মৃত্যু বা বিনাশ ঘটাতে পারে। পত্রলেখকের বর্ণিত পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্য শিক্ষা দেওয়ার সৌখীন প্রবণতা আজকাল বেড়েই চলেছে। কিন্তু তরুণীটির এটুকু জ্ঞান আছে যে যদিও সেই মুহূর্তে সে তার হাতের বইটিকে আত্মরক্ষার আয়ুধ হিসেবে সার্থক ব্যবহার করতে পেরেছিল কিন্তু ক্রমবর্ধমান অপরাধের এ কোন প্রতিবিধান হতে পারে না। অশালীন মন্তব্যে বিচলিত হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ বিষয়ে উদাসীন থাকাও উচিত নয়। এ রকম প্রতিটি ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। সন্ধান পাওয়া গেলে দুষ্কৃতকারীদের নামও প্রচারিত হওয়া উচিত। অপরাধ প্রকাশ করার ব্যাপারে কোন অযৌক্তিক লজ্জা থাকা উচিত নয়। প্রকাশ্য অসভ্যতাকে সায়েস্তা করতে প্রকাশ্য সমালোচনার মত আর কিছু নেই। এ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে যে বিশেষ ঔদাসীন্য আছে—লেখিকার এই মন্তব্যে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু জনসাধারণকেই দোষী করা চলে না। তাদের সামনে এ বকম অসভ্যতার দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরা চাই। যেমন চুরির ঘটনাগুলোর প্রকাশ ও তার পরের অন্যান্য ব্যবস্থাগুলো না নিলে চৌর্যবৃত্তির প্রতিবিধান করা যায় না তেমনি অভদ্র ব্যবহারের ঘটনা যদি গোপন করা হয় তবে এর প্রতিবিধান অসম্ভব হবে। অপরাধ ও পাপ সাধারণতঃ অন্ধকারের মধ্যেই বিচরণ করে থাকে—আলোতে তারা পালিয়ে যায়।

কিন্তু আমার মনে হয় আধুনিকা তরুণীরা প্রত্যেকে ছয়জন রোমিওর জুলিয়েট হতে ভালবাসে। সে রোমাঞ্চকর অভিযান পছন্দ করে। আমার পত্রলেখিকা অসাধারণ পর্যায়ের একজন বলে মনে হয়। আধুনিকা তরুণীরা ঝড়বৃষ্টি বা রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নয় বরং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই বেশভূষা করে থাকেন। প্রকৃতির ওপর রং ফলিয়ে তারা নিজেদের বিচিত্রিত করেন। অহিংস পদ্ধতি এদের জন্য নয়। আমি এইসব রচনার মাধ্যমে প্রায়ই বলেছি যে আমাদের মধ্যে অহিংসাভাবের প্রসার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীর অনুশাসনেই সম্ভব। এই প্রয়াস আয়াসসাধ্য। চিন্তায় ও জীবনযাত্রায় এ একটি বিপ্লব ঘটায়। আমার পত্রলেখিকা ও তার মতাবলম্বিনীরা যদি নির্ধারিত পথে তাদের জীবনের এই আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারেন তাহলে শিগ্‌গিরই তারা দেখবেন যে তরুণেরা যদি তাদের সংস্পর্শে আসেন তবে তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখবে ও তাদের সামনে সাধ্যমত সর্বোত্তম আচরণই করবে। কিন্তু যদিই বা ঘটনাক্রমে তারা দেখেন—আর এরকম ঘটতেও পারে—যে তাদের সতীত্বহানির আশঙ্কা রয়েছে তখন মনে সেই তেজের বিকাশ চাই যাতে নররূপী পশুর কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে তারা মৃত্যুবরণ করতে পারেন। এরকম যুক্তিও দেওয়া হয় যে কোন রকম প্রতিরোধ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম করে যাকে বাঁধা হয়েছে বা মুখ বাঁধা থাকায় যে চিৎকার করতে অসমর্থ তার পক্ষে আমি যতটা সহজ বলে মনে করি তত সহজে মৃত্যুবরণ সহজ নয়। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে আমি আবার বলতে চাই যে প্রতিরোধ করবার সঙ্কল্প যার মনে আছে সে তাকে অক্ষম করার সকল বাঁধনই ছিন্নভিন্ন করতে পারে। তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই মৃত্যু বরণ করার শক্তি যোগাবে।

কিন্তু যারা নিজেদের সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষিত করেছেন কেবল তাদের পক্ষেই এরকম বীরত্ব সম্ভব। অহিংসায় যাদের দৃঢ় বিশ্বাস

নেই তারা আত্মরক্ষার সাধারণ কৌশলগুলো শিখবেন ও সম্ভ্রমহীন তরুণদের অশালীন ব্যবহার থেকে নিজেদের রক্ষা করবেন।

কিন্তু মূল প্রশ্ন এই যে আমাদের তরুণদের মধ্যে সাধারণ সৌজন্যের এ রকম অভাব কেন থাকবে যার জন্য ভদ্র তরুণীরা তাদের দ্বারা অপমানিতা হবার ভয়ে সবসময়ই শঙ্কিত থাকবেন? আমাকে যদি এই বিশ্বাস করতে হয় যে আমাদের তরুণদের অধিকাংশই আজ মহিলাদের প্রতি যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শন সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন তবে তা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আপন শ্রেণীর সুনাম রক্ষা করতে তাদের চেষ্টা করা উচিত ও বন্ধুদের মধ্যে যদি কোন অভদ্রতার ঘটনা ঘটে তাব প্রতিবিধান করা উচিত। প্রতিটি নারীর সম্ভ্রম নিজের নিজের মা-বোনের মত রক্ষা করার শিক্ষা তাদের নিতে হবে। যদি তারা ভব্যতাই না শেখে তাহলে তাদের অন্য সব শিক্ষাই বিফল হবে।

শিক্ষালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষাদানের যে দায়িত্ব অধ্যাপক ও শিক্ষকদের আছে ভব্যতার ও সৌজন্যবোধ সম্বন্ধে ছাত্রীদের অবহিত করার দায়িত্ব কি তাঁদের নেই?

আধুনিকা তরুণী

নাম ধাম সমেত এগারটি তরুণীর পক্ষ থেকে লেখা একটি চিঠি আমি পেয়েছি। কোন রকম ভাবার্থ বদল না করে শুধু পড়ার সুবিধের জন্য একটু বদলে আমি তা নীচে উদ্ধৃত করলাম—

"১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের 'হরিজনে' প্রকাশিত 'ছাত্র-সমাজের লজ্জা' শীর্ষক একজন ছাত্রীর চিঠির ওপর আপনার মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মনে হয় আধুনিকা তরুণী আপনাকে এতদূর ক্ষুব্ধ করেছে যে তারা ছয়টি রোমিওর জুলিয়েট হবার অভিনয় করে এরকম মন্তব্য করে আপনি তাদের মুণ্ডুপাত করেছেন। নারীদের সম্বন্ধে আপনার সাধারণ ধারণা কি তা এই মন্তব্যে ধরা পড়েছে আর তা আদৌ উৎসাহজনক নয়।

"পুরুষের দ্বারা নির্যাতিতা হলেও নারীকেই আজও দোষের ভাগী করা হয়—এ বাস্তবিকই অদ্ভুত, বিশেষ করে যখন নারী পুরুষের সহায়তা করতে ও জীবনের দায়িত্ব সমানভাবে বহন করতে আজ বন্ধঘরের বাইরে আসছেন। একথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না যে দুজনেই সমান অপরাধী—এরকম দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করা যায়। এমন কয়েকজন তরুণী হয়ত থাকতে পারেন যাঁরা প্রত্যেকে ছয়জন রোমিওর জুলিয়েট হবার অভিনয় করছেন। কিন্তু তা তখনই সম্ভব যখন পথে পথে জুলিয়েটের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো ছয়জন রোমিওর অস্তিত্ব থাকে। সব আধুনিকা তরুণীই 'জুলিয়েট' বিশেষ বা সব আধুনিক তরুণই 'রোমিও' বিশেষ এরকম ধারণা করা ঠিক নয়—উচিতও নয়। আপনি নিজে বেশ কিছু সংখ্যক আধুনিকা তরুণীর সংস্পর্শে এসেছেন আর তাদের দৃঢ়তা, ত্যাগ ও নারী-জনোচিত অন্যান্য মহৎ গুণ দেখে সম্ভবতঃ অবাক হয়েছেন।

"আপনার পত্রলেখিকা অশালীন আচরণের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের যে উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে বলা যায় যে ফলপ্রসূ হবে না বলেই তা নারীদের দ্বারা সম্ভব নয়—অযৌক্তিক লজ্জাবোধের জন্য নয়।

"কিন্তু সারা জগতে যিনি শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন তাঁর এরকম বিবৃতি 'নারীই নরকের দ্বার'—এই জীর্ণ ও অনুচিত মন্তব্যের সমর্থন করে বলে মনে হয়।

"আগের উক্তি থেকে এরকম যেন মনে করবেন না যে আধুনিকা নারীরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে না। তরুণদের মত তরুণীরাও অপনাকে সমান ভাবেই শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ঘৃণা বা অনুকম্পার পাত্রী হওয়া তারা বিশেষ অপছন্দ করে। যদি তারা সত্যিই অপরাধী হয় তবে তাদের আচরণ বদলাতে তারা প্রস্তুত। কিন্তু অভিশাপ দেবার আগে তাদের অপরাধ যদি কিছু থাকে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়া দরকার। এ বিষয়ে 'আহা নারী' এরকম কোন অনুকম্পার ছায়ার নীচে বা এরকম কোন রক্ষা কবচের আশ্রয় যেমন তারা চান না তেমনি বিচারক তাঁর অভিরুচিমত শাস্তির বিধান দেবেন—বিনা প্রতিবাদে তা স্বীকার করতেও তাঁরা রাজী নন। সত্যের সম্মুখীন হতেই হবে আর আধুনিকা তরুণী যাদের আপনি জুলিয়েট আখ্যা দিয়েছেন তাদের সেই সত্যের সম্মুখীন হবার সৎসাহস আছে।"

আমার পত্রলেখিকার হয়ত জানা নেই যে চল্লিশ বছরেরও অনেক আগে—যখন সম্ভবতঃ তাদের জন্ম হয় নি—তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি ভারতীয় নারীদের সহায়তা করতে আরম্ভ করি। নারীত্বের প্রতি অমর্যাদাকর কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা। নারী জাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা এত বেশী যে তাদের সম্বন্ধে মন্দ কিছু চিন্তা করতেও পারি না। তারা পুরুষের অধাঙ্গিনী বলে ইংরাজীতে যে বর্ণনা করা হয় তারা সত্যিই তাই। আমার প্রবন্ধে আমি ছাত্রদের লজ্জাকর আচরণের কথাই প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম—তরুণীদের চপলতা জাহির করবার জন্য নয়। কিন্তু রোগের নিদান নির্ধারণ করতে ও নিরাময়ের সঠিক ঔষুধ নির্বাচন করতে হলে যে সব কারণে রোগের উৎপত্তি তার সবগুলোই উল্লেখ করতে হবে।

আধুনিকা তরুণী—এ কথার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। অতএব আমার মন্তব্য শুধুমাত্র কয়েকজনের মধ্যে সীমিত রাখার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্তা সকলেই আধুনিকা নন। আমি এমন অনেকের কথা জানি যাঁদের এই

আধুনিক তরুণীর প্রভাব স্পর্শমাত্র করে নি। আবার এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা পুরোপুরি আধুনিকাতে রূপান্তরিত হয়েছেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ছাত্রীদের এই বলে সতর্ক করানো যাতে তাঁরা আধুনিকাদের অনুসরণ না করেন ও যে সমস্যা এমনিতেই বিশেষ সঙ্কটের তা আরও জটিল না করেন। কারণ উল্লিখিত চিঠিটি পাওয়ার সময় আমি অন্ধ্রদেশীয়া একটি ছাত্রীর একটি চিঠি পাই তাতে অন্ধ্রের ছাত্রদের আচরণ সম্বন্ধে যে তীব্র অভিযোগ ছিল তার বর্ণনা পড়ে মনে হয় লাহোরের ছাত্রীর বর্ণিত আচরণের চেয়ে এ নিকৃষ্টতর। অন্ধ্রের সেই মেয়েটি আমাকে জানিয়েছে যে তার সাথীদের সরল বেশভূষা আত্মরক্ষার সহায়ক নয় আর যে সব ছাত্ররা তাদের শিক্ষায়তনের কলঙ্কস্বরূপ তাদের বর্বরোচিত আচরণ সাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেবার মত সাহসও তাদের নেই। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আমি অভিযোগটি উপস্থাপিত করছি।

ছাত্রদের রূঢ় ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের সূচনা করতে আমি ঐ এগারজন পত্রলেখিকাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যারা নিজেদের সহায়তা করতে সচেষ্ট ঈশ্বর তাদের সহায় হোন্। পুরুষের দুর্বৃত্তের মত আচরণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সবরকম কৌশলই তাদের আয়ত্ত করতে হবে।

একজন বোনের প্রশ্ন

প্রশ্ন—নারীর সম্ভ্রম কি করে রক্ষা করা যায় ?

উত্তর—দুভাগে প্রশ্নটি আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) কি করে একজন নারী নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেন ?

(২) নারীর পুরুষ আত্মীয়েরাই বা কি উপায়ে তা করতে পারেন ?

প্রথম প্রশ্নটি সম্বন্ধে বলা যায় যে যেখানে অহিংসার একটি বাতাবরণ রয়েছে—যেখানে অহিংসার শিক্ষা সবসময়ই দেওয়া হয় সেখানে কোন নারীই নিজেকে পরনির্ভরশীলা, দুর্বলা বা অসহায়া মনে করবেন না। যদি তিনি যথার্থই নিষ্পাপ হন তবে তিনি কখনই অসহায়া নন। আপন পবিত্রতা তাঁকে তাঁর শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করবে। আমি সবসময় এই মত পোষণ করেছি যে কোন নারীর ওপর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করা বাস্তবতার দিক থেকে সম্ভব নয়। এই অত্যাচার তখনই ঘটে যখন তিনি ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েন বা তাঁর নৈতিক শক্তি উপলব্ধি করতে পারেন না। যদি তিনি আক্রমণকারীর দৈহিক শক্তির কাছে পরাভূতও হন তবুও সে তাঁকে লাঞ্ছনা করবার আগেই তাঁর নিষ্কলুষতাই তাঁকে মৃত্যুবরণ করার শক্তি দেবে। সীতার দৃষ্টান্তই ধরা যাক্। রাবণের দৈহিক শক্তির তুলনায় তিনি নিতান্তই ক্ষীণকায়া কিন্তু তাঁর পবিত্রতার তেজ রাবণের দানবশক্তির চেয়েও বেশী ছিল। অনেক রকম প্রলোভনে সে তাঁকে জয় করতে চেয়েছিল কিন্তু তাঁর অসম্মতি তাঁর অঙ্গে লালসার স্পর্শটুকুও দিতে পারেনি। পক্ষান্তরে যদি কোন মহিলা তাঁর শারীরিক বল বা করায়ত্ত কোন অস্ত্রের ওপর নির্ভর করেন তবে তিনি সেই শক্তিটুকু নিঃশেষ হলে নিশ্চয়ই অসুবিধায় পড়বেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর সহজেই দেওয়া যায়। ভাই, বাবা বা বন্ধু তাঁর আশ্রিতা ও আক্রমণকারীর মধ্যে এসে দাঁড়াবেন। তিনি তখন হয় আক্রমণকারীকে তার পাপ অভিসন্ধি থেকে নিবৃত্ত করবেন নয় তাকে বাধা দেবার জন্য প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণও বলি দেবেন। এরকম প্রাণ দান করায় তিনি শুধু নিজের কর্তব্য সম্পাদন করবেন তা নয় উপরন্তু তাঁর শরণার্থীকে নতুন শক্তি যোগাবেন আর তখনই তিনি এটা বুঝতে পারবেন যে কি ভাবে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে হয়।

প্রশ্ন—কিন্তু এর মধ্যেই জটিলতাটুকু রয়েছে। ঐ নারী কি করে আত্মবিসর্জন করবে? তার পক্ষে এ করা কি সম্ভব?

উত্তর—হ্যাঁ পুরুষের চেয়ে নারীর পক্ষেই তা বেশী সম্ভব। আমি জানি যে অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর কারণেও জীবন উৎসর্গ করা নারীর পক্ষেই সম্ভব। মাত্র কয়েকদিন আগে কুড়ি বছর বয়সের এক তরুণী আগুনে পুড়ে প্রাণত্যাগ করেছিল কারণ তার মনে হয়েছিল যে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতির জন্য তার ওপর উৎপীড়ন করা হচ্ছিল। সে অনমনীয় সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে শেষ করে। একটি সাধারণ তেলের প্রদীপ থেকে সে নিজের কাপড়ে আগুন দেয় আর এতটুকু চিৎকারও সে করেনি কারণ পাশের ঘরের লোকেরাও সবকিছু শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞই ছিল। নারী কত সহজে তার জীবন দান করতে পারে তা বোঝাবার জন্যই আমি এই ঘটনার বিশদ বিবরণ দিলাম—ঐ তরুণীর প্রশংসা করবার জন্য নয়। আমি অন্ততঃ এরকম বীর্যের অধিকারী নই। কিন্তু একথা আমি মানি যে প্রয়োজন অন্তরের জ্যোতি—বাইরের সাহস নয়।

প্রশ্ন—শিশুদের সঙ্গে আচরণে কি ভাবে ক্রোধ ও হিংসা নিঃশেষে পরিহার করা যায়?

উত্তর—তুমি এই পুরোনো প্রবাদটি নিশ্চয়ই জান যে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তার সঙ্গে খেলা করবে—দশ বছর পর্যন্ত তাড়না করবে

আর ষোল বছর বয়স হবার পর পুত্রের সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করবে। কিন্তু তুমি দুর্ভাবনা করো না। যদি কখনও বা তুমি তোমার সন্তানের ওপর রাগ কর আমি তাকে অহিংস ক্রোধ বলেই অভিহিত করবো। আমি বুদ্ধিমতী জননীদের কথা বলছি—যাদের সত্যিকার মা হবার যোগ্যতা নেই সেরকম মূর্খ মায়েদের সম্বন্ধে নয়।

একটি ত্যাগের সিদ্ধান্ত

১৮৯১ সালে ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসবার পর কার্যতঃ আমি পরিবারের শিশুদের দায়িত্ব নিয়েছিলাম ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের কাঁধে হাত দিয়ে হেঁটে বেড়াবার অভ্যেসটি পালন করি। এরা আমার ভাইএর ছেলেমেয়েরা—তারা বয়স্ক হবার পরেও এ অভ্যাসটি অব্যাহত থাকে। পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে এদের সংখ্যা মনোযোগ আকৃষ্ট করবার মত আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে।

বয়স্কা মেয়ে ও মহিলাদের ক্ষেত্রে আমার এই অভ্যেস প্রচলিত শালীনতাবোধের পরিপন্থী—যতদূর মনে পড়ে সবরমতী আশ্রমের একজন সভ্য আমাকে তা না বলা পর্যন্ত আমি যে কিছু অন্যায় করছি তা আমার মনেই হয়নি। কিন্তু আবাসিকদের সঙ্গে আলোচনার পরেও অভ্যেসটি চালিয়ে যাই। সম্প্রতি ওয়ার্ধায় দুজন সহকর্মী এই মত প্রকাশ করেন যে এই অভ্যেস অন্যের কাছে খারাপ দৃষ্টান্ত হতে পারে—এই কারণে আমার এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। তাদের যুক্তি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তবুও বন্ধুদের এই সতর্কীকরণ আমি উপেক্ষা করতে চাইনি। অতএব বিচার ও পরামর্শের জন্য বিষয়টি আমি পাঁচজন আবাসিকের কাছে রাখি। বিষয়টি সম্বন্ধে বিচার একটি রূপ নেবার সময় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করার মত একটি ঘটনা ঘটে। আমাকে জানানো হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মেধাবী ছাত্র তার প্রভাবাধীন কোন একটি মেয়েকে নিজের বোনের মত স্নেহ করে ও সেই স্নেহের দৈহিক অভিব্যক্তি প্রকাশ থেকে নিজেকে সে নিবৃত্ত করতে পারে না। এই অজুহাতে সে গোপনে তার সঙ্গে সবরকম অশালীন আচরণ করছিল। এই রকম আচরণে দোষ আছে তার সামান্য উল্লেখেও সে বিরক্ত হতো। যুবকটি যে আচরণ করছিল যদি আমি তা প্রকাশ করতে

পারতাম তাহলে পাঠক বিনা দ্বিধায় তার আচরণকে দোষণীয় বলে অভিমত দিতেন। এই চিঠি পড়ে আমি এবং যাঁরা এটা দেখেছিলেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে হয় ছেলেটি একটি সেরা ভণ্ড কিংবা আত্মপ্রবঞ্চক।

সে যাই হোক্ এ ঘটনার কথা আমাকে চিন্তান্বিত করে। আমি দুজন সহকর্মীর সতর্কীকরণ স্মরণ করে নিজেকে প্রশ্ন করলাম যে ছেলেটি যদি আত্মসমর্থনে আমার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে তবে আমার মনের ভাব কেমন হবে? এখানে উল্লেখ করতে পারি যে যুবকটির আবেগের পাত্রীটি তাকে সম্পুর্ণ পবিত্র ও ভাইএর মত মনে করলেও তার আচরণ সে পছন্দ করে না—প্রতিবাদও করে কিন্তু তাতে বাধা দেবার বিষয়ে সে বিশেষ দুর্বল। এই ঘটনায় আমার মধ্যে যে আত্ম-বিশ্লেষণ ঘটে তার ফলে ঐ চিঠি পড়ার দু'তিন দিনের মধ্যেই আমার এই অভ্যেস আমি একেবারেই ত্যাগ করি ও এই মাসের ১২ তারিখেই আমি তা ওয়ার্ধা আশ্রমের সঙ্গীদের কাছে ঘোষণা করি। এই সিদ্ধান্তে আসতে আমি যে কিছু বেদনা বোধ করিনি তা নয়। এই অভ্যেসের জন্য কখনও কিন্তু আমার মনে কোন পাপ চিন্তা আসেনি। আমি যা করেছি সবসময় সবার সামনেই তা করেছি। আমি বিশ্বাস করি যে আমার আচরণ পিতার মতই ছিল আর এই কারণে যেসব মেয়ে আমার পরিচালনাধীন ছিল ও যাদের আমি অভিভাবক ছিলাম তারা আমার ওপর যতখানি আস্থা রাখে সম্ভবতঃ আর কেউই ততখানি পারেনি। নরনারীর পরস্পরের স্পর্শ থেকে দূরে থাকার জন্য যে ব্রহ্মচর্য একটি পাচিল তৈরী করে ও যে পাচিল সামান্যতম প্রলোভনের মুখে ভেঙ্গে পড়ে আমি সেই ব্রহ্মচর্যে যেমন বিশ্বাস করি না তেমনি আমার আচরণের স্বাধীনতাটুকুর মধ্যে যে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্বন্ধেও আমি অজ্ঞ নই।

সুতরাং আমার এই অভ্যেস এমনিতে যতই নিষ্কলুষ হোক না কেন উল্লিখিত ঘটনার কারণে এই অভ্যেস আমি ত্যাগ করেছি।

আমার প্রত্যেকটি কাজ হাজার হাজার নরনারী বিশ্লেষণ করে থাকেন কারণ আমি যে নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি তার জন্য নিরলস সতর্কতা প্রয়োজন। যুক্তিজাল দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হয়—এরকম কাজ আমাকে ত্যাগ করতেই হবে। আমার দৃষ্টান্তই যে সকলে অনুসরণ করবে এও ঠিক নয়। ছেলেটির ঘটনা একটি সতর্কীকরণ বলেই আমার মনে হয়েছে। আমি সেইভাবেই এটা গ্রহণ করেছি এই আশায় যে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণেই হোক বা না হোক আমার এই অভ্যেস ত্যাগ ভ্রান্ত লোকদের সঠিক পথে চালিত করবে। নিষ্পাপ যৌবন একটি অমূল্য সম্পদ—মুহূর্তের উন্মাদনায় বা অযৌক্তিক আনন্দলাভের জন্য তা অপব্যয় করার নয়। যে যুবকেরা সত্যিই দুর্বৃত্ত বা নিজের কাজ সম্বন্ধে অজ্ঞ তাদের এইরকম অপচেষ্টা নির্দোষ মনে হলেও প্রতিরোধ করার শক্তি যেন ওপরে বর্ণিত দুর্বলচেতা মেয়েদের আসে।

সেবাব্রতী ভগিনী হও

জাফ্‌নার ইউডিভিল বালিকা বিদ্যালয়ে গান্ধিজী তাঁর ভাষণে বলেছেন—

আজ এই সকালে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছি। তোমাদের অন্তরের গভীরতম অনুভূতিসঞ্জাত ছোট ছোট দান এক সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাটি মোটেই আমার মনঃপূত হয়নি, কিন্তু সাধারণের দানভাণ্ডারে তোমাদের দানটুকুও যে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে তার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা আমি এই বলে করতে চাই যে, যেহেতু তোমরা ছেলেদের চেয়ে অনেক লাজুক—তাই তোমরা যে কিছু দিয়েছো তা আমাকে জানাতে চাও না। কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বত্র হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মেয়েদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাই কোন সং কাজ করে মেয়েরা তা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না।

আবার এমন কোন কোন মেয়ে আছে, যারা অসৎ কাজের বিষয়ও আমার কাছে বলতে দ্বিধা করে না। আমি আশা করি আমার সামনে এতজন মেয়ের মধ্যে কোন কু-কাজ করে এমন কেউ নেই। তোমাদের জেরা করার সময় না থাকায় আমি প্রশ্ন করে তোমাদের বিরক্ত করতে চাই না; কিন্তু খারাপ কাজ করেছে এমন কোন মেয়ে যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে জনান্তিকে আমি তাকে বলতে চাই যে এরকম ক্ষেত্রে শিক্ষা নিরর্থক।

নির্জীব পুতুল হবার জন্য তোমাদের বাবা-মা তোমাদের স্কুলে পাঠান না। বরঞ্চ এই আশাই করা হয় যে তোমরা সেবাব্রতী বোন হবে। এই ভেবে ভুল করো না যে যাঁরা একটি বিশেষ বেশ পরেন কেবলমাত্র তাঁদেরই সেবাব্রতী বলা যেতে পারে, যিনি নিজের সম্বন্ধে কম চিন্তা করেন—গরীব ও হতভাগিনী যারা তাদের সম্বন্ধে বেশী

চিন্তা করতে আরম্ভ করলে তবেই তিনি সেবাব্রতীর রূপ নেন। তোমরাও তোমাদের সাধ্যমত দান দিয়ে সেবাব্রতী বোনের কর্তব্য করেছো—কেননা এই অর্থের দান তাদের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে যারা দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের চেয়েও গরীব।

সামান্য কিছু অর্থদান সহজেই করা যায়—কিন্তু কিছু সৎ কাজ করা অনেক শক্ত। যাদের জন্য অর্থদান করেছো তাদের জন্য সত্যিই যদি তোমাদের কোন সমবেদনা থাকে তাহলে তাদের জন্য আর একটু এগিয়ে গিয়ে তারা যে খাদি তৈরী করে সেই খাদি তোমরা পর। তোমাদের সামনে খাদি রাখলে তোমরা যদি বল যে, 'খাদি একটু মোটা—এ আমরা পরতে পারি না।' তাহলে তোমাদের মধ্যে আত্মত্যাগের মনোভাব নেই বলে আমি জানবো।

এটা এমনই একটি সুন্দর জিনিষ যে উঁচু-নীচু সব শ্রেণীর মধ্যে আর অস্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য নয় এদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখে না। তোমরা যদি নিজেদের অন্য কোন কোন মেয়েদের চেয়ে উঁচু বর্ণের বলে মনে না কর তবে তা সত্যিই সৎ কাজ। ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন।

ছাত্রীদের প্রতি উপদেশ

জাফ্‌নার রামানাথন্‌ বালিকা মহাবিদ্যালয়ের ভাষণে গান্ধিজী বলেছিলেন—

জাফ্‌নার বিভিন্ন জ্ঞানপীঠ পরিদর্শনের এই ব্যাপক কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি হিসেবে আজ এই সকালে এখানে আসতে পেরে সত্যিই আমি খুবই আনন্দিত।

এই দিনটিকে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করতে ও খাদি কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহে নিয়োজিত করতে তোমরা যে সঙ্কল্প করেছো—তোমাদের দেওয়া অভিনন্দন-পত্রে তার উল্লেখ আমাকে অভিভূত করেছে। আমি জানি যে তোমাদের পক্ষে এ অর্থহীন প্রতিশ্রুতি মাত্র নয়, তোমরা এই প্রতিশ্রুতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে চাও। যাদের হয়ে আমি পরিভ্রমণ করছি সেই লক্ষ লক্ষ অনাহারক্লিষ্ট মানুষ যদি তাদের বোনেদের এই সঙ্কল্প কিছুমাত্র বুঝতে পারতো তাহলে তাদের অন্তর যে কত আনন্দে ভরে যেতো তা আমি জানি। কিন্তু তোমরা শুনে দুঃখ পাবে যে এই লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণ, যাদের উদ্দেশ্যে তোমরা এই অর্থ আমাকে দান করলে বা এইরকম যত অর্থ আমাকে সিংহলে দেওয়া হয়েছে, আমি কথায় তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেও তারা এসবের কিছুই বুঝতে পারবে না। তাদের দুর্দশাময় জীবনের যে বর্ণনাই আমি তোমাদের দিই না কেন তাতেও অবস্থার সঠিক কোন ধারণা তোমাদের মনে আসবে না।

এই প্রসঙ্গে এখনই আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে যে এদের ও এদের মত অন্যদের জন্য তোমরা কি করতে পার? জীবনে আরও কিছু সরলতা বা আরও কিছু কৃচ্ছ্রসাধনার কথা সহজেই বলা যেতে পারে, কিন্তু তাতে সমস্যাটি নিয়ে খেলা করাই হবে।

এই রকম অনেক চিন্তার ফলেই আমাকে চরকার আশ্রয় নিতে হয়েছে। তোমাদের এখন যেমন বলছি আমি নিজেকেও সেই রকম বলেছি যে, যদি তোমরা নিজেদের ও এই অগণিত ক্ষয়িষ্ণু মানুষের মধ্যে একটি প্রাণের বন্ধন সৃষ্টি করতে পার তবেই তাদের, তোমাদের নিজেদের ও দেশের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে।

এই প্রতিষ্ঠানে ধর্মবিষয়ে উপদেশ তোমরা ভালভাবেই পাও। তোমাদের একটি সুন্দর মন্দিরও আছে। তোমাদের কর্মসূচীতে দেখলাম যে, প্রত্যেক দিন প্রথমে উপাসনা করে তোমরা দিনের কাজ সুরু কর ও দৈনন্দিন অন্যান্য কর্মসূচীর সব কিছুই সৎ ও শুভ কিন্তু এই উপাসনা কেবলমাত্র একটি মনোরম অনুষ্ঠানেই পর্যবসিত হবে যদি না প্রতিদিন কোন প্রত্যক্ষ কর্মোদ্যোগে রূপান্তরিত হয়। সেজন্য বলি—এই উপাসনা কাজটির অনুসরণে সুতো কাটার চরকাটি টেনে নাও—অন্ততঃ আধ ঘণ্টা সুতো কাটো আর যে লক্ষ লক্ষ হতভাগ্যের বর্ণনা আমি দিয়েছি, তাদের কথা চিন্তা কর ও ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে বল "আমি এদের জন্যই সুতো কাটছি।" যদি সর্বান্তঃকরণে তোমরা তা কর আর মনে যদি এই বিশ্বাস থাকে যে আরাধনার এই প্রত্যক্ষ প্রকাশে তোমরা আরও বিনম্র আরও ঐশ্বর্যবান্ হবে—যদি আড়ম্বরের জন্য নয়, লজ্জা নিবারণের জন্যই বেশভূষা কর তাহলে খাদি পরায় তোমাদের কোন সঙ্কোচ থাকবে না ও অসংখ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে তোমাদের একটি আত্মীয়তা গড়ে উঠবে।

এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই না।

স্যার রামানাথন্ তোমাদের যে যত্ন নিয়েছেন ও তোমাদের সম্বন্ধে যে মনোযোগ দিয়েছেন—লেডী রামানাথন্ ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা আজও তোমাদের জন্য যে যত্ন নেন ও মনোযোগ দেন তার যোগ্য হতে হলে তোমাদের আরও অনেক কিছু করতে হবে। তোমাদের ম্যাগাজিন্গুলোতে পুরোনো ছাত্রীদের কৃতিত্বের উল্লেখ

আমি দেখেছি—সেরকম বিজ্ঞপ্তিও আমি দেখেছি। অমুককে অমুক বিয়ে করেছে—এরকম চার-পাঁচটি বিজ্ঞপ্তি। আমি মানি পঁচিশ বা বাইশ বছর বয়সের মেয়েদের এরকম বিয়েতে কোন দোষ নেই। কিন্তু এইসব বিজ্ঞপ্তিতে আমি এমন একটি মেয়ের উল্লেখ দেখলাম না যিনি অপরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। অতএব আমি তোমাদের কাছে সেই কথাই বলতে চাই যা আমি বাঙ্গালোরে মাননীয় মহারাজার বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বলেছিলাম তা এই যে, শিক্ষাবিদ্‌রা যে মহান্ প্রচেষ্টা করছেন বা প্রাচুর্যের সঙ্গে যে দান ব্যয় করা হচ্ছে তার যৎসামান্যই ফিরে পাওয়া যাবে, যদি তোমরা নিজেদের খেলার পুতুলে পরিণত কর আর এই বিদ্যায়তন থেকে উত্তীর্ণ হওয়া মাত্রই কর্মময় জীবন থেকে দূরে সরে যাও।

স্কুল ও কলেজ থেকে বিদায় নিয়ে অধিকাংশ মেয়েরাই সামাজিক জীবন থেকে অদৃশ্য হয়। তোমরা যারা এই বিদ্যায়তনের তাদের এরকম করার কারণ নেই। কুমারী অ্যামেরী ও তাঁর মত যাঁরা পরিদর্শিকার কাজ করেছেন তাঁদের দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনেই রয়েছে আর আমি যদি ভুল না বলি তাঁরা সকলেই কুমারী ছিলেন।

প্রত্যেকটি তরুণী বা প্রত্যেকটি ভারতীয় তরুণী শুধু বিয়ে করতেই জন্ম নেয়নি। ব্যক্তিবিশেষের সেবা না করে যাঁরা সেবাব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এরকম অনেক তরুণীর কথা আমি বলতে পারি। হিন্দু তরুণীরা পার্বতী ও সীতার গৌরবময় দৃষ্টান্ত ও সম্ভব হলে আরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন—এখন সেই সময়ই এসেছে।

তোমরা নিজেদের শৈব বলে দাবী কর। তোমরা জান পার্বতী কি করেছিলেন। তিনি স্বামীর জন্য অর্থ ব্যয় করেননি বা নিজেকে বিক্রি করতেও দেননি, তবুও তিনি হিন্দুপুরাণে সপ্তসতীর অন্যতমা বলে অভিহিত হয়েছেন তাঁর অশ্রুতপূর্ব তপস্যার পুণ্যে—কোন শিক্ষায়তন থেকে কতগুলো উপাধি অর্জন করেছেন এ জন্য নয়।

আমি জানি ঘৃণ্য পণপ্রথা আজও এখানে আছে যে কারণে তরুণীদের উপযুক্ত পাত্র পাওয়া খুবই কঠিন হয়। বয়স্কা তরুণীরা—তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বয়স্কা আছেন—এসব প্রলোভন জয় করবে এটাই আশা করা যায়। যদি এইসব কুপ্রথা তোমরা দূর করতে চাও তাহলে তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে সারা জীবন, কমপক্ষে বেশ কয়েক বছরের জন্য, কুমারী থেকে ঐ কাজের সুত্রপাত করতে হবে। পরে যখন তোমাদের বিয়ের সময় আসবে—জীবনে একজন সাথীর প্রয়োজন যখন তোমরা অনুভব করবে তখন তোমরা এমন কোন একজনের জন্য অধীর হবে না, যিনি ধন মান বা সৌন্দর্যের অধিকারী, বরং পার্বতীর মত তোমরা এমন একজনের খোঁজ করবে যাঁর মধ্যে আছে চরিত্র গঠনে সক্ষম অতুলনীয় সব গুণ। তোমরা জান নারদজী পার্বতীর কাছে শিবের কি বর্ণনা দিয়েছিলেন—'শিব একটি ভস্মমাখা ভিক্ষু, তার মধ্যে সৌন্দর্য কিছুই নেই—ব্রহ্মচারী মাত্র।' উত্তরে পার্বতী বলেছিলেন—'হ্যাঁ, তিনিই আমার স্বামী হবেন।' শিবের মত অনেককেই তোমরা খুঁজে পাবে না যদি না পার্বতীর মত হাজার হাজার বছর না হলেও অন্ততঃ পক্ষে কিছু দিনের জন্যও তোমরা তপস্যা করতে প্রস্তুত না হও। আমরা যারা দুর্বল তারা তা করতে পারবো না; কিন্তু তোমাদের জীবনে অন্ততঃ তোমরা তা করতে পার।

এই বিধিগুলো যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে পুতুলের রাজ্যে অদৃশ্য হতে তোমরা অস্বীকার করবে ও পার্বতী, দময়ন্তী, সীতা ও সাবিত্রীর মত সতী হবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করবে। আমার বিনীত মত এই যে কেবলমাত্র তখনই, তার আগে নয়—তোমরা এরকম একটি বিদ্যায়তনের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

ঈশ্বর তোমাদের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করুন—তোমরা অনুপ্রাণিত হলে এই আদর্শ রূপায়িত করতে ভগবান তোমাদের সহায় হোন্।

বালবিবাহের অভিশাপ

সম্প্রতি মাদ্রাজে সঙ্ঘটিত একটি মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ মিসেস মারগারেট ই. কসিনস আমাকে পাঠিয়েছেন—ঘটনাটি একটি বাল-বিবাহ সম্বন্ধীয়। এক্ষেত্রে কন্যার বয়স তের ও বরের বয়স ছাব্বিশ। দম্পতিটি একসঙ্গে তের দিন যাপন করবার আগেই মেয়েটি আগুনে পুড়ে মারা যায়। তার স্বামীর অসহনীয় ও অমানুষিক কামাবেগের কারণে সে আত্মহত্যা করেছে এরকম রায়ই জুরীরা দিয়েছেন। মেয়েটির মৃত্যুকালীন জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে স্বামী তার কাপড়ে আগুন দেয়। কামনা কোন ভালমন্দ বিচার করে না বা কোনো দয়া জানে না।

কিন্তু মেয়েটির কিভাবে মৃত্যু হলো তা অবান্তর। সন্দেহাতীত তথ্যগুলো হলো এই—

(১) মাত্র তের বছর বয়সে মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল।

(২) তার কোন যৌন আবেগ ছিল না কেননা এ বিষয়ে তার স্বামীর প্রয়াসকে সে বাধা দেয়।

(৩) স্বামী নিষ্ঠুরভাবে উপগত হবার চেষ্টা করেছিল।

(৪) এবং মেয়েটি এখন আর জীবিত নেই।

এক বন্য প্রথাকে ধর্মীয় অনুমোদন দেওয়া কোন মতেই ধর্ম নয় বরং অধর্ম। স্মৃতিশাস্ত্রে অজস্র পরস্পর বিরোধী উক্তি আছে। এই পরস্পর বিরোধী উক্তি থেকে যুক্তিযুক্ত এই সিদ্ধান্তই শুধু করা যায় যে, যে সমস্ত নির্দেশ সুপ্রচলিত নীতির বিরোধী বা স্মৃতিশাস্ত্রেরই উদ্ধৃত নৈতিক উপদেশের বিরোধী সেগুলোকে প্রক্ষিপ্ত বলে ত্যাগ করতে হবে। যে লেখনী আত্মসংযম বিষয়ে উদ্দীপনাময়ী শ্লোক রচনা করেছে সেই লেখনী একই সময়ে কখনও মানুষের ভিতরে পশুভাব জাগাবার জন্য শ্লোক রচনা করতে

পারে না। ঋতুমতী হবার বয়সের আগে কোন মেয়েকে বিয়ে না করা কেবলমাত্র আত্মসংযমে অনভিজ্ঞ ও পাপমগ্ন লোকেরাই পাপ বলে মনে করতে পারে। বরং রজঃস্বলা হবার পরেও কয়েক বছরের মধ্যে কোন মেয়েকে বিয়ে করাও পাপ বলে মনে করা উচিত। রজঃস্বলা হবার আগে বিয়ের কোন চিন্তা করাই চলতে পারে না। যেমন কোন ছেলে তার ওপর ঠোঁটে প্রথম কেশোদ্গম হবামাত্র যতটুকু জনন ক্ষমতা অর্জন করে রজঃস্বলা হবামাত্র একটি মেয়েও সন্তানধারণে তার চেয়ে বেশী সক্ষম হয় না।

এই বাল্যবিবাহ প্রথা নীতি ও স্বাস্থ্য দু'এর পক্ষেই ক্ষতিকর কারণ এ আমাদের নৈতিক অবনতি ও শারীরিক অবক্ষয় ঘটায়। এরকম প্রথা সমর্থন করে আমরা যেমন ঈশ্বরের তেমনি স্বরাজ থেকে দূরে সরে যাই। মেয়েদের অল্পবয়স সম্বন্ধে যে পুরুষের কোন চিন্তা নেই তার মনে কোন ঈশ্বরচিন্তাও নেই। অপরিণত পুরুষদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুদ্ধ করবার কিংবা স্বাধীনতা লাভ যদিও বা হয় তা রক্ষা করবার কোন শক্তি থাকবে না। স্বরাজের জন্য সংগ্রাম অর্থ কেবলমাত্র রাজনৈতিক জাগরণ নয় বরং সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—এই সর্বব্যাপী জাগরণ।

সহবাসের সম্মতির ন্যূনতম বয়স বাড়াবার জন্য আইন করার চেষ্টা হচ্ছে। অল্প কয়েকজন অপরাধীকে শাস্তি দেবার পক্ষে তা ভালই হবে কিন্তু সর্বসাধারণের প্রচলিত কোন কুপ্রথাকে আইন করে দূর করা যাবে না। কেবলমাত্র শিক্ষিত জনমতের দ্বারাই তা করা সম্ভব। এইসব বিষয়ে আইন প্রণয়নে আমি বিরোধী নই কিন্তু জনমত সংগঠনের ওপরই অবশ্য আমি বেশী গুরুত্ব দিই। মাদ্রাজের ঘটনাটি অসম্ভব হত যদি বালবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত থাকত। সাধারণভাবে আঠারো বছর বয়সের নীচে কোন মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

বালবিবাহের সমর্থনে

ইয়ং ইণ্ডিয়ার একজন পাঠক লিখছেন—

"১৯২৬ সালের ২৬শে আগষ্টের ইয়ং ইণ্ডিয়া.ত প্রকাশিত 'বালবিবাহের অভিশাপ' শীর্ষক আপনার প্রবন্ধে নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে আমি খুবই ব্যথিত হয়েছি :—'ঋতুমতী হবার বয়সের আগে কোন মেয়েকে বিয়ে না করা কেবলমাত্র আত্মসংযমে অনভিজ্ঞ ও পাপমগ্ন লোকেরাই পাপ বলে মনে করতে পারে।' এ আমি বুঝতে পারি না যে কেন আপনি যাদের মত আপনার থেকে আলাদা তাদের সম্বন্ধে একটু উদার হতে পারেন না। এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে বালবিবাহের নির্দেশ দিয়ে হিন্দু সমাজবিধি রচয়িতারা সম্পূর্ণ ভুল করেছেন, কিন্তু যাঁরা বালবিবাহের ওপর জোর দেন তাঁরা পাপাসক্ত এ বলা আমি অযৌক্তিক বলে মনে করি। তর্কের সময় যেটুকু সৌজন্য থাকা উচিত এর দ্বারা তার সীমা ছাড়িযে যায বলে মনে হয। বস্তুতঃ বালবিবাহের বিরুদ্ধে এ রকম যুক্তি আমি এই প্রথম শুনলাম। যতদূর জানি হিন্দু সমাজ-সংস্কারকেরা বা খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকেরা কেউই এ রকম বলেন নি। অতএব যে মহাত্মা গান্ধীকে বিরোধীদের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতার আদর্শ বলে মনে করি তাঁরই লেখনীতে এ রকম যুক্তির অবতাবণা দেখে আমি কতখানি আঘাত পেযেছি তা বুঝতে পারেন।

"একজন বা দুজন নয, বস্তুতঃ সমগ্র হিন্দু-বিধি রচয়িতার প্রত্যেককেই বোধকরি আপনি অভিযুক্ত করেছেন। যতদূর জানি প্রত্যেক স্মৃতিকারই মেয়েদের শীঘ্র বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার মতানুযায়ী যে সমস্ত অনুচ্ছেদে বালবিবাহের নির্দেশ আছে তার সবগুলোকে প্রক্ষিপ্ত বলে বিচার করা অসম্ভব। বালবিবাহ প্রথা বিশেষ কোন প্রদেশ বা সমাজের কোন শ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ নয—বরং বাস্তবিক পক্ষে এ ভারতের সর্বজনীন প্রথা। আবার এ একটি সুপ্রাচীন প্রথা যা রামায়ণের যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে।

"মেয়েদের যথাশীঘ্র বিয়ের ওপর কেন হিন্দু বিধি রচয়িতারা জোর দিয়েছেন তার যে যে কারণ থাকতে পারে বলে আমি মনে করি সেগুলো আমি সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা করবো। নির্বিশেষে প্রত্যেক মেয়েরই যে

বিধিমত একটি স্বামী থাকা উচিত এটা তাঁরা খুবই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন। মেয়েদের সুখ ও মানসিক শান্তির জন্য এ যেমন প্রয়োজন সাধারণভাবে সমাজের কল্যাণের জন্যও এ তেমনই প্রয়োজন। যদি প্রত্যেকটি মেয়ের জন্য একটি করে স্বামীর ব্যবস্থা করতে হয় তবে সেই স্বামী নির্বাচনের দায়িত্বও মেয়ের মা-বাবার ওপরই দেওয়া উচিত—সংশ্লিষ্ট মেয়েটির ওপর নয়। স্বামী নির্বাচনের দায়িত্ব যদি মেয়েদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় তবে অনেক মেয়েকেই অবিবাহিতা হয়েই থাকতে হবে এই জন্য যে, উপযুক্ত স্বামী খুঁজে পাওয়া অনেক মেয়ের পক্ষেই সুকঠিন—মেয়েরা বিয়েতে অনিচ্ছুক, এই কারণে নয়, এটা নিরাপদও নয় কারণ পরিণামে এ প্রেমাভিনয়ে উৎসাহ দিতে পারে ও নৈতিক শিথিলতা আনতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে সৎ এমন যুবকেরা সরলা মেয়েদের কৌমার্য নষ্ট করতে পারে। আবার নির্বাচন যদি মা-বাবাকেই করতে হয় তবে নিশ্চয়ই মেয়েদের অপ্রাপ্তবয়সেই বিয়ে দিতে হবে। বয়স হলে তারা অন্য কারুর প্রেমে পড়তে পারে ও মা-বাবার নির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক হতে পারে। অল্প বয়সে বিয়ে হলে মেয়েরা তার স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সঙ্গে সহজেই মিলে যেতে পারে। এই মিলন অনেক স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গীন হয়। প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েরা যাদের মতামত ও অভ্যেসগুলো দৃঢ়ভাবে তৈরী হয়েছে তাদের পক্ষে নতুন পরিবারে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

"বালবিবাহে প্রধান আপত্তি এই যে, এতে মা ও তার সন্তানদের স্বাস্থ্য-হানি ঘটায়। কিন্তু এই আপত্তি নীচের এইসব কারণে খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। হিন্দুদের মধ্যে বিয়ের বয়স আজকাল বাড়ছে তবু জাতি আরও দুর্বল হচ্ছে। পঞ্চাশ বা একশো বছর আগে স্ত্রী ও পুরুষেরা এখনকার তুলনায় সাধারণভাবে আরও শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু ছিল। কিন্তু তখন বালবিবাহ বেশী প্রচলিত ছিল। শিক্ষিতা মেয়েরা যাদের বিয়ে বেশী বয়সে হয় তাদের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ যে মেয়েরা অল্প বয়সে বিবাহিতা ও কম শিক্ষাপ্রাপ্তা তাদের চেয়ে সবক্ষেত্রে উন্নততর নয়। এই সব তথ্য থেকে এটা সম্ভব বলে মনে হয় যে কেউ কেউ যেমন মনে করেন বালবিবাহ ততখানি স্বাস্থ্যহানি ঘটায় না।

"ইউরোপীয় ও ভারতীয় দুই সমাজ সম্বন্ধেই আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সাধারণভাবে ভারতীয় স্ত্রীরা ইউরোপীয় স্ত্রীদের চেয়ে তাদের

স্বামীর প্রতি বেশী অনুগত কিনা, গরীব শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় স্বামীরা ইউরোপীয় স্বামীদের চেয়ে তাদের স্ত্রীর প্রতি বেশী স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করে কিনা, ভারতীয়দের মধ্যে অসুখী বিয়ের ঘটনা ইউরোপীয়দের চেয়ে অনেক কম কিনা, বা ইউরোপীয় সমাজের চেয়ে ভারতীয় সমাজে যৌনজীবনের মান বেশী উচ্চস্তরের কিনা তা আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন। এই সব বিষয়ে ইউরোপীয় বিবাহের চেয়ে যদি ভারতীয় বিবাহের সার্থকতা বেশী থাকে তাহলে ভারতীয় ব্যবস্থায় বালবিবাহ যেখানে অপরিহার্য তাকে দোষণীয় বললে চলবে না।

"আমি এ কথা কিছুতেই মানতে পারি না যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বালবিবাহের অনুশাসন দিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি যে বালবিবাহ—যা হিন্দু সমাজের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য—বিশেষ প্রতিকূল পরিবেশেও আপন পবিত্রতা রক্ষা করেছে ও অবক্ষয় প্রতিহত করেছে। আপনি হয়ত এ সব বিশ্বাস করবেন না কিন্তু বালবিবাহ যাঁরা আবশ্যিক বলেন সেই সব মহান হিন্দু প্রণেতারা আত্মসংযমে অনভিজ্ঞ ও পাপাসক্ত ছিলেন—আপনার এ ধারণা আপনি ত্যাগ করবেন এ কি আমি আশা করতে পারি না ?

"আপনার বর্ণিত মাদ্রাজের ঘটনাটি অত্যন্ত অদ্ভূত বলে মনে হয়। মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল বলে জুরীরা মনে করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি বলেছিল যে তার স্বামী তার কাপড়ে আগুন দেয়। এইসব পরস্পর-বিরোধী পরিস্থিতিতে যেসব ঘটনাকে আপনি সন্দেহাতীত বলে মনে করেন সত্যি সে সব যে তাই এ রকম ধারণা করা খুবই কঠিন। তের বছরের কম বয়সের লক্ষ লক্ষ বালিকাবধূ আছেন। স্বামীর নিষ্ঠুর যৌন আবেগের কারণে আত্মহত্যার একটি ঘটনাও ইতিপূর্বে শোনা যায় নি। সম্ভবতঃ মাদ্রাজ ঘটনায় কতগুলো বিচিত্র তথ্য ছিল ও বালবিবাহই মৃত্যুর প্রধান কারণ নাও হতে পারে।"

কবি ঠিকই বলেছেন, ঘটনার যে রূঢ়তা গোপনে আপন বিবেককে আঘাত দেয় তা প্রশমনের উদ্দেশ্যে মনোমত দার্শনিক তথ্য রচনা কষ্টসাধ্য নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়ার পাঠক আর একটু বেশী এগিয়েছেন। তিনি কেবলমাত্র মনোমত জীবনদর্শন রচনা করেননি, উপরন্তু তথ্যগুলোও উপেক্ষা করেছেন ও অসমর্থিত বিবরণের ওপর নিজের যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন।

সমদৃষ্টির অভাব সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলব না এই কারণে যে শুধু অনুশাসন প্রণেতাদের নয়, উপরন্তু সেই সব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও আমি পাপাচারের অভিযোগ এনেছি, যাঁরা মাতৃত্বের ভার বহনে অক্ষম অল্পবয়সী মেয়েদের বিবাহ আবশ্যিক বলে মনে করেন। সুবিচারের অভাব তখনই ঘটে কেবলমাত্র যখন তুমি কোন কাল্পনিক কেউ নয়, একজন জীবন্ত লোককে কোন কারণ ছাড়া অসৎ উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত কর। কিন্তু স্মৃতির যেসব আদি লেখকেরা আত্মসংযমের উপদেশ দিয়েছেন তাঁরাই যে বালবিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন—পত্রলেখকের এই উক্তির কোথাও কি সমর্থন আছে? এরকম বিচার করা কি বেশী সঙ্গত হবে না যে ঋষিগণ কখনই কোন অপবিত্রতার দোষে অপরাধী নন বা নরদেহগঠনের মূল তথ্যগুলো সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না?

কিন্তু যদিওবা শিশুবিবাহের শাস্ত্রীয় নির্দেশ—বালবিবাহ বললাম না, (কারণ বালবিবাহ বলতে পঁচিশ বছরের কম বয়সে বিবাহ বোঝায়)—সত্যই প্রমাণিত হয়, তবুও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিচারে আমরা নিশ্চয়ই তা বর্জন করবো। হিন্দু সমাজে বালবিবাহ সর্বজনীন এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। লক্ষ লক্ষ বালিকাবধূ—নিজেরা স্বল্পবয়সী হলেও তাদের স্ত্রীর কর্তব্য পালন করতে হয়, এ বিশ্বাস করা আমার পক্ষে পরিতাপের সন্দেহ নেই। হিন্দু সমাজ অনেকদিন আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো যদি এই লক্ষ লক্ষ বালিকাবধূর দৃষ্টান্তস্বরূপ এই একাদশ বর্ষীয়াদের বিবাহ ও যৌনজীবনের সূচনা ঘটতো। মা-বাবাকেই যদি তাঁদের কন্যাদের স্বামী নির্বাচন করে দিতেও হয়, সেই কারণেই

যে তাদের বিয়ে ও দাম্পত্যজীবনের সূচনা অল্পবয়সেই করতে হবে এও মেনে নেওয়া যায় না। মেয়েদের ক্ষেত্রেও নির্বাচন করতে দিলে যে পূর্বানুরাগ ও প্রণয়চপলতার সৃষ্টি হবেই এরকম বিচারও ঠিক নয়। যাহোক্ পূর্বানুরাগ ইউরোপে সর্বজনীন নয় ও হাজার হাজার হিন্দু মেয়ের পনের বছর বয়সের ওপরে বিয়ে হলেও তাদের মা-বাবাই তাদের স্বামী নির্বাচন করে থাকেন। মুসলমান বাবা-মাকে অবশ্যই বয়স্কা কন্যাদের জন্য স্বামী নির্বাচন করতে হয়। নির্বাচন কন্যা করবে না তার বাবা-মা করবেন সে প্রশ্ন আলাদা ও তা সামাজিক রীতিনীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

প্রাপ্তবয়স্কা মায়ের সন্তানেরা অপ্রাপ্তবয়স্কা মায়ের সন্তানের চেয়ে দুর্বল এই উক্তির সমর্থনে পত্রলেখক কোন প্রমাণ দেননি। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দুই সমাজ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তাদের নৈতিক অবস্থার কোন তুলনা করতে আমি অস্বীকার করব। যাহোক্ তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া যায় যে ইউরোপীয় সমাজের নীতিজ্ঞান হিন্দু সমাজের নীতিজ্ঞানের চেয়ে হীন, তবু তা দিয়ে কি এই প্রমাণিত হয় যে সেই হীনতা প্রাপ্তবয়সে বিয়ের জন্যই ঘটেছে?

পরিশেষে মাদ্রাজের ঘটনা পত্রলেখককে সমর্থন করে না, বরং এর উল্লেখ দ্বারা তিনি যে তথ্যগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ত্বরিৎ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাই প্রমাণ করে। আমার রচনাটি যদি তিনি আর একবার পড়েন তাহলে দেখবেন যে আমার সিদ্ধান্ত স্বীকৃত তথ্য থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। আমার সিদ্ধান্ত মৃত্যুর কারণ দিয়ে প্রভাবিত হয়নি। এই প্রমাণিত হয়েছে যে (১) মেয়েটি অল্পবয়সী ছিল, (২) তার কোন যৌনপ্রবৃত্তি ছিল না, (৩) স্বামী নির্লজ্জভাবে কামাচার করতে চেয়েছিল, (৪) মেয়েটি এখন আর জীবিত নেই। মেয়েটি আত্মহত্যা করে থাকলে এমনিতেই তা দোষণীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু পাশবিক কাম প্রবৃত্তির কাছে আত্ম-

সমর্পণ না করায় স্বামী যদি তাকে হত্যা করে থাকেন তবে তা ততোধিক গর্হিত। মেয়েটি কেবলমাত্র পড়াশোনা ও খেলাধুলো করতেই সমর্থ ছিল—স্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করতে নয় ও কোনক্রমে সে তার অশক্ত কাঁধের ওপর গৃহস্থালীর দায়িত্বের গুরুভার বা তার স্বামী ও প্রভুর দাসত্বের ভার বহনে সমর্থ ছিল না।

আমার পত্রলেখক সমাজে উঁচু পদাধিকারী ব্যক্তি। যাঁরা যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছেন ও যাঁরা জাতির কল্যাণ চিন্তা করবেন বলে আশা করা যায়, সেই সব পুত্রকন্যার কাছ থেকে দেশমাতা উন্নততর কিছু আশা করে। আমাদের মধ্যে নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বহু অন্যায় আছে। ধীর বিচার, অনলস অনুশীলন, উত্তেজনাহীন পর্যালোচনা, নির্ভুল ব্যাখ্যা, সঠিক চিন্তাধারা ও পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ঐগুলোর মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মত মতপার্থক্য হতে পারে, কিন্তু যে মূল্যেই হোক না কেন আমরা যদি সত্যানুসন্ধান না করি ও সত্যনিষ্ঠ না হই তবে স্বধর্মের, জাতীয় স্বার্থের ও স্বদেশের সমূহ ক্ষতিই করবো।

বালবিবাহের ভয়াবহতা

বালবিবাহ নিরোধ সমিতি বালবিবাহ বিষয়ে একটি প্রয়োজনীয় ও তথ্যবহুল বিবরণী প্রকাশ করেছে। আমি নীচে বিশেষ বিশেষ অনুচ্ছেদগুলো উল্লেখ করছি।

"১৯৩১ সালে ভারতের আদম সুমারীতে বয়স অনুসারে পনের বছর বয়সের নীচে বিবাহিতা বালিকার এইরকম পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে।

বয়ঃক্রম		শতকরা বিবাহিত
০ থেকে ১	..	·৮
১ থেকে ২		১·২
২ থেকে ৩		২·০
৩ থেকে ৪		৪·২
৪ থেকে ৫		৬·৬
৫ থেকে ১০	..	১৯·৩
১০ থেকে ১৫		৩৮·১

"অর্থাৎ এক বছরের কম বয়স্কা প্রতি ১০০ শত মেয়ের মধ্যে প্রায় একটি মেয়ে বিবাহিতা ও পনের পর্যন্ত অন্য সব বয়সের মধ্যে অনুরূপ ভয়াবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

"এর একটি ফল এই যে দেশে বালবিধবার সংখ্যা প্রায় অবিশ্বাস্য। সেই পরিসংখ্যান এই রকম -

বয়ঃক্রম		বালবিধবার সঠিক সংখ্যা
০ থেকে ১	...	১,৫১৫
১ থেকে ২	...	১,৭৮৫
২ থেকে ৩	...	৩,৪৮৫
৩ থেকে ৪	...	৯,০৭৬
৪ থেকে ৫	...	১৫,০১৯
৫ থেকে ১০	...	১,০৫,৪৮২
১০ থেকে ১৫	...	১,৪৫,৩৩৯

"বালবিবাহের কুফল পরিমাণে কম ও এই প্রথা সর্বজনীন নয় বলে প্রায়ই বলা হয়, কিন্তু প্রকাশিত বালবিধবার সংখ্যা যদি সত্য সংখ্যার একশতাংশও হয় তবে কোন মানবপ্রেমিক, সমাজ বা সরকার এই দুঃখের উৎসকে প্রতিরোধ করতে এক মুহূর্তও দেরী করবে না। এ প্রসঙ্গে আমাদের এই স্মরণ করতে হবে যে এইসব মেয়েদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই পুনর্বিবাহ অসম্ভব।

"প্রসবকালে বালিকা মাতার মৃত্যুসংখ্যা বালবিবাহের অপর একটি কুফল। ভারতবর্ষে প্রসবকালে গড়পরতা বার্ষিক মৃত্যুসংখ্যা ২০০,০০০, অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ২০টি মৃত্যু ও এইসব মৃত্যুর একটি বিরাট সংখ্যা কুড়ি বছরের কম বয়স্কা মেয়েদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। স্যার জন মেগোর মতে সন্তান ধারণে অক্ষম হবার আগেই প্রতি এক হাজার তরুণী মায়ের মধ্যে একশ'জনের শিশুজন্মকালেই নিশ্চিত মৃত্যু হয়। মাতৃত্বলাভের সময় মৃত্যুসংখ্যার কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান আমাদের নেই। যেখানে ইংলণ্ডে এ মাত্র ৪'৫, ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে তা ২৪·৫ বলে অনুমান করা হয়।

"পরিশেষে বালবিবাহ শুধুমাত্র মায়েরই নয় উপরন্তু শিশু ও সেই কারণে জাতিরও ক্ষতি করে। ভারতবর্ষে প্রতি হাজারটি নবজাতকের মধ্যে ১৮১টি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ হলো গড় হিসেব। ভারতবর্ষে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এই গড়পরতা হিসেব প্রতি হাজারে চারশো অবধিও যায়। ইংলণ্ড ও জাপানে এই শিশুমৃত্যুর হার যথাক্রমে প্রতি দশলক্ষে ৬০ ও ২৫—এই সংখ্যার তুলনায় ভারতবর্ষের অবস্থা যে কতখানি শোচনীয় তা বোঝা যাবে। এর ভয়াবহতা তখনই প্রকট হয়ে ওঠে যখন ভাবি যে এই সর্বনাশের প্রতিবিধান সম্ভব ও শিক্ষিত সমাজ চেতনার অভাবেই এই সর্বনাশ বিনা বাধায় প্রসার লাভ করছে।

"সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে এই সব বিষয়ে আমাদের অগ্রগতি যদি থাকেও বা কিন্তু তা খুবই মন্থর। দৃষ্টান্তে দেখা যায় ১৯২১ সালে এক বছরের কম বিবাহিতার সংখ্যা ছিল ৯,০৬৬। ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪,০৪২ জন—অর্থাৎ প্রায় পাঁচগুণ বাড়ে যেখানে জনসংখ্যা বেড়েছিল মাত্র এক দশমাংশ। আবার ১৯২১ সালে এক বছরের কম বয়সের বিধবার সংখ্যা ছিল ৭৫৯ জন, পক্ষান্তরে

১৯৩১ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৫১৫তে। পরবর্তী জনপরিসংখ্যানে দেখা যাবে যে উন্নতির পরিমাণ কত নগণ্য। এই সব কুপ্রথার প্রতিবিধানের সব ব্যবস্থার সার্থকতার তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশী বেড়ে যাচ্ছে। এগুলো নির্মূল করবার সক্রিয় প্রয়াস এখন সবচেয়ে প্রয়োজন ও ভারতে নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সরকার ও জনগণের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব ছাড়া মহত্তর ও বেশী প্রয়োজনীয় আর কিছু থাকতে পারে না।"

এই তথ্যগুলো দেখে আমাদের সকলের লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত। কিন্তু তাতেই এই কুপ্রথা দূর হবে না। সহরের মত গ্রামেও বালবিবাহের অভিশাপ সমভাবেই বর্তমান। এটা বিশেষভাবে মেয়েদের কাজ—ছেলেদেরও নিঃসন্দেহে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু যখন পুরুষ পশুতে রূপান্তরিত হয় তখন কোন যুক্তি তার না মানাই সম্ভব। মায়েদের সেই শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাঁরা তাঁদের বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হন ও প্রতিরোধ করা কর্তব্য মনে করেন। নারী ছাড়া এ শিক্ষা তাঁদের আর কে দিতে পারে? অতএব আমি বিনীতভাবে এই প্রস্তাব করি যে নিখিল ভারত নারী সম্মেলন তাঁদের নামের মর্যাদা রাখতে গ্রামের কাজে অবতীর্ণ হোন। তথ্যসম্বলিত বইগুলো মূল্যবান্ কিন্তু সেগুলো ইংরাজী অভিজ্ঞ অল্প নাগরিকের হাতেই পৌঁছায়। যা প্রয়োজন তা হলো. গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলা। এমনকি এ সম্পর্ক গড়ে উঠলেও আর যদি কখনও বা তা হয়ও তবু কাজটি সহজ হবে না। কিন্তু কোন না কোনদিন সেই অভীষ্টলাভের জন্য সেই লক্ষ্যাভিমুখে কাজ সুরু করতে হবে। নিখিল ভারত গ্রাম শিল্প-সঙ্ঘের সঙ্গে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন কি এ উদ্দেশ্যে হাত মেলাবেন? গ্রামের কোন কর্মীর—তা তিনি যতই দক্ষ হোক না কেন—কেবলমাত্র সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। গ্রামীন জীবনের সবক্ষেত্রেই তাঁদের অনুপ্রবেশ

করতে হবে। আমি আবার বলতে চাই যে প্রতিটি মানুষ চিন্তাশীল বিচারক্ষম হবেন বলে আশা করা যায় ও সেইরকম চিন্তাশীল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন গ্রামবাসীদের উপযোগী সত্যকার জীবনের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাদের মনের বিকাশসাধনই হলো প্রকৃত শিক্ষা—গ্রামের কাজের অর্থ হলো এইরকম প্রকৃত শিক্ষা—কেবলমাত্র নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আক্ষরিক জ্ঞান নয়।

অসহায়া বিধবা

সতেরো বছর বয়সের একটি মেয়ে যিনি কোয়েটার ভূমিকম্পে তাঁর স্বামী, দুমাসের শিশুটি, শ্বশুর ও দেওর অর্থাৎ তাঁর শ্বশুরবাড়ীর সকলকেই হারিয়েছেন তাঁর শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করে আমার একজন শোককাতর বন্ধু একটি বিষাদময় চিঠি পাঠিয়েছেন। পত্র-লেখক আরও লিখেছেন যে মেয়েটি কোনরকমে বেঁচে গ্যাছে ও কেবলমাত্র একবস্ত্রে ফিরে এসেছে। মেয়েটি লেখকের কাকার মেয়ে—কি সান্ত্বনা তাকে দেওয়া যায় বা তাকে নিয়ে কি করা যায় এ তাঁর অজানা। মেয়েটি নিজেও অক্ষত নয়। ভাগ্যক্রমে হাত ঠিক থাকলেও তার পায়ে আঘাত লেগেছে। পত্রলেখক এই বলে চিঠিটি শেষ করছেন -

> "আমি মেয়েটিকে লাহোরে তার মায়ের কাছে রেখে এসেছি। মেয়েটির আবার বিয়ে হতে পারে কি না সে সম্বন্ধে আমি সাবধানে তার কাছে ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের কাছে উল্লেখ করেছিলাম। কেউ কেউ সমবেদনার সঙ্গে আমার কথা শুনলেন আবার কেউ কেউ আমার প্রস্তাব পছন্দ করলেন না। আমার কোন সন্দেহ নেই যে আমার এই বোনের মত অনেক মেয়েকেই একই দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হয়েছে। এই সব অভাগা বিধবারা উৎসাহিত হতে পারে এমন কিছু কি আপনি বলবেন ?"

অনেকদিনের সংস্কার যেখানে জড়িত সেখানে আমার লেখা বা আমার কথা কতদূর কার্যকরী হবে তা আমি জানি না। আমি বার বার বলেছি যে প্রত্যেক বিপত্নীক পুরুষের মত প্রত্যেক পতিহীনারই আবার বিয়ে করার সমান অধিকার আছে। হিন্দু-ধর্মে স্বেচ্ছাকৃত বৈধব্য অমূল্য আশীর্বাদ। কিন্তু অনিচ্ছা-আরোপিত বৈধব্য অভিশাপ বিশেষ। আমি বিশেষ করে এটা অনুভব করি যে বাইরের নিষেধের ভয়ে যতখানি নয় তার চেয়ে হিন্দু-জনমতের ধিক্কার থেকে এ যদি সম্পূর্ণ মুক্ত হতো তবে অনেক বালবিধবাই

কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে আবার বিবাহ করতো। অতএব কোয়েটা থেকে এই স্বজনবিয়োগ-বিধুরা ভগিনীর মত হতভাগ্য অবস্থার সব পতিহীনাকে আবার বিয়ে করার জন্য সবরকম উৎসাহ দেওয়া উচিত —তারা আবার বিয়ে করলে তাদের ওপর কোনরকম দোষারোপ করা হবে না সে সম্বন্ধে তাদের নিরুদ্বিগ্ন করা উচিত—ও তাদের জন্য উপযুক্ত স্বামী নির্বাচনে সব রকম চেষ্টা করাও অবশ্য কর্তব্য। কোন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ করা যেতে পারে—এ সেরকম কাজ নয়। এ কাজ ব্যক্তিগতভাবে সেই সব সমাজ-সংস্কারকদেরই করতে হবে যাঁদের আত্মীয়াদের কেউ কেউ পতিহীনা হয়েছেন—তাঁদের আপন পরিজনদের মধ্যে সংযতভাবে কিন্তু সোৎসাহে ও মর্যাদার সঙ্গে প্রচারের কাজ চালাতে হবে—আর কৃতকার্য হলে সেই ঘটনাকে যথাসম্ভব প্রচার করতে হবে। এইভাবে—একমাত্র এইভাবেই ভূমিকম্পে যে সব মেয়েরা পতিহীনা হয়েছেন তাঁদের সত্যকার সহায়তা সম্ভব। শোকের স্মৃতি যখন সাধারণের মনে জেগে থাকে তখনই সহানুভূতি ও সমবেদনাকে একমুখী করা সহজ হয়। আর যদি একবার এই সংস্কার অনেকক্ষেত্রে দূর হয় তাহলে যে সব মেয়ে স্বাভাবিকভাবে পতিহীনা হয়েছেন তাঁদের পক্ষেও ইচ্ছে হলে আবার বিয়ে করা সহজ হবে।

বাধ্যতামূলক বৈধব্য

জুলিয়াস সীজারের সমকালীন সিসিলির অধিবাসী ডিওডোরাস রচিত 'ইউনিভারসল হিষ্ট্রি' থেকে সতীদাহ ও বৈধব্য বিষয়ে এক তথ্যপূর্ণ অংশ সন্ধান করে প্যারীলাল পাঠিয়েছে—

"এই সময়ে ভারতীয়দের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রথা ছিল—যুবক ও যুবতী বিবাহেচ্ছু হলে মা বাবার পরামর্শমত নয়—পরস্পরের সম্মতিক্রমেই বিবাহিত হত। কিন্তু অপরিণত বয়স্কদের মধ্যে বিয়ে হয়ে প্রায়ই বিচারে ভুল হতো—তখন দু পক্ষই এই বিয়ের জন্য অনুতাপ করতো। অনেক মেয়েই ভ্রষ্টা হতো ও দ্বিচারিনী হয়ে পরপুরুষে আসক্ত হতো। অবশেষে প্রথম নির্বাচিত স্বামীকে পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক হলেও যখন চক্ষুলজ্জায় খোলাখুলিভাবে তা করতে পারতো না তখন বিষ দিয়ে তাদের সরিয়ে দিত। মৃত্যু ঘটাবার এই উপাদান বিষ সহজেই দেশে জোগাড় করা যেতো কারণ মারাত্মক শক্তি সম্পন্ন নানা রকমের বিষ দেশেই তৈরী হয় যার মধ্যে কয়েকটি গুঁড়ো করে খাবার বা পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেই মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু যখন এই জঘন্য অভ্যেস বহুজনের মধ্যে প্রসার লাভ করলো ও অনেক প্রাণ নাশ হলো আর যখন দেখা গেল যে অপরাধীর শাস্তিবিধান করেই স্ত্রীদের অন্যায় আচরণ থেকে বিরত করা গেল না তখন তারা এ রকম বিধি গ্রহণ করল যে গর্ভবতী বা সন্তানবতী ছাড়া অন্য সব স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মরতে হবে ও এই নির্দেশ পালন করতে না চাইলে শেষ জীবন পর্যন্ত তাকে বিধবা হয়ে থাকতে হবে আর চিরকাল তাকে অপবিত্র হয়ে সব রকম যজ্ঞ ও অন্যান্য সব অনুষ্ঠান থেকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে।"

উদ্ধৃত অংশগুলোতে যদি এই দুটি অমানুষিক প্রথার মূল কারণ ঠিকঠিকভাবে বর্ণিত হয়ে থাকে তবে আইন করে আমাদের মধ্যে সতীদাহ নিবারণের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবার কারণ আছে। বিয়ে কি সে সম্বন্ধেও যে মেয়েরা অজ্ঞ তাদের প্রতি বাধ্যতামূলক

বৈধব্যের বিধান যে হিন্দুসমাজ দিয়েছে বাইরে থেকে প্রভাব বিস্তার করে তার সংস্কার হতে পারে না। সংস্কার দুই ভাবে হতে পারে—প্রথমতঃ হিন্দুদের মধ্যে জাগ্রত জনমতের প্রভাবের মাধ্যমে ও দ্বিতীয়তঃ মা বাবার বালবিধবাদের আবার বিয়ে দেবার স্বীকৃতি দিয়ে। মেয়েটির সম্মতির অভাব থাকলে পুনর্বিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁদের শিক্ষা দিয়ে তাঁরা এ করতে পারেন। স্বভাবতঃই অল্পবয়স্কা মেয়েদের প্রসঙ্গেই এরকম বলা হচ্ছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে তথাকথিত বিধবারা প্রাপ্তবয়স্কা ও বিয়ে করতে অনিচ্ছুক সেক্ষেত্রে আর কিছুই করবার নেই, কেবল তাদের এটুকু বলে দেওয়া দরকার যে অবিবাহিতা কুমারীদের মত আবার বিয়ে করার স্বাধীনতা তাদেরও আছে। বালিকারা এমনকি বয়স্ক মহিলারা তাদের রূপো বা সোনার তৈরী গলার হার বা আংটিকে যেমন অলঙ্কার বলে মনে করেন তেমনি বন্দীরা যদি তাদের শৃঙ্খলকে অলঙ্কারেব মত সমাদর করেন তাহলে সেই বন্দীদের শৃঙ্খলমোচন করা খুবই কঠিন।

আদর্শ সতী

বম্বের খবরের কাগজে প্রকাশিত সতীদাহের একটি অসমর্থিত ঘটনা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার জন্য একজন পত্রলেখিকা তাঁকে অনুরোধ করায় গান্ধিজী 'নবজীবনে' একটি প্রবন্ধ লিখে এইভাবে নিজের মত প্রকাশ করেন।

ঘটনার যে বিবরণ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে তা সত্য নয় বলেই আমি আশা করি ও সংশ্লিষ্ট মহিলাটির সম্ভবতঃ কোন রোগ বা দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে—আত্মহত্যায় নয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সতীদাহের যে বর্ণনা দিয়েছেন ও যে বর্ণনা আজও অপরিবর্তিত আছে তা হলো যে কোন স্ত্রী তাঁর স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক প্রেমে ও শ্রদ্ধায় তাঁর জীবিতকালে নিঃস্বার্থসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন ও তার পরেও চিন্তায় বাক্যে ও কাজে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ থাকেন। স্বামীর মৃত্যুতে আত্মাহুতি দেওয়া সভ্যতার নিদর্শন নয় বরং আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে নিদারুণ অজ্ঞতা মাত্র—আত্মা অমর, অপরিবর্তনীয় ও নিয়ত বর্তমান। এ পার্থিব দেহের সঙ্গে বিনষ্ট হয় না বরং একটি নশ্বর আধার থেকে আর একটিতে রূপান্তরিত হতে থাকে যতদিন না তার পার্থিব বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি হয়। অগণিত ঋষি ও দ্রষ্টাদের অভিজ্ঞতা থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, ও ইচ্ছে করলে যে কেউ আজও তা উপলব্ধি করতে পারেন। তাহলে এই সব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মহত্যা কি করে যুক্তিযুক্ত হতে পারে ?

আবার প্রকৃত বিবাহের অর্থ কেবলমাত্র দৈহিক মিলন নয়—এ আত্মিক মিলনও বটে। বিবাহ অর্থে যদি শুধু দৈহিক মিলনই হতো তাহলে শোকবিধুরা স্ত্রী স্বামীর প্রতিকৃতি বা তার মোমের প্রতিমূর্তি নিয়েই তৃপ্ত হতে পারতেন। কিন্তু আত্মবিসর্জন

সর্বতোভাবে নিষ্ফল। এ মৃতের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করতে পারে না। উপরন্তু প্রাণময় পৃথিবী থেকে আরও একটি প্রাণ নিয়ে যায়।

দৈহিক মিলনের ভিতর দিয়ে আত্মিক মিলনের আদর্শই হলো বিবাহের লক্ষ্য। এতে যে মানবীয় প্রেম নিহিত আছে তা ভগবৎ বা সর্বজনীন প্রেমের উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ—এই আশা করা যায়। এই কারণেই অমর মীরা গেয়েছেন—

"ভগবানই আমার স্বামী—আর কেউ নয়।"

এতে এই বোঝা যায় যে একজন সতী বিবাহকে ইন্দ্রিয়ক্ষুধা তৃপ্তির উপায় বলে মনে করবে না বরং নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর সত্তার সঙ্গে বিলীন করবার ও নিঃস্বার্থ আত্মাহুতির আদর্শ উপলব্ধি করবার পথ বলে মনে করবে। স্বামীর মৃত্যুতে তার চিতায় আরোহণ করে সে তার আপন সতীত্ব প্রমাণ করবে না বরং সপ্তপদী অনুষ্ঠানে স্বামীর সঙ্গে সত্যবদ্ধ হবার পরমুহূর্ত থেকে সে তার স্বামী, তার পরিজন ও দেশের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই যে বৈরাগ্য, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ তাই প্রমাণ করবে। সে দৈহিক সুখ ও ইন্দ্রিয় উপভোগ ত্যাগ করবে। তুচ্ছ অভাব অভিযোগের দাসত্ব করতে সে অস্বীকার করবে। বরং সে স্বামীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একীভূত হবে—বৈরাগ্য ও আত্মসংযমের সাধনার মধ্য দিয়ে সেবা করবার সামর্থ্য ও আপন জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করার প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে।

এরকম একজন সতী তার স্বামীর মৃত্যুতে শোকবিহ্বলা হবে না বরং তার পরলোকগত স্বামীর আদর্শ ও গুণ তার নিজের কাজে প্রতিফলিত করার সাধনা করবে ও এইভাবে স্বামীর জন্য অমরত্বের রাজমুকুট জয় করবে। যাকে সে বিয়ে করেছিল তার আত্মার মৃত্যু নেই—সদাই জীবিত, এটাই উপলব্ধি করে পুনর্বিবাহের কোন চিন্তাই সে করবে না।

এখানে হয়ত পাঠক প্রশ্ন করবেন—'আপনার বর্ণিত সতী দেহজ কামনা বা ইন্দ্রিয়াবেগ থেকে বিমুক্ত। তার সন্তানলাভের বাসনা থাকতে পারে না। সে বিয়ে করবেই বা কেন?' এর উত্তর এই যে আমাদের বর্তমান হিন্দু সমাজে বিবাহ অনেক ক্ষেত্রে স্বইচ্ছায় ঘটে না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের এই দিশেহারা যুগে কেউ কেউ বিবাহকে ধর্মরক্ষার বর্ম ও আত্মরক্ষার সহায়ক বলে মনে করেন। বস্তুতঃ আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন লোকের দৃষ্টান্ত জানি, যাঁরা যদিও বিয়ের সময় ইন্দ্রিয় আবেগ থেকে মুক্ত ছিলেন না, কিন্তু পরবর্তী কালে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন ও সেই আদর্শ উপলব্ধির বিষয়ে বিবাহিত জীবন তাঁদের অনেক শক্তি দিয়েছে। আমার উধৃত দৃষ্টান্তগুলো এই প্রমাণ করবে যে আমার বর্ণিত সতী কল্পনার পৃথিবীর বাইরে অধিষ্ঠিত এক নিষ্পাপ অস্তিত্বের বর্ণনা মাত্র নয়, এ একটি জীবনাদর্শ—আমাদের এই অতি বাস্তবরূপী পৃথিবীতে যার সাধনা ও উপলব্ধি সম্ভব।

কিন্তু এ আমি সহজেই স্বীকার করি যে, একজন সাধারণ স্ত্রী সতীর আদর্শলাভে প্রয়াসী হলেও মাতাও হতে পারেন। অতএব তাঁকে এইসব গুণের সঙ্গে সন্তান লালন-পালনের জ্ঞানও অর্জন করতে হবে, যাতে সন্তানেরা তাদের দেশের সত্যিকার সেবক হবার জন্য বেঁচে থাকতে পারে।

স্ত্রী সম্বন্ধে আমি যা কিছু বললাম তা স্বামীর সম্বন্ধেও সমভাবেই প্রযোজ্য। স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিক সেবার দৃষ্টান্ত যদি দিতে হয়, তবে স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর নিষ্ঠা ও একাগ্র প্রেমের প্রমাণও দিতে হবে। একের জন্য এক রকম ও অন্যের জন্য আলাদা রকম ওজন ও মাপের মান নির্ধারণ করতে তুমি পার না। তবুও কোন স্বামী তাঁর মৃতা স্ত্রীর সৎকারের চিতায় আরোহণ করেছেন বলে আমরা কখনও শুনিনি। অতএব এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর আত্মাহুতির

প্রথা কুসংস্কারজাত অজ্ঞতা ও পুরুষের অন্ধ আত্মম্ভরিতা থেকেই এসেছে। কোন এক সময়ে এই প্রথার একটি অর্থ ছিল বলে যদি প্রমাণও পাওয়া যায়, এখন একে বর্বরোচিত ছাড়া আর কিছু মনে করা যেতে পারে না। স্ত্রী স্বামীর দাসী নয়—বরং তার সাথী, অর্থাৎ তার উত্তমাঙ্গ, সহকর্মী ও বন্ধু বলে বলা যায়। একই অধিকার ও কর্তব্য পালনে সে পুরুষের অংশীদার। সুতরাং পরস্পরের প্রতি ও পৃথিবীর প্রতি তাদের দায়িত্ব সমান ও পারস্পরিক।

অতএব তথাকথিত বোনের এ আত্মাহুতি আমি নিষ্ফল বলে মনে করি। একে কোন মতেই একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বলে মনে করা যায় না। হয়ত প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আমি কি তার মরণ বরণের সাহসটুকুরও প্রশংসা করি না? বিবেকের নির্দেশ মত আমার উত্তর—"না"। অন্যায়কারীরাও যে এরকম সাহসের পরিচয় দেয় তা কি আমরা দেখিনি? তার জন্য তাদের বাহবা দেবার কথাও কেউ চিন্তা করেনি। আত্মহত্যার অযৌক্তিক প্রশংসা করে অন্য কোন সরল বোনকে তার অজ্ঞাতসারে বিপথে নিয়ে যাবার পাপ আমি কেন আমার কাঁধে নেব? সতীত্ব পবিত্রতার শেষ কথা। সেই পবিত্রতা মৃত্যু বরণ করে অর্জন করা বা উপলব্ধি করা যায় না। নিয়ত সাধনার দ্বারা ও স্বার্থবুদ্ধির নিরন্তর বিনাশের দ্বারা দিনে দিনে সেই পবিত্রতার উপলব্ধি সম্ভব।

আদর্শের ব্যভিচার

বালবিধবার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে একটি চিঠি থেকে অংশবিশেষ আমি নীচে উদ্ধৃত করছি।

"২৩শে সেপ্টেম্বর ইয়ং ইণ্ডিয়ায় আগ্রার '।'-এর চিঠির উত্তরে আপনি বলেছেন যে মা বাবারই বালবিধবা কন্যার আবার বিয়েদেওয়া উচিত। যারা কন্যাদান করেছেন অর্থাৎ যাঁরা শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী নিজের কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দান করেছেন তাঁদের দিয়ে এ কি ভাবে সম্ভব? আনুষ্ঠানিক ভাবে ও ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী যাঁরা জামাতার অনুকূলে আপন কন্যার ওপর সব সত্ব নিঃশেষে ত্যাগ করেছেন তাঁদের পক্ষে জামাতার মৃত্যুর পরে অন্য এক জনের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব। নিজের ইচ্ছেয় চাইলে সে আবার বিয়ে করতে পারে কিন্তু যাকে বাবা-মা একবার দান হিসেবে স্বামীর কাছে সমর্পণ করেছেন তাকে স্বামীর মৃত্যুর পরে বিয়ে দেবার কোন অধিকার এ সংসারে কারুর নেই, আর এই একই কারণে মৃত্যুকালে তার স্বামীর ব্যক্ত অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে সে তার মৃত স্বামীব প্রতি অবিশ্বাসিনী ও বিশ্বাসঘাতিনী হবে। অতএব যুক্তি দিয়ে বিচার করলে সনাতনীদের মধ্যে প্রচলিত কন্যাদান প্রথায় বিবাহিতা কোন বিধবার পক্ষে—তিনি বৃদ্ধা, যুবতী বা বালিকা যাই হোন—স্বামীর পূর্বাহ্নে প্রদত্ত অনুমতি ছাড়া পুনর্বিবাহ অসম্ভব। একজন যথার্থ সনাতনী এ রকম সম্মতি দেবার কথা ভাবতেও পারেন না। বরঞ্চ পারলে তাঁর স্ত্রীব সতী হওযাতেও তিনি সম্মত হবেন, অন্ততঃপক্ষে স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায়—যা ভগবদ্‌ভক্তিরই নামান্তর—স্ত্রী বাকি জীবনটুকু যাপন করবেন—এই তিনি চাইবেন। হিন্দু বিবাহ ও বৈধব্যদশা—যা পরস্পরের পরিপুরক অর্থাৎ একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—সেই উন্নত আদর্শরক্ষার কর্তব্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষাই তাকে চালিত করবে।"

এইরকম তর্ককে আমি মহৎ আদর্শের ব্যভিচার বলে মনে করি। পত্রলেখক সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েছেন সন্দেহ নেই কিন্তু নারীর পবিত্রতা সম্বন্ধে অতি উৎকণ্ঠায় তিনি প্রাথমিক ন্যায়বুদ্ধিটুকুও ভুলে

গ্যাছেন। অল্পবয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে কন্যাদান বলতে কি বোঝা যায়? শিশুদের ওপর সম্পত্তির মালিকানা কোন পিতার আছে কি? তিনি তাদের রক্ষক—মালিক নন। আর আশ্রিতাব স্বাধীনতাকে যখন তিনি বিনিময়যোগ্য করে তোলেন ও রক্ষকের অধিকারের অপব্যবহার করেন তখনই তিনি সে অধিকার হারান। পক্ষান্তরে কোন দান গ্রহণে অসমর্থ শিশুকে কিভাবে দান দেওয়া যেতে পারে? যেখানে গ্রহণ-ক্ষমতারই অভাব সেখানে কোন দানের প্রশ্ন ওঠে না। নিশ্চিতই কন্যাদান একটি বিচিত্র ধর্মীয় রীতি যার একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। এই সব শব্দকে নিতান্ত ভাষাগত-ভাবে ব্যবহার করলে তাতে ভাষা ও ধর্মের অপপ্রয়োগ হয়। পুরাণের রহস্যময় সাহিত্যকে ভাষাগত অর্থে নিলে বিশ্বাস করতে হয় পৃথিবী একটি সরার মত জিনিষ যা হাজারমুখী সাপের মাথায় রাখা আছে ও ঈশ্বর দুধসাগরের শয্যায় পরম সুখে শয়ন করে আছেন।

যে পিতা তাঁর শিশুকন্যাকে জরাগ্রস্ত কোন বৃদ্ধের সঙ্গে বা অপরিণত কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজের অধিকারের অপব্যবহার করেছেন তিনি পাপস্খালনের জন্যও কন্যা বিধবা হলে তাকে আবার বিয়ে দেবেন—এটুকু অন্ততঃ তিনি করতে পারেন। আমি আগেও একটি রচনায় যেমন বলেছি সেইরকম সুরুতেই এ বিবাহ অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা উচিত।

বিধবার পুনর্বিবাহ

একজন বন্ধু এইভাবে তাঁর মনের ভার লাঘব করেছেন—

"আমাদের অভাগিনী বিধবাদের সম্বন্ধে কেন আপনি জোর করে কিছু বলেন না? তাদের গোঁড়া মা-বাবা বা অভিভাবকেরা কখনই যুক্তিতে কান দিতে চান না। বিধবাদেরই এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে আপনি উৎসাহ দেন না কেন?

"এ ছাড়া আমাদের অসংখ্য কুপ্রথা ও রীতি রয়েছে যেমন পণপ্রথার মত পাপ—বিবাহোত্তর ও মরণোত্তর ভোজের ব্যবস্থা ইত্যাদি।"

বিধবাদের বিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন। আমাদেব যুবকেরা নিজেদের সংশোধন করলে তবেই এ সংস্কার সম্ভব হবে। কিন্তু তারা কি নিষ্পাপ? তাদের শিক্ষায় কি তারা লাভবান হয়েছে? কিংবা তাদের শিক্ষায় দোষ দেওয়াই বা কেন? আশৈশব আমাদের মনে দাসমনোভাবের নিপুণ চর্চা চলে। আমরা স্বাধীনভাবে যদি চিন্তাই করতে না পারি তাহলে স্বাধীনভাবে কাজই বা করবো কি ভাবে? আমরা সমানভাবেই জাতিভেদ প্রথার, বিদেশী প্রথার ও একটি বিদেশী সরকারের ক্রীতদাস। যে সব সুবিধে আমাদের দেওয়া হয়েছে তার প্রতিটি শৃঙ্খলে পরিণত হয়েছে। আমাদেব মধ্যে অনেক শিক্ষিত যুবক আছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কজনই বা নিজেব পরিবারের বিধবাদের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করেন? কজনই বা অর্থলোভকেও দমন করেছেন? কজনই বা বিধবাদেব নিজের বোন বা মায়ের মত শ্রদ্ধা সম্মান করেন বা তাদেব সম্ভ্রম রক্ষা করেন? পরিণামে যাই হোক তা উপেক্ষা করে নিজের বিবেকবুদ্ধিমতে জাতিভেদকে অস্বীকার করেছেন ক-জন? অভাগিনী এই বিধবা কার কাছে সাহায্য চাইবে? তাকে আমি কি সান্ত্বনা দিতে পারি? তাঁদের মধ্যে ক-জনই বা 'নবজীবন' পড়েন? এমনকি যাঁরা পড়েনও

তাঁদের মধ্যে ক-জনই বা তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারেন? তবু আমি 'নবজীবনে'র পৃষ্ঠাগুলোতে বিধবাদের কথা সময়মত বিবৃত করেছি ও সুযোগ পেলেই আরও অনেক কিছু করতে চেষ্টা করবো। ইতিমধ্যে যাঁদের তত্ত্বাবধানে কোন বালবিধবা আছেন তাঁদের কাছে আমি এই আবেদন করবো যে ঐ বালবিধবার বিয়ে দেওয়া যেন তাঁরা কর্তব্য বলে মনে করেন।

সংবাদদাতা আমাদের সামাজিক প্রথাগুলোর ওপর তীব্র আলোকপাত করেছেন। কিন্তু সমগ্র দেহটি যখন রোগজীর্ণ হয়েছে তখন ইতস্ততঃ কয়েক জায়গায় ওষুধ দিয়ে কি করে আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি? মরণোত্তর ভোজের আয়োজন বর্বরোচিত, ও বিবাহোত্তর ভোজ উৎসবও এর চেয়ে কম নয়। শেষেরটিকে আমরা কম বর্বরোচিত বলে মনে করতে পারি কারণ সারা বিশ্বে বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠান কমবেশী ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে মরণোত্তর ভোজের একচ্ছত্র ব্যবস্থা আছে। এগুলো ও অন্যান্য আরও কয়েকটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। আমাদের স্বজাতীয়দের মানসিক চেতনার উন্মেষে ও তাদের মনের মুক্তি সাধনেই সর্বাত্মক সংস্কার সম্ভব। যতদিন না আমাদের চিন্তা ও কাজে স্বাধীনতা আসে ততদিন কিছু না করার চেয়েও ইতস্ততঃ সংস্কার নিরর্থক হবে।

অবদমিত মানবতা

অস্পৃশ্যতা অবদমিত মানবতার একটিমাত্র অংশ নয়, হিন্দু সমাজে যুবতী বিধবাও কিছুমাত্র কম নেই। বাংলাদেশ থেকে একজন সংবাদদাতা লিখছেন—

"মুসলমানদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহে কোন বাধা নেই, আবার একজন পুরুষের চারটি স্ত্রী থাকারও বিধান আছে। বস্তুতঃ বহু মুসলমানেরই একাধিক স্ত্রী আছে। অতএব মুসলমান পুরুষদের মধ্যে কেউই প্রায় অবিবাহিত থাকে না। তাহলে একি সত্য নয় যে যেখানে বিধবা বিবাহের কোন নিষেধ নেই সেখানে পুরুষেব চেয়ে নারীর সংখ্যা অনেক বেশী? অন্যভাবে বললে এও কি সত্য নয় যেসব সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহের অনুমতি আছে সেখানে বহু বিবাহের অনুমতিও আছে? হিন্দুদের মধ্যে যদি বিধবাবিবাহ সাধারণ ভাবে প্রচলিত হয় তবে তরুণী বিধবারা কি তাদেরই বিয়ে করার জন্য প্রযাসী হবে না? ফলে অবিবাহিত কন্যাদের বর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব যদি নাও হয় সুকঠিন হবে না?

"একজন হিন্দুর পক্ষে একাধিক স্ত্রী রাখার বিধান না থাকলে বিধবারা যে সব পাপ কাজ করেন বা করেন বলে ধরে নেওয়া হয় সেইসব অপরাধ কি অবিবাহিত মেয়েরাও করবে না?

"বিধবাবিবাহে উৎসাহ দেবার আগে প্রেম, পবিত্র গার্হস্থ্যজীবন, পাতিব্রত্য ধর্ম ও এই জাতীয অন্য সব বিষয়গুলো মনে রাখবার জন্য আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বিরত থাকলাম।"

বিধবার পুনর্বিবাহ বন্ধ করার অতি উৎসাহে পত্রলেখক অনেক কিছুই উপেক্ষা করেছেন। মুসলমানদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার অধিকার আছে সত্যি, কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই একটি স্ত্রী থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দুধর্মের মধ্যেও যে বহুবিবাহের নিষেধ নেই—মনে হয় লেখক তা জানেন না। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীব হিন্দুরাও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন বলে জানা যায়। রাজন্যবর্গের অনেকে অসংখ্যবার বিয়ে

করেন। উপরন্তু পত্রলেখক এ তথ্যও ভুলে গেছেন যে কেবলমাত্র তথাকথিত উঁচু বর্ণের মধ্যেই বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। চতুর্থ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশের মধ্যে বিধবারা বিনা বাধায় পুনর্বিবাহ করে ও তাতে কোন অবাঞ্ছিত পরিণতিও ঘটেনি। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের স্বাধীনতা থাকলেও তাঁরা সর্বক্ষেত্রেই একটিমাত্র সাথী নিয়েই খুশী থাকেন।

তরুণী বিধবারা সব তরুণকেই আহরণ করে নেবে, অবিবাহিতাদের জন্য একজনকেও রাখবে না—এরকম অভিমতে মারাত্মক মাত্রাজ্ঞানহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। তরুণী বালিকাদের সতীত্বের জন্য মাত্রাহীন উদ্বেগ রুগ্ন মনের পরিচায়ক। বিধবার পুনর্বিবাহের সংখ্যা এত কম যে সেই কারণে বহু তরুণীর অবিবাহিত থাকা কখনই সম্ভব নয়, ঘটনাচক্রে যদি সেরকম সমস্যার উদ্ভব হয়ই, তবে যে বহু বালবিবাহ আজ ঘটছে তার মধ্যেই এর কারণ রয়েছে। বালবিবাহ বন্ধ করার মধ্যেই সমস্যার প্রত্যাশিত সমাধান রয়েছে।

অল্পবয়সের বিধবার ক্ষেত্রে প্রেম, গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতা—এসব সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

কিন্তু পত্রলেখক আমার যুক্তির সবটুকুই ভুল বুঝেছেন। আমি কখনই সর্বজনীনভাবে বিধবার পুনর্বিবাহ সুপারিশ করিনি। স্যার গঙ্গারাম যেসব তথ্য সঙ্কলন করেছেন, যেগুলো সংক্ষেপে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো শুধু অনধিক পনের বছর বয়সের বিধবাদের সম্বন্ধেই লেখা হয়েছে। এই সব নিঃসহায় হতভাগিনীরা 'পাতিব্রত্য ধর্ম' সম্বন্ধে কিছুই জানে না। প্রেমের সঙ্গেও তাদের পরিচয় হয়নি। এইসব মেয়েদের কখনও বিয়েই হয়নি—এ বললেই ঠিক বলা হত। বিবাহ যদি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, একটি নতুন জীবনের সূচনা হয়—যা হওয়াই উচিত—তাহলে বিয়ের সময় মেয়েদের সব দিকেই পরিণত হওয়া উচিত ও জীবনের সাথী নির্বাচনে তার কিছু অধিকার থাকা উচিত আর তাদের কাজের

ফলাফলও জানা দরকার। শিশুদের মিলনকে দাম্পত্য সম্বন্ধের আখ্যা দেওয়া ও তথাকথিত স্বামীর মৃত্যুতে মেয়েটির ওপর বৈধব্যের ভার চাপিয়ে দেওয়া মনুষ্যত্ব ও পরমেশ্বরের কাছে পাপ বিশেষ।

প্রকৃত হিন্দু বিধবা সম্পদ বিশেষ বলে আমি মনে করি। মানবতার কাছে সে হিন্দুধর্মের একটি অবদান। রমাবাঈ রানাডে এরকম একটি অর্ঘ্য। কিন্তু বালবিধবাদের অস্তিত্ব হিন্দুধর্মের একটি কলঙ্ক—রমাবাঈএর অস্তিত্ব দিয়ে যার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

বালিকা বধূ ও বালবিধবা

মাদ্রাজের পছিয়াপ্পার কলেজে তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধিজী বলেন—

একজন শিক্ষিত তামিলী আমাকে বালবিধবা প্রসঙ্গে ছাত্রদের কাছে এক ভাষণ দিতে লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের তুলনায় এই প্রদেশের বালবিধবাদের দুর্দশা অনেক বেশী। এই উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করতে আমি পারিনি। এ বিষয়ে আমার চেয়ে তোমরাই বেশী জান। কিন্তু আমার চারপাশে যে তরুণেরা রয়েছো তোমাদের কাছে আমি এই চাই যে তোমাদের মধ্যে যেন নারীব সম্বন্ধে সদাচারের একটু কিছু থাকে। যদি তোমাদের তা থাকে তাহলে আমি তোমাদের কাছে একটি গুরুতর প্রস্তাব করছি। তোমাদের অধিকাংশই অবিবাহিত ও বেশ কিছু-সংখ্যক ব্রহ্মচারী বলে আমি আশা করি। আমাকে বেশ কিছুসংখ্যক বলতে হয়েছে কারণ আমি ছাত্রদের চিনি। ভগিনীসমার প্রতি কামদৃষ্টি দেয় যে ছাত্র সে ব্রহ্মচারী নয়। আমি চাই যে তোমরা ধর্মের নামে শপথ নাও বিধবা নয় এমন মেয়েকে তোমরা বিয়ে করবে না, বালবিধবার খোঁজ করবে আর তা না পেলে তোমরা কখনও বিয়ে করবে না। এই সঙ্কল্প গ্রহণ কর ও সকলের কাছে তা ঘোষণা কর—জীবিত থাকলে তোমাদের মা-বাবা বা বোনেদের কাছে তা ঘোষণা কর। আমি 'বিধবা বালিকা' কথাটি সংশোধনার্থেই ব্যবহার করছি, কেননা আমি বিশ্বাস করি যে কোন দশ বা পনের বছরের শিশু যে তথাকথিত বিয়েতে মতামত দেয়নি বা বিয়ের পরে তথাকথিত স্বামীর সঙ্গে বসবাসও করেনি তাকে হঠাৎ বিধবা বলে প্রচার করলেও সে বিধবা নয়। এটা শব্দটির অপপ্রয়োগ—ভাষার অপব্যবহার ও একটি ধর্মবিরোধী কাজ। হিন্দুধর্মে বিধবা কথাটি

সৌরভমণ্ডিত। স্বর্গীয়া শ্রীমতী রমাবাই রানাডে জানতেন বিধবা কাকে বলে—এরকম নিষ্ঠাবতী বিধবাকে আমি পূজো করি। কিন্তু স্বামী কেমন হবে সে সম্বন্ধে নয় বছরের মেয়ের কোন ধারণাই নেই। এই প্রদেশে এরকম বালবিধবা আছে একথা যদি সত্য না হয় তবে নিশ্চয়ই আমার বলবার মত কিছু থাকে না। কিন্তু যদি এরকম বালবিধবা থাকে ও সেই অভিশাপ থেকে যদি আমাদের মুক্ত করতে চাও তাহলে বালবিধবা বিয়ের সঙ্কল্প করাই তোমাদের পবিত্র কর্তব্য হবে। যথেষ্ট সংস্কারগ্রস্ত বলে আমি এই বিশ্বাস করি যে জাতির দ্বারা সংঘটিত এইসব পাপ জাতির ওপরই প্রতিক্রিয়া আনে—ফলে জাতি দুর্বল হয়। আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই দাসত্ব এইসব পুঞ্জীভূত পাপের ফলেই ঘটেছে। হাউস অফ কমনস্-এর দানস্বরূপ তোমরা হয়ত পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা সংবিধান পেতে পার কিন্তু সেই সংবিধান অনুযায়ী কাজ করবার মত যোগ্য পুরুষ ও নারী যদি না থাকে তবে তা মূল্যহীন হবে। যতদিন একটি বিধবাও তার মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে চাইলে বলপূর্বক নিবারিত হবেন ততদিন কি আমরা মানুষ নামের যোগ্য হব—নিজেদের ও অপরকে শাসন করবার বা আমাদের দেশের ত্রিশকোটি লোকের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের যোগ্য হব বলে তোমরা মনে কর? এ ধর্ম নয়—অধর্ম। হিন্দুধর্ম-ভাব আমার মর্মে মর্মে রয়েছে বলেই আমি একথা বলছি। আমার ওপর পাশ্চাত্য প্রভাবের কারণে আমি এরকম বলছি—এ ভুল করো না। অবিমিশ্র ভারতীয় ভাবধারায় আমার মন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্যের অনেক কিছুই আমি আহরণ করেছি কিন্তু এ নয়। হিন্দুধর্মে এরকম বৈধব্যের কোন সমর্থন নেই।

বালবিধবা প্রসঙ্গে যাকিছু বললাম তা অবশ্যই বালবধূদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ষোল বছর হয়নি এমন কোন মেয়েকে তোমরা বিয়ে করবে না—ও ততদিন পর্যন্ত তোমরা তোমাদের কামনা সংযত

করতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবে। পারলে এই বয়ঃসীমা আমি ন্যূনপক্ষে কুড়ি বছরেই রাখতাম। ভারতবর্ষের পক্ষে কুড়ি বছর বয়স যথেষ্ট নয়। ভারতের জলবায়ু কখনই নয়—আমরাই মেয়েদের অকালপক্কতার জন্য দায়ী, কারণ কুড়ি বছর বয়সের এমন মেয়েদের আমি জানি যারা পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কিনী, ও পারিপার্শ্বিক বিক্ষোভ যদি কিছু থাকেও তাতেও তারা বিচলিত হয় না। এই অকালপক্কতাকে যেন আমরা সাগ্রহে বরণ না করি। কয়েকটি ব্রাহ্মণ ছাত্র আমাকে বলেছে যে তারা এই নীতি অনুসরণ করতে পারবে না কারণ ষোল বছরের ব্রাহ্মণ মেয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণেরাই তাঁদের কন্যাদের ততদিন পর্যন্ত অবিবাহিত রাখেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ মেয়ের ১০, ১২ ও ১৩ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়। তখন আমি ব্রাহ্মণ যুবকটিকে বলি—'যদি তুমি নিজেকে সংযত করতে না পার তাহলে তুমি আর ব্রাহ্মণ থেকো না। শৈশবে বিধবা হয়েছে এরকম ষোল বছর বয়সের বড়সড় একজন মেয়েকে নির্বাচন কর। ঐ বয়সের কোন ব্রাহ্মণ বিধবা না পেলে তোমার পছন্দমত যে কোন মেয়েকে গ্রহণ কর।' বার বছর বয়সের কোন মেয়েকে ধর্ষণ না করে যদি কোন যুবক তার ভিন্ন জাতিতেও বিয়ে করে তবে হিন্দুর ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবেন—একথা আমি বলতে পারি। যদি তোমার হৃদয় নিষ্পাপ না হয় ও যদি তুমি তোমার আবেগ জয় করতে না পার তাহলে তোমাকে আর শিক্ষিত বলা চলবে না। তোমাদের প্রতিষ্ঠানকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান বলে তোমরা দাবী করেছো। তোমরা এই আদর্শ বিদ্যায়তনের সুনাম অনুযায়ী কাজ করবে এই আমি চাই। চরিত্রে যারা সর্বাগ্রে থাকবে কেবল এরকম ছাত্রই যেন এখান থেকে পাওয়া যায়। চরিত্রকে বাদ দিয়ে শিক্ষা কি—দেহের স্বাভাবিক নিষ্কলুষতা ভিন্ন চরিত্রই বা কি? ব্রাহ্মণত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি বর্ণাশ্রম ধর্মকে সমর্থন করেছি। কিন্তু অস্পৃশ্যতা, কুমারী বৈধব্য ও কুমারীর ওপর অত্যাচার সহ্য করে এমন ব্রাহ্মণ্যধর্ম আমার

কাছে পূতিগন্ধময়। এ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিকৃতি। সেখানে ব্রহ্মজ্ঞান বলে কিছু নেই। সেখানে শাস্ত্রের কোন সত্য ব্যাখ্যা নেই। এ অবিমিশ্র পশুভাব। ব্রাহ্মণ্যধর্ম কঠোরতর উপাদানে তৈরী। আমার এই কয়েকটি মন্তব্য তোমাদের মনের গভীরে প্রবেশ করুক—এই আমি চাই। কথা বলবার সময় আমি ছেলেদের লক্ষ্য করছি ও যখন আমি আমার সমস্ত অন্তব থেকে কথা বলি তখন একটিমাত্র হাসির শব্দও আমাকে বেদনা দেয়। তোমাদের বুদ্ধির কাছে নয়—তোমাদের হৃদয়ের কাছে আবেদন জানাতেই আমি এসেছি। তোমরাই দেশের ভরসা ও মূলতঃ তোমাদের কাছে যা প্রয়োজনীয় তাই তোমাদের বললাম।

একটি ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ

কোন একটি বাঙ্গালী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিখেছেন—

"মাদ্রাজে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র বিধবা মেয়েদের বিয়ে করবার নির্দেশ দিয়ে আপনি যে ভাষণ ও উপদেশ দিয়েছেন তা আমাদের ভয়বিহ্বল করেছে ও আমি আমার বিনম্র কিন্তু ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

"পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় নারীত্বকে যে ব্রহ্মচর্য সর্বোন্নত বা সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে আজীবন সেই ব্রহ্মচর্য পালনের যে আকাঙ্ক্ষা বিধবাদের আছে এই উপদেশে তা নষ্ট হবে ও পার্থিব সুখের আবিলতাময় পথে বিধবাদের ফেলে দিলে ব্রহ্মচর্য পালন করে এই জন্মেই মোক্ষলাভের সম্ভাবনাও বিনষ্ট হবে। অতএব বিধবাদের বিষয়ে এ রকম তীব্র সহানুভূতি তাদের খুব ক্ষতিই করবে ও যে সমস্ত কুমারীদের বিয়ে দেওয়া আজকাল একটি কঠিন ও জটিল সমস্যা হয়ে উঠেছে তাদের ওপরও অবিচার করা হবে। বিয়ে সম্বন্ধে আপনার মতবাদ আত্মার দেহান্তর, পুনর্জন্ম ও এমন কি মুক্তি সম্বন্ধে হিন্দু বিশ্বাস পাল্টে দেবে আর যে সমস্ত সমাজ আমরা অপছন্দ করি একে তাদের স্তরেই নামিয়ে আনবে। আমাদের সমাজ নীতিভ্রষ্ট হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু হিন্দু আদর্শের ওপর আমাদের সজাগ দৃষ্টি রেখে যতদূর সম্ভব সেইপথে এগিয়ে যেতে প্রয়াসী হব ও অপরাপর সমাজের দৃষ্টান্ত ও আদর্শে প্রভাবিত হব না। অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, বেহুলা, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর দৃষ্টান্ত হিন্দুসমাজকে পথ দেখাবে ও তাঁদের আদর্শে আমরা সমাজকে পরিচালিত করব। সুতরাং আমি বিনীতভাবে অনুনয় করছি যে এইসব জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে আপনার মতামত দিতে বিরত হোন ও সমাজকে যা কিছু মঙ্গলের তা করতে দিন।"

এই ক্ষুব্ধ প্রতিবাদে আমার মতের পরিবর্তন হয়নি—আমি অনুতপ্তও নই। যার স্বকীয় মত বলে কিছু আছে ও যে ব্রহ্মচর্য কি তা জানে ও তা পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এমন কোন বিধবাকে আমার উপদেশ তার লক্ষ্য থেকে বিচলিত করবে না। কিন্তু এই উপদেশ মানলে সেইসব অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েরা, যারা অনুষ্ঠানের সময় বিয়ের

অর্থ সম্বন্ধে কিছুই জানত না তাদের অনেক উপকার হবে। তাদের সম্বন্ধে বিধবা কথাটির ব্যবহার ঐ নামের—যার সঙ্গে অনেক পবিত্র ভাব বিজড়িত—তার নিদারুণ অপব্যবহার। পত্রলেখকের মনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই আমি দেশের যুবকদের এইসব তথাকথিত বিধবাদের বিয়ে করতে বা একেবারেই বিয়ে না করতে উপদেশ দিয়েছি। বালবৈধব্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেই এই অনুষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা হতে পারে।

ব্রহ্মচর্য পালন করলে বিধবারা মোক্ষলাভে সমর্থ হবেন একথার কোন সমর্থন অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। পরম শান্তিলাভের জন্য নিছক ব্রহ্মচর্য ছাড়া আরও কিছুব প্রয়োজন। বাইরে থেকে যে ব্রহ্মচর্য আরোপ করা হয় তার কোন গুণগত মূল্য নেই--প্রায়ই তা গোপন পাপাচাবে উৎসাহিত করে ও যে সমাজে ঐ পাপ আছে তার নীতিবোধ নির্মূল করে। পত্রলেখক যেন মনে রাখেন যে আমি আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থেকেই এটা লিখেছি। আমার এই উপদেশের ফলে যদি কুমারী বিধবাদের সম্বন্ধে মৌলিক বিচার করা হয় ও ঠিক সেই কারণে যদি অন্যান্য কুমারীরা পুরুষের কামনার কাছে অকালে বিক্রীত না হয়ে বয়স ও জ্ঞানের অভিজ্ঞতা-লাভের জন্য অপেক্ষা করাব সুযোগ পান তবে আমি বাস্তবিকই সুখী হব।

বিবাহ সম্বন্ধে আমার এমন কোন মতবাদ নেই যা দেহান্তর, জন্মান্তর বা মুক্তির বিশ্বাসের পরিপন্থী। পাঠকের জানা উচিত যাদের তিনি দম্ভভরে নীচু শ্রেণীভুক্ত বলেছেন সেইসব লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহে কোন বাধা নেই। বৃদ্ধ বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ যদি এই বিশ্বাসের পরিপন্থী না হয় তাহলে ভুল করে যেসব মেয়েদের বিধবা বলা হয় তাদের সত্যিকার বিয়ে কি করে এই চমৎকার বিশ্বাসের পরিপন্থী হয় তা আমি বুঝি না। পত্র-লেখকের অবগতির জন্য আমি উল্লেখ করতে চাই যে দেহান্তর বা

জন্মান্তর আমার কাছে কেবলমাত্র মতবাদই নয় বরং প্রতিদিন সূর্যোদয়ের মতই সত্য। মুক্তিও এরকমই একটি বাস্তব সত্য ও তা উপলব্ধি করার জন্য আমি আমার সব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করছি। এই মুক্তিলাভের তপস্যাই কুমারী বিধবাদের সম্বন্ধে যে অন্যায় করা হয় সে সম্বন্ধে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন করেছে। পত্রলেখক এক নিঃশ্বাসে সীতা প্রভৃতি যেসব অমর নামের উল্লেখ করেছেন পৌরুষহীন আমরা যেন তাঁদের সঙ্গে বর্তমানের অবহেলিত কুমারী বিধবাদের উল্লেখ না করি।

পরিশেষে যদিও হিন্দুধর্মে ন্যায়সম্মতভাবেই বৈধব্যের ওপর যথার্থ গৌরব আরোপ করা হয় তবুও বৈদিক যুগে বিধবার পুনর্বিবাহ যে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল—আমি যতদূর জানি এরকম বিশ্বাসের কোন যুক্তি নেই। কিন্তু আমার অভিযান যথার্থ বৈধব্যের বিরুদ্ধে নয়, এর নির্মম ব্যঙ্গের বিরুদ্ধেই এই অভিযান। আমি যেসব মেয়েদের কথা ভাবছি তাদের বিধবা বলে বর্ণনা না করাই উচিত ও যে হিন্দুর মনে নারীদের সম্বন্ধে এতটুকু শ্রদ্ধার ভাব আছে তাদের প্রত্যেকেরই এইসব মেয়েদের দুঃসহ ভার থেকে মুক্তি দেবার দায় রয়েছে। আমি বিনম্র কিন্তু দৃঢ়ভাবে সেই উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি করতে চাই যেন প্রতিটি হিন্দু যুবক ভুলবশতঃ যাদের বিধবা বলা হয় সেই সব কুমারী ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন।

বিবাহ প্রথা বিলোপ করুন

আমার বিশেষ পরিচিত এক পত্রলেখক একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন—নিছক তর্কের জন্যই মনে হয়, কেননা যে মতামত তিনি ব্যক্ত করেছেন তা তাঁর নিজস্ব নয় বলেই আমার জানা আছে। তিনি প্রশ্ন করেছেন—“আমাদের বর্তমান নীতিবোধ কি অস্বাভাবিক নয় ?” যদি তা প্রকৃতিসম্মত হতো তবে সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রে তা একই হতো। কিন্তু দেখা যায় যে প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশিষ্ট বিবাহ বিধি আছে—সেগুলো কার্যকরী করার বিষয়ে তারা নিজেদের পশুর অধম করে তোলে। যেসব রোগ পশুজগতে অজ্ঞাত মানুষের মধ্যে তা অতি সাধারণ ঘটনা; শিশুহত্যা, গর্ভপাত, বাল-বিবাহ যেগুলো পশুজগতে অসম্ভব সেগুলোই মানুষের সমাজে সর্বনাশ ঘটায় ও বিয়ের ধর্মীয় পবিত্রতা ব্যাহত করে—আর নৈতিক নিয়মাবলী বলে আমরা যা রক্ষা করি তা থেকে যে কত অমঙ্গল ঘটছে তার শেষ নেই। হিন্দু বিধবাদের এই যে দুর্দশা তার জন্য কি প্রচলিত বিবাহবিধিগুলোই দায়ী নয়? আমরা কেন আদিম যুগে ফিরে যাই না ও পশুজগতের নিয়মগুলো অনুসরণ করি না ?

যাঁরা পাশ্চাত্যের অবাধ প্রেমের সমর্থন করেন তাঁরা ওপরে সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া যুক্তির দোহাই দেন কিনা বা আরও জোড়ালো যুক্তির অবতারণা করেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে বিবাহবন্ধনকে অসভ্য প্রথা বলে মনে করার প্রবণতা স্পষ্টতঃই পাশ্চাত্যের। যদি এই যুক্তিও পশ্চিম থেকে ঋণ করা হয়ে থাকে তাহলে তা খণ্ডন করতে কোন অসুবিধে হবে না।

মানুষ ও পশুর মধ্যে তুলনা করা ভুল, এরকম তুলনাই সমস্ত যুক্তি ভুল বলে প্রমাণ করে, কারণ নৈতিক বৃত্তি ও নৈতিক সংস্কারে মানুষ পশুর চেয়ে উন্নত। একের ওপর প্রযোজ্য প্রাকৃতিক নিয়ম

অন্যের ওপর প্রযোজ্য প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে আলাদা। মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে, ভেদাভেদ করার ক্ষমতা আছে আর যতটুকুই হোক না কেন স্বাধীন ইচ্ছে আছে। পশুর এসব কিছুই নেই। স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা তার নেই ; পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের পার্থক্যও তার অজ্ঞাত। স্বাধীন সত্তা থাকায় মানুষ এইসব পার্থক্য জানে—যখন সে আপন স্বভাবের সৎবৃত্তিগুলো অনুসরণ করে তখন সে নিজেকে পশুর চেয়ে অনেক উন্নতরূপে পরিচয় দেয় আবার যখন সে স্বভাবের কুপ্রবৃত্তিগুলো অনুসরণ করে তখন নিজেকে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট বলে প্রতিপন্ন করে। পৃথিবীতে যেসব জাতি অত্যন্ত অসভ্য বলে বিবেচিত তারাও যৌনসম্পর্ক বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধ মেনে নেয়। অবশ্য যদি নিষেধমাত্রকেই বর্বরোচিত বলা হয় তবে সবরকম নিষেধ থেকে মুক্তিই মানুষের পক্ষে সামাজিক নিয়ম হওয়া উচিত। যদি সব মানুষই এই অনিয়মের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতো তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। মানুষ স্বভাবতঃই পশুর চেয়ে বেশী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হওয়ায় যে মুহূর্তে এই নিষেধগুলো তুলে নেওয়া হতো, সেই মুহূর্তেই অনিয়ন্ত্রিত কামাবেগ ভূমিকম্প উৎসারিত লাভার বন্যার মত সমস্ত পৃথিবীতে প্লাবন আনতো ও মানুষ জাতির বিনাশ ঘটাতো। মানুষ পশুর চেয়ে উন্নত এই কারণে যে সে আত্মসংযম ও আত্মত্যাগে সমর্থ যা পশু করতে অক্ষম।

আজকাল যেসব রোগ খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে তা বিবাহ-বিধিগুলো অমান্যেরই পরিণতি। আমি এমন একজনমাত্র পুরুষের কথা জানতে চাই, যিনি দাম্পত্যজীবনে সংযম যথাযথ পালন করেও লেখকের উল্লিখিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। শিশুহত্যা, বাল-বিবাহ ও অনুরূপ ঘটনা বিবাহনীতিগুলো না পালন করার ফল। কেননা বিধানে এ ব্যবস্থাই আছে যে স্বাস্থ্যবান, সংযমে সমর্থ ও বংশসৃষ্টি করতে উৎসুক নারী বা পুরুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তবেই সাথী

নির্বাচন করবেন। এই নীতি যাঁরা যথাযথভাবে পালন করেন ও বিবাহবন্ধনকে ধর্মানুষ্ঠান বলে মনে করেন তাঁদের কখনই অসুখী বা বেদনার্ত হবার কারণ ঘটে না। বিবাহ যেখানে ধর্মানুষ্ঠান সেখানে মিলন দৈহিক নয় বরং আত্মিক যা যেকোন একজনের মৃত্যুর পরেও অবিচ্ছেদ্যই থাকে। আত্মার প্রকৃত মিলন যেক্ষেত্রে হয়েছে সেক্ষেত্রে বিধবা বা বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ অচিন্তনীয়, অসঙ্গত ও অন্যায়। যে বিবাহে বিবাহের মূল বিধান অবহেলা করা হয় তা বিবাহ নামের যোগ্য নয়। আজকাল এরকম সত্যকার বিবাহ যে সংখ্যায় খুব কম তার জন্য বিবাহের বিধানগুলোকেই দোষ দেওয়া যায় না; বরঞ্চ যেভাবে তা অনুষ্ঠিত হয় তারই সংস্কার প্রয়োজন।

পত্রলেখক এই যুক্তি দিয়েছেন যে, বিবাহ নৈতিক বা ধর্মীয় বন্ধন নয়, প্রথামাত্র ও এই প্রথা ধর্ম ও নীতিবোধের পরিপন্থী। অতএব এর বিলুপ্তি হওয়া দরকার। আমি নিবেদন করি যে বিবাহ ধর্মকে রক্ষা করবার প্রাকার আর ঐ প্রাকার যদি ধ্বংস করা হয়, তাহলে ধর্মও ধূলিসাৎ হবে। সংযমই ধর্মের ভিত্তি ও বিবাহ সংযম ছাড়া আর কিছুই নয়। যে পুরুষ সংযম জানে না তার আত্মোপলব্ধির কোন আশা নেই। নাস্তিক বা বস্তুবাদীর কাছে সংযমের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা কঠিন হতে পারে বলে আমি স্বীকার করি, কিন্তু আত্মার অবিনশ্বরতা থেকে দেহের নশ্বরতা সম্বন্ধে যিনি অবহিত আছেন তিনি জানেন যে আত্মশাসন ও আত্মসংযম ছাড়া আত্মোপলব্ধি অসম্ভব। এই দেহ লালসার ক্রীড়াক্ষেত্র বা আত্মোপলব্ধির মন্দির হতে পারে। যদি শেষেরটি হয় তাহলে সেখানে অসংযমের কোন স্থান নেই। ভাবের মধ্য দিয়ে নিয়তই এ দেহকে সংযত রাখতে হবে।

বিবাহবন্ধন যেখানে শিথিল যেখানে কোন সংযমের বিধি পালন করা হয় না, সেখানে নারী বিরোধের কারণ হয়ে উঠবে। পশুর মত মানুষও যদি অসংযত হত তাহলে তারা সোজাসুজি ধ্বংসের পথে

চলতো। আমি দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করি যে যেসব অন্যায় বা অপরাধ সম্বন্ধে পত্রলেখক খেদ প্রকাশ করেছেন সেগুলো বিবাহ প্রথা বিলোপ করে নয়, বরঞ্চ বিবাহবিধিগুলো ঠিক ঠিক ভাবে পালন করে ও ওগুলোর সম্যক অনুশীলনেই তা নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব।

আমি মানি যে যেমন কোন কোন সম্প্রদায়ের ভেতর নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ের অনুমোদন আছে, তেমনি আবার কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে তা নিষিদ্ধ, আবার কোন কোন সম্প্রদায়ে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ আবার কোথাও বা এর অনুমোদন আছে। সব সম্প্রদায় একই নৈতিক নিয়ম গ্রহণ করুক এটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রম সংযমের অবলুপ্তির প্রয়োজনীয়তা নিধারণ করে না। আমরা যতই অভিজ্ঞতায় জ্ঞানী হব ততই আমাদের নীতিবোধে ঐক্য আসবে। আজও পৃথিবীর নৈতিক বিচারে একটি বিবাহই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে মনে করা হয় ও কোন ধর্মই বহুবিবাহকে আবশ্যিক বলে নির্দেশ দেয় না। দেশ-কাল ভেদে আচারের শিথিলতা সত্ত্বেও আদর্শ অবিকৃতই রয়েছে।

বিধবার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে আমার মতামতের পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই, কেননা আমি কুমারী বিধবাদের পুনর্বিবাহ শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয়ই মনে করি না বরং যেসব বাবা-মার ঘটনাক্রমে কোন বিধবা কন্যা আছে তাদের বিয়ে দেওয়া অবশ্য করণীয় বলে মনে করি।

অসংলগ্ন চিন্তা

একজন পত্রলেখক লিখছেন—

"'বিবাহ প্রথা বিলোপ করুন'—এই প্রবন্ধের এক জায়গায় আপনি বলেছেন—'বিবাহ যেখানে ধর্মানুষ্ঠান সেখানে মিলন দৈহিক নয় বরং আত্মিক—যা কোন একজনের মৃত্যুর পরেও অবিচ্ছেদ্যই থাকে। আত্মার প্রকৃত মিলন যেখানে ঘটেছে সেখানে বিধবা বা বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ অচিন্তনীয়, অসঙ্গত ও অন্যায়।'

"এই প্রবন্ধের আর এক জায়গায় আপনি বলেছেন 'বিধবার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে আমার মতামতের পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই, কারণ আমি কুমারী বিধবাদের পুনর্বিবাহ শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয়ই মনে করি না বরং যদি কোন বাবা-মার ঘটনাক্রমে কোন বিধবা কন্যা থাকে তাদের বিয়ে দেওয়া অবশ্য করণীয় বলে মনে করি।'

"এই দুই বিপরীত মতের সামঞ্জস্য আপনি কি ভাবে করবেন?"

এই দুই বিপরীত মতের সামঞ্জস্য করবার কোন অসুবিধে আমি দেখি না। সন্তানের মঙ্গলের কথা চিন্তা না করে তার অজান্তে ও বিনা অনুমতিতে যদি কোন হৃদয়হীন মা-বাবা কন্যা সম্প্রদান করে তবে সেক্ষেত্রে কোন বিবাহের অনুষ্ঠান হয় না। নিশ্চয়ই তা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় ও সেই পরিস্থিতিতে তাদের পুনর্বিবাহ কর্তব্য হয়ে ওঠে। বস্তুত পুনর্বিবাহ শব্দটি এক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ—সঠিক বিচারে কুমারীটির বিয়েই হয়নি, আর এই জন্যই তার তথাকথিত স্বামীর মৃত্যুতে তার বাবা-মার স্বাভাবিক কর্তব্য হবে তার জন্য যোগ্য সঙ্গী খুঁজে দেওয়া।

একজন তরুণী বিধবার সহিত সাক্ষাৎ

আমরা যখন বেজওয়াদা থেকে ইলোরে যাচ্ছিলাম তখন আমাকে জানানো হয় যে সন্ত বিধবা হয়েছে এমন একটি মেয়ে তার ১৪০০ টাকা মূল্যের গহনা আমাকে দিতে চায়। সে আরও চায় যে আমি যেন পেদাপত্নু, যেখানে আমাদের যেতেই হবে, সেখান থেকে দুমাইলেরও কম দূরে অবস্থিত বালিকাটির গ্রামে যাই। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা পর্দাপ্রথা মানেন তাই কোন অবস্থাতেই একটি সন্তবিধবার পক্ষে বাড়ীর বাইরে আসা, বিশেষ করে কোন জনসভায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। অলঙ্কারের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিল না। বস্তুতঃ যখন আমার সংবাদদাতারা আমাকে বলেন যে সম্ভবতঃ ঐ মেয়েটি তার মূল্যবান সব অলঙ্কারই আমাকে দিতে ইচ্ছুক তখন আমি তা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সে নিতান্তই তরুণী—খুব শিগগিরই সে বিধবা হয়েছে (আমাকে বলা হয় যে সে কুমারী বিধবা)—এ তথ্যই আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। গিয়েছিলাম বলে সত্যি আমি আনন্দিত। মেয়েটির নাম সত্যবতী দেবী—কুড়ি বছরের কম তার বয়স। তার স্বামী সুশিক্ষিত জাতীয়তাবাদী ছিলেন। সে সুন্দর তেলেগু ভাষা জানে। তাকে সাহসী ও দৃঢ়চেতা বলে আমার মনে হল। তার বাবা-মা দুজনেই জীবিত। আমি যতদূর জানি সে তার সব অলঙ্কারই আমার হাতে দিয়েছিল—তার মূল্য ১৪০০ টাকা হবে বলে আমার মনে হয়েছিল। সে আমার হাতে একটি চিরকুট দেয় তাতে তাকে আশ্রমে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল। সত্যবতী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার বাবা-মা উপস্থিত ছিলেন—খাদি প্রচারের জন্য তার এই গহনা সমর্পণে তাদের সম্মতি ছিল। আমি তার মা-বাবার কাছে প্রস্তাব করি যে তাঁরা যেন

তাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না রাখেন—পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের মতই যেন তার প্রতি ব্যবহার করা হয়। মেয়েটিকে বললাম যে তার বৈধব্য ঘটেছে শুধু এই কারণে তার অলঙ্কার ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ বিষয়ে সে অবিচল ছিল। এ-গুলোর কোন প্রয়োজন তার নেই। আমি তাকে জানালাম যে বাবা-মা অনুমতি দিলে আমি তাকে সানন্দে আশ্রমে নিয়ে যাবো। তার বাবা-মা বিষয়টি বিবেচনা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেই যাত্রাশেষে আমার সঙ্গে মেয়েটিকে যেতে দেওয়া হবে এরকম আশ্বাসও দিয়েছিলেন। তার বাবা যদিও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে সাবধানী ও নিরুৎসাহী ছিলেন তবুও তাঁকে তাঁর কন্যা সম্বন্ধে উদারমনা বলেই আমার মনে হয়েছিল। বিধবাটিকে এর বেশী কোন সান্ত্বনা দিতে না পারায় আমি দুঃখিত। ব্যথিত হৃদয়ে আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম।

এই কারণে পেদাপল্লুতে আমার ভাষণ সত্যবতী দেবীর প্রসঙ্গেই নিবদ্ধ ছিল। শ্রোতাদেব আমি বলেছিলাম যে পর্দাপ্রথা তুলে দেওয়া, আর ইচ্ছে থাকলে এই বিধবা মেয়েটির আবার বিয়ে দিতে তার বাবা-মাকে সাহায্য করা তাঁদেরও উচিত। যদি আঠার বছরের কোন মৃতদার যুবক পুনর্বিবাহ করতে পারে তবে সমবয়সী কোন বিধবার সেই অধিকার থাকবে না কেন? যেমন স্বেচ্ছাকৃত আদর্শ বৈধব্য যে-কোন জাতির পরম সম্পদ তেমনই অন্যের ওপর জোব করে চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্য কলঙ্ক বিশেষ। শ্রোতারা শ্রদ্ধা ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে বক্তৃতা শুনলেন। সভায় বিধবাটির বাবাও উপস্থিত ছিলেন। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে গহনাগুলো ত্যাগ করার ইচ্ছে মেয়েটির নিজের ও পুনর্বিবাহের কোন বাসনাই তার ছিল না। আমাকে বলা হয় যে লেখাপড়ায় নিজেকে ব্রতী করার প্রবল ইচ্ছে তার ছিল যাতে পরিশেষে সে জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে। এই যদি তার

সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হয় তাহলে সত্যবতী সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী। কিন্তু যখনই ইচ্ছে হবে তখনই এরকম বিধবারা যেন আবার বিয়ে করতে পারে হিন্দু সমাজ যেন সেই পথ খোলা রাখে। সত্যব্রতীর কাহিনী শত শত হিন্দু পরিবারের দৈনন্দিন ঘটনা। মনে পুনর্বিবাহের তীব্র ইচ্ছা থাকা সত্বেও নিষ্ঠুর প্রথার ভয়ে বিধবারা পুনর্বিবাহ করতে না পারলে ও হিন্দুসমাজ তার বিধবাদের অমার্জনীয় ভাবে পরাধীন রাখলে এই সব বিধবাদের অভিশাপ হিন্দু সমাজের উপরই আসবে।

নারীদের মুক্তি দাও

মাদ্রাজের সুপরিচিত সমাজ সেবিকা ডাঃ এস মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী অন্ধ্রাতে দেওয়া আমার বক্তৃতাগুলোর ওপর ভিত্তি করে একটি বড় চিঠি লিখেছেন। আমি তা থেকে উল্লেখযোগ্য উধৃতিগুলো দিচ্ছি—

"বেজওয়দা থেকে গুন্টুর যাওয়ার সময় আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবর্তন ও সমাজ সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার মন্তব্যগুলো আমাকে সত্যি গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে।

"আমি বিনীতভাবে নিবেদন করতে চাই যে মহিলা চিকিৎসক হিসেবে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আপনি কি অনুগ্রহ করে একথা বলবার অনুমতি দেবেন যে যদি শিক্ষা প্রসারের ফলে সমাজ সংস্কার, উন্নত পরিচ্ছন্নতা আর উন্নততর জনস্বাস্থ্য আসে তাহলে শুধুমাত্র আমাদের নারীদের শিক্ষার মাধ্যমেই সে ফল লাভ করা সম্ভব ?

"আপনি কি মনে করেন না যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী শরীর ও মনের পূর্ণ বিকাশের জন্য, আত্মপ্রকাশনের জন্য শিক্ষালাভের উপযুক্ত সুযোগ খুব কম মহিলারাই পেয়ে থাকেন ?

"আপনি কি মনে করেন না যে সমাজ প্রথার চাপ তাদের ব্যক্তিত্ব নির্মমভাবে দাবিয়ে রাখে ?

"বাল বিবাহ কি দৈহিক, মানসিক এমন কি আধ্যাত্মিক সব উন্নতির মূলে আঘাত করে না ?

"বালিকা বধূ ও বালিকা মার বেদনা—আমাদের বিধবা ও পরিত্যক্তা স্ত্রীদের সর্বাত্মক দুঃখ দূর করার জন্য কি আশু প্রতিবিধান দরকার নয় ?

"ধর্মের দোহাই দিয়ে নিষ্পাপ তরুণীদের সারাজীবনের জন্য অপরাধ ও পাপের পথে ঠেলে দেয় যে প্রথা তাকে মেনে নেওয়া বা প্রশ্রয় দেবার কোন যুক্তি হিন্দু সমাজের আছে কি ?

"আপনি কি মনে করেন না যে সমাজের এই অত্যাচারের ফলে ভারতীয় নারীরা—কয়েকজন ছাড়া—শক্তি ও সাহসের আবেগ, স্বাধীন চিন্তা

ক্ষমতা ও কর্মপ্রেরণা সবই হারিয়েছেন? এই সব গুণই প্রাচীন ভারতে মৈত্রেয়ী, গার্গী, সাবিত্রী প্রমুখ মহিলাদের প্রেরণা দিয়েছে আর আজও যে ভাবধারা আমাদের থিয়োজফি, ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের উদার মতাবলম্বী ভগিনীদের অনেককেই অনুপ্রাণিত করে তা হলো অর্থহীন রীতি সংস্কার ও অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত হিন্দুধর্ম।

"আমাদের জাতীয় দল যা বলতে কংগ্রেসকে বোঝায় তার সভ্যেরা কি এই আকাঙ্খায় ও প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে এই সব সামাজিক কুপ্রথা যা আমাদের জাতীয় দুর্বলতার কারণ ও যা আমাদের বর্তমান অধঃপতন এনেছে সেইসব কুপ্রথা দূর করার আশু ব্যবস্থা খুঁজে বার করবেন না? অন্ততঃ আমাদের জনসাধারণকে সেই শিক্ষা কি দেবেন না যাতে নারীরা যে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ তা থেকে তাদের মুক্ত করে—যার ফলে তারা পূর্ণ দৈহিক, মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশলাভ করতে পারে, সাহস ও জ্ঞানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে এবং সর্বোপরি স্ত্রী ও জননী হিসেবে ন্যায়সম্মত ও সত্যের পথে ভারতের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের চরিত্র ও দৈনন্দিন অভ্যাস সংগঠনে, নির্দেশনায় ও শিক্ষণের পূত কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে?

"কংগ্রেসের সভ্যেরা যদি এই বিশ্বাস করেন যে স্বাধীনতা প্রত্যেকটি জাতি ও ব্যক্তির জন্মগত অধিকার আর যে কোন মূল্যেই হোক্ তা লাভ করতে যদি তারা কৃতসঙ্কল্প হন তাহলে যে সব কুপ্রথা ও সংস্কার তাঁদের নারীদের সর্বাঙ্গীন স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে তা থেকে তাঁদের সর্বপ্রথম মুক্ত করা কি কর্তব্য নয় বিশেষতঃ যখন সেই প্রতিবিধান ক্ষমতা তাদের নিজেদের হাতেই রয়েছে?

"আমাদের কবি ও মুনি ঋষিরা সেই একই সুরে কথা বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যে দেশ ও যে জাতি নারীকে সম্মান করে না তা কখনও বড় হয় নি—ভবিষ্যতেও হবে না। তোমাদের জাতির যে আজ এত অধঃপতন তার প্রধান কারণ এই যে শক্তির এই সব জীবন্ত প্রতিমূর্তির প্রতি তোমাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। নারী—যাঁরা ঈশ্বরীমাতার জীবন্ত প্রকাশ তাঁদের উন্নতি যদি তোমরা না কর তাহলে অন্য কোন উপায়ে তোমাদের উন্নতি হবে, এ চিন্তাও করো না।

"মনীষী তামিলী কবি পরলোকগত সুব্রমণ্য ভারতী সেই একই ভাবের প্রতিধ্বনি করেছেন।

"অতএব আপনার যাত্রাকালে আপনি অনুগ্রহ করে স্বাধীনতা লাভের জন্য পুরুষদের সঠিক ও নিশ্চিত পথ অনুসরণ করবার উপদেশ দেবেন কি?"

কংগ্রেস কর্মীরা এ দায়িত্ব বহন করবেন এরকম আশা করার সম্পূর্ণ অধিকার ডাঃ মুথুলক্ষ্মীর আছে। ব্যক্তিগত ভাবে ও যৌথভাবে অনেক কংগ্রেস কর্মী এই উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ করছেন। কিন্তু এই অন্যায়ের কারণ, বাহ্য দৃষ্টিতে যা মনে হয়, তার চেয়ে অনেক গভীরে নিহিত। শুধুমাত্র নারীজাতির শিক্ষার দোষেই এ হয়েছে তা নয়। বস্তুতঃ আমাদের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই জীর্ণ। আবার এ প্রথা বা অন্য কোন প্রথার নিন্দে করলেই চলবে না। যে কর্মবিমুখতা সর্বজনস্বীকৃত অন্যায় জেনেও কিছু করতে চায় না তাকে দূর করতে হবে ও পরিশেষে এই নিন্দা কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সহরবাসীদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনগণের মাত্র ১৫ শতাংশের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। গ্রামবাসী জনসাধারণের ক্ষেত্রে বালবিবাহও নেই বা বিধবা বিবাহের বাধা বলেও কিছু নেই। এটা অবশ্য ঠিক যে তাদের অন্য অনেক ত্রুটি আছে যা তাদের উন্নতি ব্যাহত করে। জড়ত্ব তুজনের মধ্যেই আছে, অতএব, যা প্রয়োজন তা হলো শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন ও জনগণের উপযোগী ব্যবস্থার উদ্ভাবন। যে শিক্ষা-ব্যবস্থা শিশুদের সঙ্গে সমানভাবে বয়স্কদের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয় না তা গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরন্তু দেশীয় ভাষাগুলোকে তাদের স্বাভাবিক প্রাধান্য না দিলে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই সমস্যার এতটুকু সমাধান হবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই মাত্র একাজ করা যেতে পারে। অতএব বিস্তৃত সংস্কার সাধনের আগে শিক্ষিত শ্রেণীর মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন দরকার। আমি ডাঃ মুথুলক্ষ্মীর কাছে প্রস্তাব করতে

চাই যে ভারতে আমাদের যে কয়টি শিক্ষিতা নারী আছেন তাঁদের নিজেদের পাশ্চাত্ত্য শিখর থেকে ভারতের সমতল ভূমিতে নেমে আসতে হবে। নারীদের অবহেলা এমন কি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য পুরুষকে নিঃসন্দেহেই অপরাধী করতে হবে আর তার জন্য তাদের যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু যে সব মহিলা কুসংস্কার ত্যাগ করেছেন ও অন্যায় সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন তাদের সংস্কারের গঠনমূলক কাজের ভার নিতে হবে। নারী জাতির মুক্তি ভারতের বন্ধনমুক্তি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতিমোচন ও এই জাতীয় সব সমস্যাই গ্রামে অনুপ্রবেশ করে গ্রামীণ জীবনের উন্নয়ন বা পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে মিলে যাবে।

আমাদের পতিতা বোনেরা

লজ্জাকর উপায়ে জীবিকার্জন করে এরকম নারীদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় অন্ধ্রপ্রদেশের কোকোনদে। মাত্র ছয় জনের সঙ্গে সেখানে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা হয়। দ্বিতীয় উপলক্ষ ঘটে বরিশালে। আগে থেকে স্থির করে এরকম একশোর বেশী রমণী আমার সঙ্গে দেখা করেন। আগেই চিঠি দিয়ে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে তাঁরা আমাকে জানিয়েছিলেন যে তাঁরা কংগ্রেসের সভ্যা হয়েছেন ও তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে চাঁদা দিয়েছেন কিন্তু বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিতে কোন পদ অধিকার না করার বিষয়ে আমার নির্দেশ তাঁরা বুঝতে পারেননি। তাঁদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করে তাঁরা চিঠির উপসংহার করেছিলেন। এই চিঠি পেয়ে আমি আনন্দিত বা বিরক্ত হব কিনা সে সম্বন্ধে অনেক দ্বিধার সঙ্গে পত্রবাহক ভদ্রলোকটি আমার হাতে চিঠিটি দিয়েছিলেন। যদি কোনরকমে পারি তবে এই বোনেদের সেবা করা আমার কর্তব্য—এই নিশ্চয়তা দিয়ে আমি তাঁর দ্বিধার নিরসন করলাম।

এই সব বোনের সঙ্গে আমি যে দুঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেছিলাম তা আমার কাছে একটি মূল্যবান স্মৃতি-কথা। তাঁরা আমাকে জানান যে প্রায় ২০,০০০ জন স্ত্রী পুরুষ ও শিশু জনসংখ্যার মধ্যে তাঁদের সংখ্যা ৩৫০ জনেরও বেশী। তাঁরা বরিশালের পুরুষ সমাজের লজ্জার নিদর্শন তাই যত তাড়াতাড়ি বরিশাল এ থেকে মুক্ত হবে ততই তার সুনামের পক্ষে মঙ্গলকর। বরিশাল সম্বন্ধে যা সত্য, আমার ভয় হয়, তা প্রত্যেক সহর সম্বন্ধেই সমান ভাবেই প্রযোজ্য, অতএব কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি বরিশালের উল্লেখ করলাম। এই সব বোনেদের কল্যাণের কথা চিন্তা করার প্রশংসা বরিশালের কয়েকজন যুবকের প্রাপ্য। আমি আশা করি

যে এই দুর্নীতির সমূল উচ্ছেদ করার কৃতিত্বও বরিশাল শিগগিরই দাবী করতে সক্ষম হবে।

পুরুষ যতগুলো অন্যায় কাজের জন্য দায়ী তার মধ্যে নারী—যিনি আমার মতে মনুষ্য সমাজের উত্তমাংশ—তাঁকে দুর্বলা বলে নিন্দা করার মত এত অপমানকর, পাশবিক ও বিস্ময়কর আর কোনটিই নয়। দুজনের মধ্যে নারীই মহত্তর কারণ আজও সে ত্যাগ, নীরব দুঃখবরণ, বিনয়, বিশ্বাস ও জ্ঞানের প্রতিমূর্তি স্বরূপা। পুরুষের উন্নত জ্ঞানের আত্মম্ভরিতার চেয়ে নারীর সহজাত প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। রামের আগে সীতার ও কৃষ্ণের আগে রাধার উল্লেখের যুক্তি আছে। সভ্য ইউরোপে এ অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বর্তমান বা কোন কোন রাষ্ট্রে এ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনাধীন বলে আমাদেরও উন্নয়নের জন্য পাপের এই জুয়াখেলার একটি স্থান আছে এরকম ভেবে আমরা যেন আত্মপ্রতারণা না করি। ভারতীয় পুরা কাহিনীর দোহাই দিয়ে আমরা যেন এই পাপ-অভ্যাসকে চিরস্থায়ী না করি। পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য বিচার করতে যে মুহূর্তে আমরা বিরত হই আর যে অতীত আমরা ভালোভাবে জানি না তাকেই অন্ধের মত অনুকরণ করি—সেই মুহূর্তেই আমাদের বিকাশও বন্ধ হয়ে যায়। বিগতযুগের যা কিছু সর্বোত্তম ও মহত্তম সে সব গৌরবেরই আমরা উত্তরাধিকারী। কিন্তু অতীতের ভুলভ্রান্তিগুলোর সংখ্যা বাড়িয়ে আমরা যেন আমাদের সেই উত্তরাধিকারের অমর্যাদা না করি। আত্মসম্মানলব্ধ ভারতে প্রত্যেক পুরুষের কাছে প্রতিটি নারীর সম্ভ্রম নিজের বোনের মত নয় কি? স্বরাজ অর্থ ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীকে আমাদের নিজের ভাই ও বোনের মত মনে করার ক্ষমতা।

আর এই কারণেই এই শতাধিক বোনের কাছে পুরুষ বলে লজ্জায় আমার মাথা নত হয়েছিল। কেউ কেউ বয়স্কা, অধিকাংশই কুড়ি ও ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে ও দুই বা তিনটি বারো বছর

বয়সের নীচে ছিল। তাঁরা আমাকে জানালেন যে তাঁদের সকলের মিলে ছয়টি মেয়ে ও চারটি ছেলে সন্তান আছে যাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির তাঁদের নিজেদের শ্রেণীর একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। অন্য যদি কিছু সম্ভব না হয় তাহলে এই মেয়েদের তাঁদের মত একই জীবন যাপনের জন্য তৈরী হতে হবে। এঁদের ভবিতব্যের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়—তাঁদের এই বিশ্বাস যেন জীবন্তদেহে ছুরিকাঘাতের মত। অথচ এঁরা বুদ্ধিমতী ও নম্র। তাঁদের কথাবার্তা মার্জিত, তাঁদের উত্তর পরিষ্কার ও সরল। ঐ সময়ের জন্য তাঁদের সঙ্কল্প যে কোন সত্যাগ্রহীর সঙ্কল্পের মত দৃঢ় ছিল। তাঁদের মধ্যে এগারজন সহায়তার আশ্বাস পেলে সেদিন থেকেই সূতাকাটা ও তাঁত বোনাতে আত্মনিয়োগ করবে—এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অন্যেরা আমাকে প্রবঞ্চনা করতে চাননি বলে জানান যে এ বিষয়ে চিন্তা করতে তাঁদের কিছু সময় দিতে হবে।

বরিশালের নাগরিকদের সামনে কর্তব্য উপস্থিত। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের সব প্রকৃত সেবক—তিনি নারী বা পুরুষ যাই হোন, তাঁদের সামনেও এই কর্তব্য উপস্থিত। ২০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ৩৫০ জন অসুখী বোন যদি থাকেন তবে সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁদের সংখ্যা ৫,২৫০,০০০ জন হতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বাসে আমি নিজেকে স্তোক দিচ্ছি যে ভারতীয় জনসংখ্যার পাঁচভাগের চারভাগ যাঁরা গ্রামে বাস করেন ও সম্পূর্ণভাবে কৃষিজীবী তাঁদের এই পাপ স্পর্শ করেনি। অতএব আপন সম্ভ্রম বিক্রি করে যে সব নারী জীবিকা অর্জন করে তাদের ন্যূনতম সংখ্যা হল সমস্ত ভারতবর্ষে ১,০৫০,০০০ জন। এইসব বোনেদের তাদের অধঃপতন থেকে ফেরাবার আগে দুটি সর্ত স্বীকার করতে হবে। আমাদের পুরুষদের ইন্দ্রিয় সংযম করার শিক্ষা নিতে হবে আর এই রমণীদের কোন বৃত্তি খুঁজে দিতে হবে যাতে তারা সম্মানের সঙ্গে জীবিকা অর্জন করতে পারে। অসহযোগ আন্দোলন অর্থহীন, যদি না এ

আমাদের নিষ্কলুষ করে ও অসৎ প্রবৃত্তিগুলোকে সংযত করে। সুতো কাটা ও বোনা ছাড়া আর কোন বৃত্তি নেই, যা কর্মবাহুল্য না ঘটিয়েও সকলে গ্রহণ করতে পারে। এই বোনেদের অধিকাংশেরই বিয়ে সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। তাঁরাও তাঁদের অক্ষমতা সম্বন্ধে একমত হয়েছিলেন। অতএব তাঁদের যথার্থ ভারতীয় সন্ন্যাসিনী হতে হবে। জীবনে একমাত্র সেবাচিন্তাই থাকবে আর প্রাণ ভরে তাঁরা সুতো কাটতে ও তাঁত বুনতে পারবেন। সাড়ে দশ লক্ষ রমণী নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন আট ঘণ্টা তাঁত বুনলে দরিদ্র ভারতবর্ষে সমপরিমাণ মুদ্রা আয় হবে। এই সব বোনেরা আমাকে বললেন যে তাঁরা প্রতিদিন দুটাকার মত উপার্জন করেন। কিন্তু এও তাঁরা স্বীকার করেন যে পুরুষের কামনা চরিতার্থ করতে তাঁদের অনেক জিনিষের প্রয়োজন হয় কিন্তু স্বাভাবিক জীবন যাপন করার পর যখন তাঁরা সুতোকাটা ও বোনায় নিযুক্ত হবেন তখন ঐ সব জিনিষগুলো তাঁরা ত্যাগ করতে পারবেন। আমার সাক্ষাৎ শেষ হবার আগেই খোলাখুলিভাবে না বললেও তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে কেন তাঁদের পাপবৃত্তি ত্যাগ না করা পর্যন্ত কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তা তাঁরা হতে পারবেন না। স্বরাজের বেদীমূলে তাঁরা কেউই পৌরোহিত্য করতে পারবেন না যদি তাঁদের হাত নির্মল না হয় আর হৃদয় নিষ্পাপ না হয়।

আমাদের অভাগিনী বোনেরা

দাক্ষিণাত্যে যত মানপত্র আমি পেয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে করুণ ছিল দেবদাসীদের পক্ষ থেকে দেওয়া মানপত্রটি—দেবদাসী অর্থে বারবণিতার মার্জিত প্রতিশব্দ। যে গোষ্ঠি থেকে এই দুর্ভাগা বোনদের নির্বাচন করা হয় তারাই মানপত্রটি রচনা করেছিল ও আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। সেই প্রতিনিধিদলের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম যে ভেতর থেকে সংস্কারের প্রয়াস চললেও উন্নতির গতি তখনও খুবই মন্থর ছিল। যে ভদ্রলোক প্রতিনিধিদের নেতা ছিলেন তিনি আমাকে জানান যে সাধারণ লোকেরা এই সংস্কারের বিরোধী। এ বিষয়ে কোকোনদে আমি প্রথম রূঢ় আঘাত পাই। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে বক্তৃতার সময়ে আমি অন্য কোন বিষয়ান্তরে যাইনি। বরিশালে দ্বিতীয় বার আঘাত পাই—সেখানে আমি এরকম অভাগিনী বোনেদের অনেকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তারা দেবদাসী বা যে কোন নামেই পরিচিত হোক না কেন সমস্যা একই। এ তীব্র লজ্জা, পরিতাপ ও গভীর অসম্মানেব বিষয় যে অনেক নারীকে পুরুষের কামনা চবিতার্থে নিজেব সতীত্বকে বিক্রি করতে হয়। আইনের রচয়িতা পুরুষকে তথাকথিত দুর্বলাদের ওপর দেওয়া এই অপমানের জন্য ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হবে। পুরুষের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে নারী যখন সম্যক মহিমা অর্জন করে পুরুষেরই রচিত আইন ও তার নির্ধারিত বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তখন তার এই বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে অহিংস হলেও কম কার্যকরী হবে না। অতএব, যে হাজার হাজার বোন তার এই বিধি ও নীতি-বহির্ভূত লালসাতৃপ্তির জন্য ঘৃণিত জীবন যাপনে বাধ্য হয় তাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়টি ভারতীয় পুরুষ যেন চিন্তা করে।

লজ্জার বিষয় এই যে এই পাপের আড্ডাগুলোতে যে সব পুরুষ যান তাঁদের অধিকাংশই বিবাহিত আর সেই কারণে তাঁরা দ্বিবিধ পাপ কাজ করেন। যে স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে তাঁরা প্রতিশ্রুত তার প্রতি তাঁরা পাপাচার করেন, আবার নিজের বোনের মত যে বোনের ধর্ম সমান উদ্যমে রক্ষা করতে তাঁরা বাধ্য তার বিরুদ্ধেও তাঁরা পাপ করেন। যদি আমরা ভারতীয় পুরুষেরা নিজেদের সম্ভ্রমবোধ সম্বন্ধে সচেতন হই তাহলে এই অন্যায় একদিনের জন্যও চলতে পারে না।

আমাদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে মাননীয় তাঁদের অনেকেই যদি পাপে লিপ্ত না হতাম তাহলে এরকম লালসাতৃপ্তি, ক্ষুধার্ত কোন লোকের দ্বারা একটি কলাচুরি বা টাকার প্রয়োজন আছে এমন যুবক দ্বারা পকেট মারার চেয়ে গুরুতর অপরাধ বলে মনে করা হত। সম্পত্তি অপহরণ বা নারীর সম্মান হরণ—কোন্‌টি সমাজের পক্ষে বেশী মন্দ ও বেদনাদায়ক? যখন কোন ক্রোড়পতির ঘোড় দৌড়ের ময়দানে পেশাদার ব্যক্তির দ্বারা পকেট মারা যায় সেক্ষেত্রে নয়—কিন্তু বারবণিতার ক্ষেত্রে আপন সম্ভ্রম বিক্রি করায় সে একজন সচেতন সহকারিণী—এরকম যেন আমাকে না বলা হয়। যে অর্বাচীন বালক অপরের পকেট মারে বা যে দুর্বৃত্ত তার শিকারকে মাদক দ্রব্যের প্রভাবে তার সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত করে নেয় তাদের মধ্যে কে বেশী মন্দ? চতুর ও নীতিবিরোধী প্রক্রিয়ায় পুরুষ কি নারীর মহত্তম আবেগটুকু অপহরণ করে পরে তারই ওপর সংঘটিত পাপকার্যে তাকে সঙ্গী করে না? কিংবা পঞ্চমাদের মত কোন কোন নারী কি লজ্জাকর জীবনের জন্যই জন্মগ্রহণ করে? প্রতিটি বিবাহিত বা অবিবাহিত যুবককে আমি যা লিখেছি তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে বলি। এই সামাজিক ব্যাধি, যা মানসিক কুষ্ঠ বিশেষ, সে সম্বন্ধে আমার জানা সব কিছুই আমি লিখতে পারি না। অবশিষ্টটুকু তিনি অনুমান করে নিন আর যদি তিনি নিজেই দোষী

হয়ে থাকেন তবে যেন এই পাপের জন্য লজ্জায় শঙ্কায় শিউরে ওঠেন। যেখানেই থাকুন না কেন প্রত্যেক সচ্চরিত্র পুরুষ যেন তাঁর পত্নীকে নির্মল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। আমি জানি এই দ্বিতীয় অংশটুকু লেখা যত সহজ কাজে রূপ দেওয়া তত সহজ নয়। এ বিষয়ে খুবই সাবধানতা প্রয়োজন। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টি বিচার করতে হবে। এই জটিলতার জন্যই সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোযোগ এর প্রতি দেওয়া প্রয়োজন। অভাগিনী নারীদের মধ্যে কাজ করার ভার অভিজ্ঞদের হাতেই দেওয়া উচিত। আমি যে কাজের প্রস্তাব করেছি তা এই পাপের আড্ডাগুলোতে যারা যান তাদের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

ভারতীয় নারীদের প্রতি আবেদন

বিদেশী বস্ত্র বর্জনের জন্য তাঁর অভিযান পরিচালনার সময় গান্ধিজী ভারতীয় নারীদের প্রতি এরকম আবেদন করেছিলেন—

প্রিয় বোনেরা,

বম্বেতে লোকমান্য তিলকের স্মরণে ৩১শে জুলাই পূতাগ্নি জ্বালিয়ে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের যে সূচনা করা হয়েছিল আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তারই পরিসমাপ্তির দিন ধার্য করে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এতদিন তোমরা যে সব মূল্যবান শাড়ী ও নানারকম বেশভূষাকে সুন্দর ও সৌখীন বলে মনে করেছো তারই এক বিরাট স্তূপে আগুন দেবার গৌরব আমাকেই দেওয়া হয়েছিল। যে সব বোনেরা এই মুল্যবান বেশভূষা দিয়েছেন তাঁদের পক্ষে এ ন্যায়সম্মত ও সুবিবেচনার কাজ হয়েছে বলেই আমি মনে করি। প্লেগ-সংক্রামিত বেশ-ভূষা বিনষ্ট করা যেমন সত্যিকার ব্যয়সঙ্কোচ ও যোগ্যতম ব্যবহারের নিদর্শন তেমনই এগুলোর বিনাশ সাধনও এদের প্রকৃষ্ট ব্যবহার। রাজনৈতিক দেহে বেশী গুরুতর ব্যাধি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে এ অতিপ্রয়োজনীয় শল্যচিকিৎসা।

গত বারোমাসে ভারতীয় নারীসমাজ মাতৃভূমির জন্য বিস্ময়কর অনেক কিছু করেছেন। মূর্তিমতী করুণারূপে তোমরা নীরবে কাজ করেছো। তোমরা তোমাদের অর্থ ও সুন্দর অলঙ্কার ত্যাগ করেছো, অর্থ সংগ্রহ করতে তোমরা ঘরে ঘরে গিয়েছো। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পিকেটিংএ সহায়তা করেছো। তোমাদের মধ্যে বিচিত্র রংএর সুন্দর পোষাক পরতেন ও দিনের মধ্যে কয়েকবার বেশ বদল করতেন এমন অনেকে এখন অমলিন ও শুভ্র কিন্তু মোটা খদ্দরের

শাড়ী পরে নারীর সহজাত পবিত্রতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছো। ভারতের জন্য, খিলাফতের জন্য ও পাঞ্জাবের জন্যই তোমরা এই সব কাজ করছো। তোমাদের কথা ও কাজে কোন ছলনা নেই। তোমাদের এই পবিত্র আত্মত্যাগ ঘৃণা বা ক্রোধের দ্বারা কলঙ্কিত নয়। তোমাদের কাছে আমি ঘোষণা করতে চাই যে সমগ্র ভারতে তোমাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্নেহময় যে সাড়া জেগেছে তা আমাকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করিয়েছে যে ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নারী এইভাবে সক্রিয় সহায়তা করছেন এর চেয়ে আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে আমাদের সংগ্রাম আত্মশুদ্ধির জন্য।

তোমরা অনেক দিয়েছো কিন্তু তোমাদের আরও কিছু দিতে হবে। তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে দেয় অর্থের প্রধান অংশ পুরুষই বহন করেছে কিন্তু তোমরা বৃহত্তম অংশ দান করলেই স্বদেশী কর্মসূচী সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে। তোমরা যদি তোমাদের বিদেশী বস্ত্রের সবটুকু না সমর্পণ কর তবে বিদেশী বর্জন অসম্ভব। যতদিন পর্যন্ত বিদেশী বস্ত্রের ওপর আকর্ষণ থাকবে ততদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরিবর্জন অসম্ভব। বয়কট অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্জন। ঈশ্বর আমাদের যে সন্তানই দেন তা নিয়ে যেমন আমরা কৃতজ্ঞতায় পরিতুষ্ট থাকি তেমনি ভারতবর্ষে যে বস্ত্র উৎপাদিত হয় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। শিশুটি অন্যের কাছে কুরূপ হলেও কোন মা তাঁর সেই সন্তানকে ত্যাগ করেছেন বলে আমি শুনিনি। সুতরাং ভারতে প্রস্তুত জিনিষ সম্বন্ধেও দেশভক্ত ভারতীয় নারীজাতির সেই রকমই করা উচিত। তোমাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হাতে কাটা ও হাতে বোনা জিনিষই ভারতে উৎপন্ন বলে মনে করবে। উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে তোমরা কেবলমাত্র মোটা খাদিই প্রচুর পরিমাণে পেতে পার। তোমাদের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী তোমরা তাতে বর্ণবিন্যাস করতে পার। কয়েকমাসের জন্যও যদি তোমরা মোটা খাদি নিয়ে সন্তুষ্ট

থাকো তাহলে একসময় অনেক আগে যে সূক্ষ্ম, সুন্দর ও বিচিত্র বর্ণের সব পোষাক পৃথিবীর ঈর্ষা ও নৈরাশ্যের বস্তু ছিল ভারতবর্ষে তার পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। আমি তোমাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে ছয়মাসের এই আত্ম-সংযম তোমাদের দেখাবে যে আজ আমরা যাকে রুচিসম্মত বলে মনে করি তা ভুল—সত্যিকার শিল্পবিচার কেবলমাত্র বাইরেই নয় অন্তর্নিহিত তথ্যেও ধরা পড়ে। এক শিল্প ধ্বংস করে—এক শিল্প প্রাণ সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্ত্য বা দূর প্রাচ্য থেকে যেসব সৌখীন সূতীবস্ত্র আমরা আমদানী করি যথার্থই তা আমাদের কোটি কোটি ভাইবোনের মৃত্যু আনে আর আমাদের হাজার হাজার প্রিয় বোনদের লজ্জাকর জীবন যাপনে বাধ্য করে। প্রকৃত কলা তার রচয়িতার শান্তি তৃপ্তি ও পবিত্রতার সাক্ষ্য নিশ্চয়ই বহন করবে। তোমরা যদি আমাদের মধ্যে এরকম শিল্পকলা পুনরুজ্জীবিত করতে চাও তাহলে এখন খাদি ব্যবহার তোমাদের সকলের অবশ্য করণীয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সার্থকতার জন্যই কেবলমাত্র খাদি ব্যবহার প্রয়োজন তা নয় বরং তোমাদের প্রত্যেকের অবসর সময় সূতো-কাটা অবশ্য করণীয়। বালক ও পুরুষদের আমি নির্দেশ দিয়েছি যে তাদেরও সূতোকাটা উচিত। আমি জানি তাদের মধ্যে অনেক হাজার লোক রোজ সূতো কাটেন কিন্তু আগেকার দিনের মত সূতো-কাটার প্রধান দায়িত্ব তোমাদের ওপরই থাকবে। দুশো বছর আগে ভারতীয় নারী কেবলমাত্র তাঁর নিজের প্রয়োজনেই নয় এমন কি বিদেশের জন্যও সূতো কাটতেন, তাঁরা যে কেবল মোটা সূতোই কাটতেন তা নয় পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতদূর সূক্ষ্ম সূতো হয়েছে সেরকম সূক্ষ্ম সূতোও তাঁরা কাটতেন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেরকম সূক্ষ্ম সূতো কাটতেন সেরকম সূক্ষ্ম সূতো কাটতে এখনও কোন যন্ত্র সক্ষম হয়নি। সুতরাং যদি আমাদের আগামী দুমাসে

ও পরে খাদির চাহিদা মেটাতে হয় তাহলে তোমাদের কাটুনীসঙ্ঘ গঠন করতে হবে, সূতোকাটার প্রতিযোগিতা সুরু করতে হবে, ও হাতে কাটা সূতোয় বাজার ভরে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে অনেককে সূতোকাটা, তূলোপেঁজা ও চরকায় পারদর্শী হতে হবে। এর অর্থ অবিরাম পরিশ্রম সূতোকাটাকে তোমরা জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে দেখবে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে এ পারিবারিক আয় বাড়াবে, ও অত্যন্ত দরিদ্র রমণীদের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এ জীবিকার্জনের উপায় স্বরূপ হবে। চরকা আগের মত বিধবার প্রিয় সঙ্গী হবে। কিন্তু তোমরা যারা এই আবেদন পড়বে তাদের কাছে কর্তব্যকর্ম বা ধর্মবিচারের রূপেই এ প্রদান করা হল। যদি স্বচ্ছল ভারতীয় মহিলারা প্রত্যেক দিনে কিছু পরিমাণ সূতো কাটেন তাহলে তাতে সূতো সস্তা হবে ও সূতোর প্রয়োজনীয় সূক্ষ্মতাও খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে।

ভারতের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মুক্তি প্রধানতঃ এইভাবে তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তোমাদের কোলেই রয়েছে কারণ তোমরাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের লালন-পালন করবে। তোমরাই পার ভারতীয় সন্তানদের সরলমনা, ধর্মভীরু ও তেজস্বী নরনারী করে গড়ে তুলতে, আবার তোমরাই পার তাদের আদর দিয়ে জীবন সংগ্রামে অক্ষম ও যে অভ্যাস পরিণত জীবনে ত্যাগ করা ক্লেশকর হয় সেই রকম বিদেশী সৌখীনতায় অভ্যস্ত করে এমন অপদার্থ করতে। ভারতীয় নারী কি উপাদানে তৈরী তা আগামী কয়েকটি সপ্তাহে প্রমাণিত হবে। তোমাদের পছন্দের বিষয়ে আমার সন্দেহের ছায়ামাত্র নেই। যে সরকার এতদিন ভারতের সম্পদ এমন ভাবে লুঠ করেছে যাতে ভারতবর্ষ আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে সেই সরকারের চেয়ে তোমাদের হাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ অনেক বেশী নিরাপদ। মহিলাদের প্রত্যেকটি সভায়ই আমি জাতীয় সাধনায় তোমাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি আর এই বিশ্বাসেই তা

করেছি যে তোমরা নির্মল সরল ও যথেষ্ট ধর্মপরায়ণ, তাই এই আশীর্বাদ ফলবতী হবে। তোমরা তোমাদের আশীর্বাদের সাফল্য সুনিশ্চিত করতে পার যদি তোমরা বিদেশী বস্ত্র বর্জন কর ও অবসর সময়ে দেশের জন্য নিরলস ভাবে সূতো কাটো।

তোমাদের একান্ত অনুগত ভাই

এম. কে গান্ধী

নারীর ভূমিকা

সংবাদপত্রের তারবার্তায় প্রকাশিত হয়েছে যে কলকাতার মহিলারা খাদি বিক্রীর চেষ্টা করে কলকাতাবাসী ভদ্রলোকদের বাধা দিয়েছেন আর তার ফলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু সি. আর. দাসের অনুগামী স্ত্রী, তাঁর বিধবা বোন ও বোনের মেয়ে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত। আমার আশা ছিল যে অন্ততঃপক্ষে প্রথম দিকে মহিলাদের করাবরণ করবার সম্মান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। তাদের আইন অমান্য করার ব্যাপারে বেশী সক্রিয় হবার কথা ছিল না। কিন্তু বাংলা সরকাব স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য না করার নিরপেক্ষ উৎসাহে কলকাতার তিনটি মহিলাকে এই সম্মান দিয়েছে। সমস্ত দেশ এই নতুন প্রবর্তনাকে সাদরে গ্রহণ করবে বলে আমি আশা করি। পুরুষেব মত ভারতীয় নারীরও স্বরাজ অর্জনে সমান অধিকার আছে। সম্ভবতঃ এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নারী পুরুষকে অনেক পেছনে ফেলে যাবে। আমরা জানি সব সময় ধর্মানুরক্তিতে নাবী পুরুষের চেয়ে বড়। নীরবে মর্যাদার সঙ্গে দুঃখ বরণের ক্ষমতাই তার বৈশিষ্ট্য। এখন যখন বাংলা সরকার মহিলাদেব সংগ্রামের পুরোভাগে টেনে এনেছে আমি আশা করি যে ভারতের সর্বত্র নাবীজাতি এই আহ্বানে সাড়া দেবে, আর নিজেদের সংগঠিত করবে। যাই হোক্ না কেন পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুরুষেরা চলে গেলে মহিলাদের আপন সম্মান রক্ষার জন্য তাদের শূন্যস্থান গ্রহণ করতেই হতো, কিন্তু এখন পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি থেকে কারাজীবনের কষ্ট ভাগ করে নিতে হবে। ঈশ্বরই তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করবেন। পুরুষকে উপহাস করবার জন্যই যেন, দ্রৌপদীর সামাজিক রক্ষাকর্তারা যখন তার শেষ বস্ত্রখণ্ডটুকু অপসারণের প্রতিবিধান করতে অসমর্থ হয়েছিলেন তখন তাঁর স্বধর্মের শক্তিই

তাঁর সম্মান রক্ষা করেছিল, সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত এরকমই ঘটবে। দৈহিক শক্তিতে সবচেয়ে দুর্বল যিনি, আপন সম্ভ্রম রক্ষার সামর্থ্য তাকে দেওয়া থাকে। নারীকে রক্ষা করা পুরুষেরই যেন বিশেষ অধিকার হয়, কিন্তু পুরুষের অনুপস্থিতিতে বা তাকে রক্ষা করার পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনে সে অসমর্থ হলে ভারতের কোন নারী যেন নিজেকে অসহায়া বলে মনে না করেন। মৃত্যু বরণ করতে যে জানে আপন সম্মান রক্ষার কোন শঙ্কাই তার থাকে না।

ভারতীয় নারীদের কাছে আমি এই প্রস্তাব করতে চাই যে তারা যেন নীরবে ও কালবিলম্ব না করে এখুনি সংগ্রামের পুরোভাগে আসতে ইচ্ছুক নারীদের নাম সংগ্রহ করেন। আর বাংলার রমণীদের কাছে যেন তারা তাদের আগ্রহের কথা জানান, যাতে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে অন্যত্র তাদের বোনেরা তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে প্রস্তুত। সম্ভবতঃ কারাজীবনের শঙ্কা, যা নারীদের ক্ষেত্রে বেশী, তা বরণ করতে হয়ত নারীরা বেশী সংখ্যায় অগ্রণী হবেন না। যদি কয়েকজনও এই প্রথম অধ্যায়ে আত্মবলি দিতে এগিয়ে আসেন তাতে জাতির লজ্জাবোধ করবার কিছু নেই।

নারীদের সহায়তায় স্বরাজ

এখন যখন কার্যকরী সমিতি সূতোকাটাকে আইন অমান্য আন্দোলনের সর্ত করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন ভারতীয় নারীরা দেশ সেবার এক অসাধারণ সুযোগ পেয়েছেন। লবণ আন্দোলনের সময় শত শত হাজার হাজার মহিলা গৃহকোণ থেকে বাইরে এসেছিলেন—পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে তারাও যে দেশ সেবা করতে পারেন তা প্রমাণ করেছিলেন। এতে পল্লীরমণীরাও এমন এক মর্যাদা লাভ করেন যা তারা আগে কখনও পাননি। সাম্রাজ্যবাদ থেকে ভারমুক্ত হবার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সূতাকাটাকে প্রাধান্য দিয়ে পুনঃ প্রবর্তনের ফলে ভারতের নারীরা এক বিশেষ মর্যাদা পেয়েছেন। সূতোকাটায় পুরুষের চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সুবিধে আছে।

সৃষ্টির প্রথম থেকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শ্রমের বিভাজন রয়েছে। ইভ্ সূতো কাটতেন—আদাম বুনতেন। সেই পার্থক্য আজও বদলায়নি। সূতোকাটুনী পুরুষেরাই এর ব্যতিক্রম। পাঞ্জাবে ১৯২০-২১ সালে যখন আমি পুরুষদের সূতো কাটতে বলি তখন তারা আমায় জানায় যে সূতোকাটা পুরুষের মর্যাদা হানিকর—এ সম্পূর্ণ নারীরই বৃত্তি। এখন পুরুষেরা মর্যাদার দোহাই দিয়ে আর আপত্তি করেন না। এখন হাজার হাজার পুরুষ ত্যাগ স্বীকারের জন্যই সূতো কাটেন। পুরুষ যখন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সূতো কাটতে আরম্ভ করলো তার পরেই এই সূতোকাটা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা লাভ করলো—তাতে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনা হতে লাগলো। সে যাই হোক্ না কেন অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে সূতোকাটায় নারীরই বিশিষ্ট ভূমিকা অভিজ্ঞতার পেছনে সুযুক্তি আছে বলে আমি বিশ্বাস

করি। সূতোকাটা মূলতঃ একটি মন্থর ও অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দ প্রক্রিয়া। নারী ত্যাগের প্রতিমূর্তি—আর সেই কারণে অহিংসারও। অতএব তার বৃত্তি, এখন যেমন সংগ্রাম নয়, শান্তি আশ্রয়ী হতেই হবে। হিংসাত্মক সংগ্রামের জন্য আজ যে তাকে নীচে নামিয়ে আনা হচ্ছে তা আধুনিক সভ্যতার গৌরবের বিষয় নয়। নারীর প্রকৃতিতে হিংসা শোভা পায় না। এজন্য আমার বিশ্বাস যে, তার মূল প্রকৃতির ওপর এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সে যে শিগ্‌গিরই বিদ্রোহ করবে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি মনে করি যে পুরুষও তার নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুশোচনা করবে। নর-নারীর সমান অধিকারের অর্থ এই নয় যে তাদের বৃত্তিগুলো এক হবে। নারী শিকার করে বেড়াবে বা বল্লম নিয়ে আস্ফালন করবে—এতে কোন বিধিসম্মত বাধা না থাকতে পারে। কিন্তু যে কাজ নিতান্তই পুরুষের তা করতে সে স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হয়। প্রকৃতি নর-নারীকে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছে। তাদের চেহারামত তাদের কাজও সুনির্দিষ্ট।

আমার উদ্দেশ্যের জন্য নর-নারীর কাজের পার্থক্য প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। মূল কথা এই যে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নারী সূতোকাটাকে তাদেরও স্বাভাবিক বৃত্তি বলে মনে করে। কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে এই দায়িত্ব পুরুষের থেকে নিয়ে নারীর ওপর দিয়েছে আর তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ দিয়েছে। আমার এই আগামী দিনের সেনাবাহিনীতে পুরুষের চেয়ে নারীর বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকলে আমি সুখীই হব। পুরুষের সংখ্যাধিক্য থাকলে যতদূর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমি সংগ্রামের সম্মুখীন হতাম তাব চেয়ে আস্থা আমার বেশী থাকবে। পুরুষের বলপ্রয়োগকে আমি বড় ভয় করি। এরকম হিংসার প্রকাশকে রোধ করার নিশ্চয়তা নারীরাই আমাকে দেবে।

নারী ও চরকা

বিহারে খাদি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধিজী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু দৈনিক আয়ের হিসেবের দিকে শ্রোতাদের মনযোগ আকর্ষণ করে বলেন—

যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয়ের নির্দেশক এই লম্বা লাল দাড়িটির তুলনায় ভারতবর্ষের নির্দেশক এই ছোট্ট বিন্দুটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। যেখানে একজনের দৈনিক আয় ১৪ টাকার ওপরে সেখানে অপরের দৈনিক আয় ১½ আনা মাত্র। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি অন্যান্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে তুলনা করুন যাদের দৈনিক আয় যথাক্রমে ৭ টাকা, ৬ টাকা ও ৫ টাকা. আর এই যে দৈনিক ১½ আনা --এও আমাদের গড় দৈনিক আয়। আমাদের এই হিসেব থেকে যদি বেতনভোগী মন্ত্রী, সরকারী আমলা, সচিব, অল্প কয়েকজন আইন ব্যবসায়ী ও আরও অল্প কয়েকজন লক্ষপতির আয় বাদ দেওয়া যায় তবে দরিদ্র জনসাধারণের বিরাট অংশের প্রকৃত আয় আরও কম হবে। আমি সবিনয়ে আপনাদের জিজ্ঞেস করি যে এই নগণ্য উপার্জনের পরিপূরণ কিভাবে করা যায়—সে সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ দিন। এরকম অনুরোধ আমি সকলকেই করেছি কিন্তু ফল হয়নি। গভীর চিন্তার পর ও সাম্প্রতিক কয়েক বছর বহু লক্ষ জনগণের সান্নিধ্যে বসবাস করে আমার কাছে চরকাই এই আয় পরিপূরণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায় বলে মনে হয়েছে।

এর পর তিনি উৎপাদন ও বিক্রির পরিসংখ্যান থেকে বিহারে খাদি উৎপাদনের নিশ্চিত ও দ্রুত বৃদ্ধি দেখান ও বিক্রির বিষয়ে মন্থরতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৩০,০০০ টাকার খাদি উৎপাদনের অর্থ বিহারে ৩০,০০০ নারীর মধ্যে ঐ টাকার বিতরণ। আমার সঙ্গে দ্বারভাঙ্গার খাদি কেন্দ্রে

চলুন। সেখানকার হিন্দু-মুসলমান নারীদের মধ্যে চরকা কত আনন্দ কত সুখ এনেছে তা দেখুন। আরও অনেক লোকের কাজ যদি না দিতে পারা যায় তবে সে দোষ আপনাদের—আমার নয়। তাদের নিজেদের হাতে তৈরী জিনিষ কিনতে আগ্রহী না হলে কাজের বিস্তৃতি হতে পারে না। আপনাদের এক গজ খদ্দর কেনার অর্থ সেই সব রমণীদের হাতে কিছু পয়সা দেওয়া। কয়েকটি পয়সাই মাত্র—তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু এর অর্থ আগে যেখানে কিছুই ছিল না এখন সেখানে কয়েকটি পয়সা মাত্র। আমি রাজমুন্দ্রি ও বরিশালে পতিতা মেয়েদের দেখেছিলাম। একজন তরুণী এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো—"গান্ধী, তোমার চরকা আমাদের কি দিতে পারে? যেসব পুরুষেরা আমাদের কাছে আসে তারা কয়েক মিনিটের জন্য আমাদের ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা দেয়।" আমি তাকে বললাম যে চরকা তাদের অত দিতে পারে না কিন্তু যদি তারা এই লজ্জাকর জীবন ত্যাগ করে তাহলে আমি তাদের সূতোকাটা ও বোনায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারি আর সৎভাবে জীবিকার্জনে সাহায্য করতে পারি। সেই মেয়েটির কথা শুনে আমি খুবই নিরুৎসাহ হয়ে গিয়েছিলাম আর ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমিও কেন নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি। কিন্তু নারী হয়ে জন্মগ্রহণ না করেও আমি নারী হতে পারি আর এই ভারতীয় নারীদের জন্য, যাদের অধিকাংশ এমনকি দৈনিক এক আনা পয়সাও পায় না, তাদের জন্য, আমি আমার চরকা ও ভিক্ষাঝুলি নিয়ে দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি।

৭৫'রেও তরুণী

একজন ইংরেজ বন্ধু লিখেছেন—

"সত্তরোত্তর বর্ষীয়া এক কৃষিজীবী সুইস স্নেহময়ী বৃদ্ধার কাছ থেকে যে চিঠি ও ফটোগুলো আমি পেয়েছি তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই—এই বৃদ্ধাটি ভিলেনেউভের ওপর পার্বত্যদেশে সুতোকাটা ও তাঁত বোনাতে ব্যাপৃত থাকেন। আমার কাছ থেকে পাওয়া চিঠিগুলোর উত্তর তিনি ফরাসী ভাষাতে দিয়েছেন আর তাতে বলেছেন, 'আমরা এখন শীতকালের প্রারম্ভে, আর বেশ কয়েক মাসের জন্য এখন তুষার আমাদের সঙ্গ দিতে নেমে আসছে। আমার তাঁতটিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবার মত পর্যাপ্ত সময় আমার থাকবে। ৫৯ মিটার লম্বা ছুটি বস্ত্রখণ্ড সরবরাহের বরাত আমি পেয়েছি তাই আমার প্রচুর সময়ের প্রয়োজন কেননা পচাত্তর বয়সের বৃদ্ধা আমি—সহজেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি।' তার জীবন যা সব কৃষকের হওয়া উচিত—কর্মব্যস্ত অথচ শান্ত ও পরিতৃপ্ত জীবনের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। গ্রীষ্মকালে তিনি ক্ষেতে কাজ করেন, অবশ্য সুবিধেমত দুই এক ঘণ্টা সুতোকাটা ও তাত বোনার কাজও করেন, আর যখন বৃষ্টি পড়ে আর শীতকালে যখন ক্ষেতগুলো বরফে ঢাকা পড়ে তখন সারাদিনই তিনি চরকা ও তাঁতের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। এই হাতে চালানো শিল্পটি যদি তার কাছ থেকে চলে যায় তাহলে মহিলাটি মহা দুর্দশার মধ্যে পতিত হবেন। এখন এই পার্বত্যদেশে তিনিই সবচেয়ে সুখী ও মধুর স্বভাবের। কিন্তু কেন? কারণ এই এলাকার সমস্ত কৃষকদের মধ্যে তিনিই এই পুরোনো শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আর একমাত্র তিনিই তাই পূর্ণ ও সত্যকার জীবন লাভ করেছেন। এই সঙ্গে আমি একটি ফটো পাঠাচ্ছি যাতে দেখা যাচ্ছে তিনি একটি গাছের গুড়ির ওপর বসে তার ছাগবৃন্দের একটিকে আদর করছেন—এই ছবি থেকে তাঁর মধুর সৌম্য মুখের কিছু আভাস আপনি পাবেন। কম বয়সের মহিলাটি বৃদ্ধার পুত্রবধু।"

এই সুন্দর ফটোগ্রাফটি আমার কাছে রয়েছে। আমি অবশ্য ইয়ং ইণ্ডিয়াতে তা ছাপাতে পারবো না। কিন্তু কল্পনায় পাঠক ঐ

ছবিটি নিজের মনে এঁকে নিতে কোন অসুবিধে বোধ করবেন না। সে যাহোক, চিঠিটির মূল কথা এই যে ঐ যন্ত্রপ্রধান দেশটিতে এখনও এমন লোক আছেন যারা এক সময়কার সার্বজনীন কুটীর শিল্প এই চরকা ও তাঁতের মধ্যে শান্তি খুঁজে পান। এবং এই বৃদ্ধা যিনি তার শ্রমের ফলে ৭৫ বছরেও তরুণী রয়েছেন তিনি যদি চরকা ও তাঁতের মধ্যে তার জীবিকার উপায় নয়—জীবনের পরিতৃপ্তি পেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের এই দেশে তার প্রয়োজন কত বেশী যেখানে খুব কম নারীই ৭৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন ও যেখানে অধিকাংশই পঞ্চাশ বছর বয়সে অকারণেই বুড়ি হয়ে পড়েন আর বিশেষ করে যেখানে লক্ষ লক্ষ নারীর ক্ষেত্রে অবসর সময়ে কোন নির্দোষ কুটীর শিল্পে ব্যাপৃত থাকার পরিতৃপ্তির চেয়ে নিছক অনাহার এড়াবার তাগিদই বড়।

তাই যদি হয় তবে ঐ বৃদ্ধা সুইস প্রিয় বোনটি যা করেন সেই গৃহশিল্পটিকে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মহিলারা কেন গ্রহণ করেন না আর এর মাধ্যমে অন্নসংস্থান ও পরিতৃপ্তি লাভ করেন না? এরকম করতে কেই বা তাদের বাধা দিচ্ছে'—একজন অজ্ঞ অবিশ্বাসী এ প্রশ্ন করলেন। ১৮৮৯ বা ১৮৯০ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এক ইংরেজ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন একজন স্থূলকায় ইংরেজ তাঁকেও প্রায় এইরকম একটি প্রশ্ন করেছিলেন। জনবুল এণ্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠানের এই সুযোগ্য কর্মচারীটি বাংলাদেশের তৎকালীন মুকুটহীন রাজাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তাঁর কথামত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চায় এ যদি সত্যি হয় তবে কে তাদের সেই স্বাধীনতা লাভে বাধা দিচ্ছে? আর এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য কর্মচারীরা এ রকম কথা কখনও শোনেননি যে জানলার কাঁচ ভাঙ্গার ঘটনা একটিও ঘটেছে—মাথা ভাঙ্গা তো দূরের কথা; কেননা তার স্বজাতীয়েরা অভীষ্ট বস্তু না পেলে এ রকমই করে থাকেন। আমার যদি ঠিক মনে থাকে

ঐ বাগ্মী কোন প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন বলে সংবাদপত্রে কোন উল্লেখ হয়নি। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে শুধু "শুনুন শুনুন" এই শব্দ উঠেছিল। কিন্তু এই সরলমনা ইংরেজ সুরেন্দ্রনাথকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার পুনরুক্তি আজও করা যায়; অবশ্য আমরা জানি যে স্বাধীনতালাভের কোন পথ ঐ প্রশ্নের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। কি ভাবে তা অর্জন করতে হবে তা হয়ত আমরা জানি না। পথ আমাদের জানা থাকলেও হয়ত সেই পথ অনুসরণ করবার ক্ষমতা বা ইচ্ছে আমাদের নাও থাকতে পারে। তবুও স্বাধীনতার দাবী স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। এই দাবী যত নিরর্থকই হোক না কেন তবু স্বাধীনতালাভের পথে এটাই প্রথম পদক্ষেপ।

এই অবিশ্বাসীরা তাদের অজ্ঞতায় বিস্মৃত হয় যে এই লক্ষ লক্ষ উপবাসী জনতা অন্ন বা কর্মসংস্থানেব জন্য সোচ্চার হতেও অনিচ্ছুক। এই কারণেই আমরা ইংরেজ ঐতিহাসিকের সঙ্গে একসুরে বলে উঠি 'ঐ মূক জনসাধারণ'—এদের হয়ে আমাদেরই কথা বলতে হবে। ঐ মূক জনসাধারণকে প্রথম শিক্ষা আমাদেরই দিতে হবে। আমরাই তাদের এই অসহনীয় দারিদ্র্য আর অজ্ঞতার জন্য দায়ী—তারা নিজেরা নয়। তারা জানেও না কি তারা চায়—কি তাদের প্রয়োজন। তারা সজীব শবমাত্র।

স্বাধীনতার প্রত্যাশী হলে তা লাভে কে তাদের বাধা দিচ্ছে—অস্পৃশ্যদের এ কথা বলার স্পর্ধা কার আছে? পরমেশ্বরের সহনশীলতা দীর্ঘস্থায়ী—তিনি ধৈর্যশীল। অত্যাচারীকে আপন সমাধি রচনা করতে তিনি দেন—যদিও নিয়মিত সময়ে তাদের গভীরভাবে সতর্কও করে দেন।

অতএব ন্যায়সঙ্গতভাবে আমরা এটা বলতে পারি যে আপাতঃ বিচারে ইংরেজ ভদ্রলোকটির ব্যঙ্গোক্তি যদি যুক্তিসম্মতও হয় তবুও প্রশ্নটিকে এ ভাবে এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে শোভন হয়নি বিশেষতঃ যখন অসহায় বোধ করলেও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ

স্বাধীনতা লাভের স্বাভাবিক দাবী করতে আরম্ভ করেছি। লক্ষ লক্ষ মানুষের যে তীব্র অভাববোধ রয়েছে—যা তারা হয়তো অনুভব করতেও অক্ষম, আর তাদের পক্ষে আমরা অল্প কয়েকজনই যা বুঝতে পারি—সেই অভাবের প্রশমনে আমরা মধ্যবিত্ত স্ত্রী-পুরুষেরা যদি ঐ কল্পিত অবিশ্বাসীর মুখে আমার আরোপিত ব্যঙ্গোক্তির প্রতিধ্বনি করি তবে তা অশোভন হবে। অভাব মেটাবার জন্য প্রতিনিধির সংখ্যা অনেক গুণ বাড়াতে হবে যারা এই মূক জনসাধারণের কেবল মুখপাত্রই হবেন না উপরন্তু নিজেরা বিদেশী সৌখীন জিনিষ পরিত্যাগ করে, খদ্দর ব্যবহার করে আর যতদিন না সমগ্র জাতির প্রতিটি অলস মুহূর্ত সৎকাজে নিয়োজিত হয় ততদিন বিরত না হয়ে নিজেদের পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে সূতো কাটায় নিযুক্ত রাখবেন। কেবলমাত্র তখনই, তার আগে নয়, ৭৫ বছরের সুইস ভগিনীর যে ছবি আমরা পেয়েছি তার মত ভারতীয় নারীরাও ৭৫ বছর বয়সেও নবীনা, সুখী ও ঈশ্বর অনুরাগী হবেন।

একজন ভগিনীর সমস্যা

একজন বোন লিখেছেন—

"আমাদের প্রত্যেকের খদ্দর পরার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একবছর আগে আপনাকে ভাষণ দিতে শুনেছিলাম। তার পর থেকে আমি খদ্দর ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু আমরা গরীব—আমার স্বামী বলেন যে খাদির দাম বেশী। মহারাষ্ট্রের অধিবাসিনী আমি—ন গজ লম্বা শাড়ী আমি ব্যবহার করি। এখন আমি যদি আমার শাড়ীর লম্বা কমিয়ে ছয় গজ করি তবে অবশ্য তাতে বেশ কিছুটা কাপড় বেঁচে যাবে কিন্তু গুরুজনেরা এরকম কমানোর কথা শুনতেই চান না। আমি তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করি যে খাদি ব্যবহারই বেশী প্রয়োজনীয়—শাড়ী পরার ভঙ্গী বা তার দৈর্ঘ্য একেবারেই নিরর্থক, কিন্তু আমার সে চেষ্টা বৃথা হয়। তারা বলেন যে যৌবনের চপলতাই আমার মাথায় এই সব নতুন চিন্তাধারা ঢুকিয়েছে। কিন্তু আপনি যদি আমাকে এই মর্মে চিঠি দেন যে প্রয়োজন হলে কাপড় পরার ধরণ বদলেও খদ্দর ব্যবহার করা উচিত—তবে তারা প্রস্তাবিত দৈর্ঘ্য কমাতে সম্মত হবেন বলে আমি আশা করি।"

এই বোনটির অভিপ্রেত উত্তর আমি দিয়েছি কিন্তু আমি তার অসুবিধেটি মনে রেখেছি, কারণ আমি জানি যে আমার অন্যান্য অনেক বোনকেই এবকম অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়।

প্রসঙ্গাধীন চিঠিটি লেখিকার দৃঢ় জাতীয়তাবোধের সাক্ষ্য বহন করে কারণ তার মত পুরোনো প্রথা বা প্রচলিত রীতিনীতি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে প্রস্তুত এরকম বোনের সংখ্যা বেশী হবে না। কোন রকম কষ্ট স্বীকার না করে বা বিনা অর্থব্যয়ে আর পুরোনো রীতিনীতি শালীনতাসম্মত হোক বা না হোক সেগুলো আকড়ে ধরে স্বরাজলাভে আগ্রহী ভাইবোনের সংখ্যা অসংখ্যই হবে কিন্তু স্বরাজ অত সুলভ জিনিষ নয়। স্বরাজলাভ করার অর্থ হলো প্রাদেশিকতা বর্জনের সঙ্গে আত্মত্যাগ ভাবের সাধনা।

প্রাদেশিকতা শুধু যে জাতীয় স্বরাজলাভের তাই নয় উপরন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভের পথেও বাধাস্বরূপ। পুরুষের চেয়ে নারীই বোধহয় এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব বাঁচিয়ে রাখার জন্য বেশী দায়ী। সীমা রেখে বৈচিত্র্য রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গেলে বৈচিত্র্যের ছদ্মবেশে স্থানীয় প্রথা ও আচার-ব্যবহার জাতীয়তাবোধের পক্ষে হানিকর। দক্ষিণী শাড়ী একটি মনোরম জিনিষ কিন্তু যদি তা জাতির ক্ষতি করেই রক্ষা করতে হয় তবে সেই সৌন্দর্য বর্জন করতেই হবে। কাচ্ছি ধরণের ছোট শাড়ী পরবার ধরণ বা পাঞ্জাবী ওধনীকেও বাস্তবিকই রুচিসম্মত বলে আমাদের মনে করা উচিত যদি তার মাধ্যমে খাদি ব্যবহার সুলভ ও সুবিধেজনক হয়। শাড়ী পরবার দক্ষিণী, গুজরাটি, কাচ্ছি বা বাঙ্গালী যে ধরণ আছে তার সবগুলোই বিভিন্ন ভাবের জাতীয় ধরণ—এদের প্রত্যেকটি অন্য সবগুলোর মত জাতীয় আখ্যা পেতে পারে। এই অবস্থায় শোভনতাকে অক্ষুণ্ন রেখে যে ধরণে সবচেয়ে কম কাপড়ের দরকার হয় তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কাচ্ছি পদ্ধতিটি এরকম একটি ধরণ—কারণ কম ভার বহন করার কারণে স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বাদ দিলেও এতে মাত্র তিনগজ কাপড়ের দরকার হয় অর্থাৎ গুজরাটি শাড়ীর তুলনায় মাত্র অর্ধেক।

পাচ্ছেদা আর পেটিকোট এক রংএর হলে এ পাচ্ছেদা না সম্পুর্ণ শাড়ী তা হঠাৎ কেউ বুঝতে পারবে না। জাতীয় বেশভূষা পদ্ধতির এরকম পারস্পরিক আদান-প্রদান ও অনুকরণ সুস্পষ্টভাবে বাঞ্ছনীয়।

সম্ভ্রান্তশালী ধনীরা তাদের দেরাজে সব প্রদেশের সম্ভাব্য পরিধেয় রাখতে পারেন। কোন বাঙ্গালী অতিথিকে আপ্যায়ন করার সময় যদি কোন গুজরাটি গৃহস্বামী ও কর্ত্রী বাঙ্গালী ধরণের বেশভূষা করেন তবে তাতে ভদ্রতা ও জাতীয়ভাবের প্রকাশ খুব ভালই হবে এবং অপর পক্ষেও অনুরূপ। কিন্তু এরকম আপ্যায়ন ব্যবস্থা

কেবলমাত্র ধনী দেশপ্রেমিকরাই করতে পারেন। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র-শ্রেণীর দেশপ্রেমিকরা সেই বিশেষ প্রাদেশিক ধরণ অভ্যেস করে গৌরব বোধ করতেও পারেন যাতে খাদির ব্যবহার আরও সুলভ ও সহজ হয়; আবার এই সব ক্ষেত্রেও দরিদ্রতমদের মধ্যে প্রচলিত পরিধেয়ের ওপরেও দৃষ্টি রাখা উচিত।

স্বদেশীর অর্থ নিজেব সঙ্কীর্ণ ডোবার মধ্যে ডুবে মরা নয়—বরং মহাসাগর অর্থাৎ স্বদেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই এব লক্ষ্য। ঐ মহাসমুদ্রে অবদান জোগাবার দাবী তখনই সে করতে পারে যদি সে নিজে নির্মল হয়,—অপবকে নির্মল রাখে। অতএব এটা নিঃসন্দেহ যে, যে সব স্থানীয় বা প্রাদেশিক রীতিনীতি দোষনীয় বা নীতিবিবোধী নয় কেবলমাত্র সেগুলোই সমগ্র জাতির মধ্যে প্রচলিত হওয়া উচিত। একবার এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করলে স্বাদেশিকতা বিশ্বমানবতার সহায়তায় রূপায়িত হতে পাবে।

বেশভূষা সম্বন্ধে যা সত্য তা ভাষা খাদ্য ইত্যাদি বিষয়েও সমভাবেই সত্য। যেমন বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আমবা অন্য প্রদেশেব বেশভূষাব অনুকবণ করতে পারি তেমনি অনুকবণ ভাষা ও অন্যান্য বিষয়েও কবতে পারি। কিন্তু আজকাল ইংবেজীকে সবচেয়ে প্রাধান্য দেবার নিরর্থক, অসম্ভব ও মারাত্মক প্রয়াসে আমাদের মাতৃভাষাকে আর সর্বোপরি অন্যান্য প্রদেশের ভাষাগুলোকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অবহেলা করে আমাদের সমস্ত উৎসাহের অপব্যয় ঘটছে।

তামিলী মহিলাদের প্রসঙ্গে

তিরুপতি থেকে একজন বন্ধু লিখছেন—

"মাদ্রাজে আমাদের আন্দোলনের সাফল্যে সবচেয়ে বড় বাধা আমাদের মহিলারাই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল আর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ মহিলাদের মধ্যে বেশ বেশী সংখ্যকই নানারকম পাশ্চাত্ত্য কু-অভ্যাসে আসক্ত হয়েছেন। তারা দিনে অন্ততঃ তিনবার কফি পান করেন আর আরও পান করা সৌখীনতার পরিচয় বলে মনে করেন। পোষাক পরিচ্ছদেও তারা বেশী কিছু ভাল নন; তাঁরা সাদাসিধা সস্তা পোষাক ত্যাগ করেছেন—দামী বিদেশী বস্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। গহণার ব্যাপারেও ব্রাহ্মণ মহিলারা অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রীবৈষ্ণব মহিলারা সবচেয়ে বেশী দোষী। পুরুষরা যখন ধার্মিক জীবনে ফিরে আসতে চেষ্টা করছেন আমাদের মহিলারা তখন অমিতব্যয়ী হচ্ছেন। দেব পূজার জন্য মন্দিরে যাবার সময় তারা সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর পোষাকের কথা কল্পনা করতে পারেন না। যত বেশী মূল্যবান অলঙ্কার সম্ভব আর খুব বেশী দামের সূক্ষ্ম বস্ত্র তাদের চাই-ই। আমি অনেক সুশীলা মহিলাকে জানি যারা তাদের মনোহর পোষাক ও মূল্যবান অলঙ্কার না থাকায় মন্দিরে যেতে নারাজ হন।"

বন্ধুটি নিজে একজন অসহযোগী বৈষ্ণব ব্যবহারজীবী। তিনি যা বলেছেন তা'র সবটুকুই বিশ্বাস করতে আমি অনিচ্ছুক। বর্ণাঢ্যতার অর্থাৎ রং ও চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ অন্য সকলের চেয়ে তামিলী বোনদের বেশী—এ আমি বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক। সে যাহোক্ তাঁর এই চিঠিটি তামিলী বোনদের যেন সতর্ক করে দেয়। তাদের স্বাভাবিক সরলতায় ফিরে যেতেই হবে। যারা আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জা করেন তাদের চেয়ে যারা অন্তরের পবিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ শুভ্র খাদি পরিধান করেন তাদের প্রতি ঈশ্বর নিঃসন্দেহে বেশী প্রীত

হবেন। যে বিনয় ও সারল্য পূজার্থী চিত্তের বৈশিষ্ট্য—আমাদের মন্দিরগুলো তারই প্রকাশ স্বরূপ—বাহ্যাড়ম্বরের প্রতীক নয়। উল্লিখিত অন্যায় সম্বন্ধে মাদ্রাজ প্রদেশের মহিলাদের মধ্যে নিরন্তর প্রচার কাজ চালানো উচিত।

তামিলী ভগিনীদের প্রসঙ্গে

একজন দক্ষিণ ভারতীয় আইনজীবী আমাকে এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন—

"অন্যান্য প্রদেশের মত তামিল প্রদেশে খাদি ব্যাপকভাবে চলে না এর প্রধান কারণ মহিলারা এ ব্যবহার করেন না। ঠিক এই একই কারণে চরকাও খুব বেশী দেখা যায় না। এখানে বিবাহিত মহিলারা সাধারণ সাদা শাড়ী পরতে পারেন না। তাদের শুধু রঙীন শাড়ীই পরতে হয়। আগেকার দিনে মহিলারা কেবল সূতীর শাড়ীই পরতেন, এখন কেবলমাত্র খুব গরীবরা ছাড়া আর সকলেই সূতী শাড়ী বর্জন করেছেন। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য এখন সিল্ক শাড়ীই প্রচলিত। প্রথমে রেশমী শাড়ী মায়া-ভরমের কাছে কোরানাড্রুতে তৈরী হতো। পরে তা কাঞ্জিভরমেও হয় আর ভারতীয় রং দিয়ে ওগুলো রঙীন করা হতো। সেগুলোর দাম ছিল ১০ টাকা থেকে ৩০ টাকা—সময় সময় অনুষ্ঠানে তা ব্যবহার করা হতো। সম্প্রতি জার্মান বা ইংরাজী রং-এ রাঙানো ন্যূনপক্ষে ৫০ টাকা দামের বাঙ্গালোর শাড়ীতে বাজার ছেয়ে গ্যাছে। এতে বিশেষ করে গরীব ব্রাহ্মণ গৃহস্থের ওপর খুব বেশী চাপ পড়েছে, কারণ তার পরিবারের সকলের জন্য এরকম শাড়ীর ব্যবস্থা করতে হয়। আবার যখন এগুলো রোজ ব্যবহার হয়—তখন বেশ কয়েকটি এরকম শাড়ীর যোগাড় রাখতে হয়। বিবাহাদি উৎসবে উপহারের জন্য এ রকম একটি শাড়ীর ন্যূনতম দাম ১০০ টাকার বেশী। অনেক ভদ্র পরিবার শুধু এই কারণেই একটি বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এই সর্বনাশা অভ্যেস যা এতদিন ব্রাহ্মণদের মধ্যেই ছিল তা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

"ব্যয়ের কথা ছেড়ে দিলেও সুবিধে ও আরামের কথাও ভাবতে হয়। রেশম সহজে জল সিক্ত হয় না আর ভারী। এ পরে ঘরের কাজকর্ম করা বা রান্না করা মারাত্মকভাবে ক্লেশদায়ক। বছরে দু-এক মাস ছাড়া এই অঞ্চল সব সময়ই গরম। যদি রঙ নষ্ট হয়ে যায় বা ভাঁজ খারাপ হয় এ জন্য

দামী শাড়ীগুলো না ধোবার অস্বাস্থ্যকর কু-অভ্যেসটিও আছে। যে স্বেদ ও গন্ধ বার হয় তা অসহনীয়।

"সর্বনাশের সম্মুখীন অনেক গৃহস্থই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হবে যদি আপনি মিতব্যয় অনাড়ম্বর ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন।"

তামিলী মহিলারা যে রেশমী শাড়ীর প্রতি বেশী অনুরক্ত এ বিষয়ে লেখকের মতের সঙ্গে আমি একমত। মাদ্রাজের মত গরম আবহাওয়ায় রেশমী পোষাকের চেয়ে অস্বাস্থ্যকর আর কিছু হতে পারে না। ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে একটি শাড়ীর জন্য ১০০ টাকা খরচ করা অর্থের দোষনীয় অপব্যয়। পুরুষেরাও কিছু ভাল নয় কারণ তারা ভুলে যান যে হাতে বোনা পাগড়ী ধুতী আর উপর্ণ যা নিয়ে তারা গর্ব করেন তার সব সূতোই বিদেশী। যে সব সৌখীন পোষাক পুরুষেরা সমাদর করেন তার চেয়ে আশ্চর্য মনে হলেও খাদি এর শোষকতার কারণে অনেক বেশী শীতল আবরণী। যাহোক, আমি অবশ্য আশা করি যে তামিলীয়দের আধ্যাত্মিকতার ওপর আমার যে আস্থা আছে—স্বদেশী আন্দোলনের মত কঠিন বিষয়েও সে আস্থার যথার্থতা প্রমাণিত হবে আর বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণ বর্জনের নৈতিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারা অবহিত হবেন। মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের মত স্বেদসিক্ত সমতল ভূমিতে অনায়াস চালিত চরকার চেয়ে উপযোগী কোন শিল্পের কথা আমার ধারণায় আসে না। দাসত্বের ও নির্বাসনের জীবনে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় প্রবাসী পাঠাবার দুর্ণাম দ্রাবিড়দেশের রয়েছে। চরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই নিরুপায় পরবাসের দুরূহ সমস্যাটির স্বাভাবিক সমাধান হবে। রাজস্ব কিছু না দিতে হলেও শুধুমাত্র কৃষি দ্বারাই ভারতের সমগ্র দরিদ্র কৃষিজীবীর অন্ন জোগান সম্ভব নয়।

একজন বিদূষী সেবিকার তিরোভাব

১৯২১ সালে বেজওয়াদায় মহিলাদের একটি মহতী সভায় আমি খদ্দর পরিহিতা একটিমাত্র তরুণীকে দেখেছিলাম। সে সভার দায়িত্ব গ্রহণ ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে উৎসাহ ও দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিল। যতদূর মনে পড়ে সবচেয়ে আগে সে-ই তার মূল্যবান অলঙ্কার চুড়ি ও বেশ ভারী সোনার হার দান করে। সে যখন আমাকে তার ঐ গহনাগুলো দিচ্ছিল আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি "তুমি কি তোমার মা-বাবার অনুমতি নিয়েছো ?" সে উত্তর দিল "আমার মা-বাবা আমার কোন কাজে বাধা দেন না,—তারা আমার খুসীমত আমাকে কাজ করতে দেন।" অন্নপূর্ণা দেবী অবাধে ইংরাজীতে কথা বলল। কলকাতার বেথুন কলেজে সে পড়েছে। সে মহিলাদের ঐ বিরাট সমাগমে অর্থ সংগ্রহের জন্য গেল এবং অলঙ্কার আর টাকা নিয়ে এলো। তখন থেকেই সে এই আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে—বস্তুতঃ এই আন্দোলনেই নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। কোকোনদে স্বেচ্ছাসেবিকাদের সে ছিল অধিনায়িকা—সে সময় অনেকেই ভূয়সী প্রশংসা করে তার কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই যে সে সময়ে তার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না। শ্রীযুক্ত মগন্তী বাপি নীডু বি. এসসি.র সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। কোয়েম্বাটুরে থাকার সময় তার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে আমি একটি তারবার্তা পাই যে সে আর নেই। এখন শ্রীযুক্ত নীডুর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি তা থেকে আমি নীচের অংশগুলো উদ্ধৃত করছি।

"অবশেষে সেই প্রত্যাশিত আঘাত এলো। আমার দুর্ভাগ্য যে আমার এই প্রথম চিঠি আমার সঙ্গিনী ও আপনার প্রিয় কর্মী অন্নপূর্ণার অকাল মৃত্যুর মর্মান্তিক খবরটি বহন করবে। আপনার মাদ্রাজ ভ্রমণ কালে যখন আমরা দুজনেই শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের বাড়ীতে আপনাকে

শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলাম, আমার বেশ মনে পড়ে, তখন আপনি তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত রাখতে বলেছিলেন আর চিকিৎসার জন্য তাকে আমেদাবাদে পাঠাতে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার স্বাস্থ্যের জন্য আমি আপনাকে উদ্বিগ্ন করতে চাইনি। তাকে সর্বতোভাবে সেবা করবার যে নির্দেশ আপনি আমাকে দিয়েছিলেন আর মনে বল রাখতে ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে যে নির্দেশ আপনি তাকে দিয়েছিলেন—আমরা দুজনেই আপনার সে নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেছিলাম। মানুষের সাধ্য যা কিছু আমি তা সবই করেছি, কিন্তু হায়! বৃথাই।

“অন্নপূর্ণার মধ্যে আপনি আপনার অসহযোগ আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট বলিদান খুঁজে পাবেন। দেশের জন্য সে তার সর্বস্ব দিয়েছিল—তার মনিমুক্তা এমনকি ফিরে আসার পর আমি তাকে যে বিবাহ অঙ্গুরিটি দিয়েছিলাম তাও। বিবাহের যৌতুক, সর্বোত্তম বস্ত্রাদি, তার স্বাস্থ্য আর সবশেষে তার জীবন—সবই সে দিয়েছে।

“আপনার ওপর তার অশেষ আস্থা ছিল তাই সে অন্ধভাবে আপনার স্বাস্থ্য-নির্দেশ মেনে চলেছে। কেবল আপনার নির্দিষ্ট ফলাহারের অসম পথ্য যা সে ছ'মাস নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে তাতেই তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে – আর তা ভাল হলো না।

“মহাত্মাজী। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত হৃদয়হীন আমি নই। আমি শুধু ঘটনাটুকু বিবৃত করলাম। অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারকাজ করতে গিয়ে সে তার স্বাস্থ্যের খুব অবহেলা করেছিল। যে অপরাধের মাশুল দিতে হলো তার জীবন দিয়ে তার সেই অপরাধ যখন সে বুঝলো তখন খুবই দেরী হয়ে গ্যাছে। একটি চিঠিতে আপনি তাকে লিখেছিলেন—‘তুমি যে খদ্দর প্রচারের জন্য গভীর উৎসাহে কাজ করবে তা আমি সব সময়ই জানতাম’। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে আসার পর আমার পায়ের ওপর পড়ে সে প্রথম যে অনুরোধটি করে তা খদ্দর ব্যবহার প্রতিশ্রুতির অনুরোধ। আমার স্যুট, সার্ট ও অন্যান্য বিদেশী বেশভূষাগুলো আমি আর আমার নিজের বলে দাবী করতে পারতাম না। এমন কি এলোডে তার বাড়ীতে ওগুলো রাখবার অনুমতিও আমাকে দেওয়া হয়নি।

আমেরিকায় লেখা তার একটি চিঠিতে সে তার বিদেশী বস্ত্র বর্জন করার শপথ আর আজীবন খদ্দর পরার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছিল। এ বিষয়ে সে তার প্রতিজ্ঞা রেখেছিল। আমাকে এখন তার শপথের বাকি অর্ধাংশের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। বস্তুত অস্থিচর্মসার হয়েও মোটা খদ্দরের শাড়ীর জন্য শরীরে ক্ষত হওয়া সত্ত্বেও সে খদ্দর ত্যাগ করেনি। আমাদের সম্প্রদায়ের প্রথামত তাকে খদ্দরের শাড়ী পরিয়ে সৎকার করায় সে ভাগ্যবতী। বোধহয় মনে মনে তার এই ইচ্ছেই ছিল যে পরলোকেও সে খাদির প্রচার করবে।

"আমেরিকা যাবার সময় বিদায়কালে সে আমাকে এই বাণীটুকু দেয় 'তুমি আমাকেও ভুলে যেতে পার কিন্তু মাতৃভূমির কথা কখনও ভুলো না'। এক সময় কথাচ্ছলে সে আমাকে বলে যে তার এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার কিছুমাত্র বাসনা যদি তার থাকে তবে তা কেবলমাত্র দেশ সেবার জন্য—তার স্বামীসেবার জন্য নয়। আমরা যখন সব আশাই ছেড়ে দিয়েছি তখনও তার এই উচ্চাশাই তাকে বেশ কয়েকমাস বেঁচে থাকার শক্তি দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই আশাই তার ছিল। এমন কি ইনজেক্সন দেবার পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে শেষমুহূর্তেও সে ডাক্তারদের দৃঢ়তার সঙ্গে জানায় যে সে বাঁচবেই—মরবে না। মরবার জন্যই সে বেঁচেছিল আর মরেই সে দেশের জন্য বেঁচে রইল।

"নারীদের সম্বন্ধে তার অপ্রকাশিত রচনাবলী, রামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলীর বাংলা থেকে অনুবাদ আর তার কতকগুলো চিঠির যথাযোগ্য প্রচার আমরা করতে চাই।

"ঝাঁসির লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রিয় নামানুসারে দেওয়া আমাদের এই ছোট্ট ঝাঁসিই আমাদের একমাত্র আশা ও সান্ত্বনা। তার আশা ছিল যে এইখানে এসেই তার স্বাস্থ্যের বিস্ময়কর পরিবর্তন হবে। তার তিরোধানে এক স্থায়ী পরিবর্তনই এসেছে!

"এরকম একটি বিশ্বস্ত অনুগামী আপনি হারালেন। আমিও এক আদর্শ সঙ্গিনী হারালাম। আমার অর্ধাঙ্গিনী তার অপরাঙ্গকে রেখে গেলেন—বিষণ্ণ, নিরুৎসাহ ও উদাসীন—যে শূন্যতা তিনি রেখে গেছেন তা পূর্ণ করা যাবে না কখনও।"

এ বাস্তবিকই যথার্থ যে আমি কেবলমাত্র একজন বিশ্বস্ত অনুগামী হারাইনি—আরও অনেককিছু হারিয়েছি। ভারতবর্ষের সর্বত্র যে বহু কন্যালাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাদেরই একজনের বিয়োগ-ব্যথা আমি অনুভব করছি আর সে ছিল এই কন্যাদের সর্বোত্তমাদের একজন। তার বিশ্বাসে সে কখনও এতটুকুও বিচলিত হয়নি, প্রশংসা বা পুরস্কারের কোন প্রত্যাশা না করেই সে কাজ করে গিয়েছে। আমি আশা করি আরও অনেক বণিতাই অনাবিল ও একাগ্র সাধনায় অন্নপূর্ণাদেবীর মত আপন স্বামীর ওপর শান্ত অথচ অনমনীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন। মাতৃভূমির সেবার প্রয়াসে অন্নপূর্ণা দেবীর স্বাস্থ্যের অবক্ষয়ের জন্য আমার প্রতি তার মৃদু ভর্ৎসনাকে আমি প্রশংসাই করি। বহুকোটি মানুষের বিশ্বাসমত পুরাকালে ভারতবর্ষ যেমন স্বাধীন ও পুণ্যভূমি ছিল সেই ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বহু নরনারীর যে এই মহিয়সী মহিলার অনুকরণে কর্তব্যের বেদীতে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে—এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

নারী ও রত্নসম্ভার

তামিল নাড়ুর একজন মহিলা চিকিৎসক তার উপহারের সঙ্গে এর উল্লেখ করে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। আমার মনে হয় এই চিঠিটি তার উপহারের মূল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এটি অন্যের কাছে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ হবে সেই কারণে জায়গার নাম, রাজা ও দাতার নাম বাদ দিয়ে চিঠির বিষয়টি সংক্ষেপে নীচে উদ্ধৃত করলাম।

"দীর্ঘ বারো বছর আগে এখানকার রাজার উত্তরাধিকারীর জন্মের সময় আমার রাজসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ যে হীরের আংটি ও কানের দুল দুটি আমাকে দেওয়া হয়েছিল গতকাল পার্সেল করে আমি তা আপনার কাছে পাঠিয়েছি। এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আপনি এই জায়গা দিয়ে যাবার সময়েও রাজা আপনাকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ করার সাহসটুকুও যে পাননি এ জেনে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই, আর আমাকে বলা হয় যে সরকার-ভীতিই এর কারণ। আগে এই গহনাগুলো আমার সাথেই থাকতো, আপনি চলে যাবার পর এগুলো দেখে আমার মনোভাব যে কি হয়েছিল তা আপনি অনুমান করতে পারেন। এখন আমি যখন এগুলো দেখলাম আমার মনে এক ক্ষোভের সৃষ্টি হল আর এখানে থাকাকালীন যে বুভুক্ষু জনতার কথা আপনি বলেছিলেন আমার এই ক্ষোভ তাদের প্রতি সমবেদনায় রূপান্তরিত হল। আমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলাম 'জনসাধারণের' অর্থেই কি এই আভরণগুলো তৈরী হয়নি? এইগুলোকে নিজের বলে দাবী করার কি অধিকার আমার আছে? তারপরেই আমি এগুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত করি। খাদি প্রসারে আপনি তা ব্যবহার করতে পারেন –এতে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষের কয়েকজনের সহায়তা করতে পারবেন। আমার বাক্সের এককোণে এগুলো ফেলে রাখার চেয়ে এই ভাবে এর সদ্ব্যবহার হবে বলে আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি। আমার এক বন্ধু এগুলোর দাম ৫০০ টাকা ধার্য করেছেন ও অনুরূপ অর্থের জন্য

এগুলোকে বীমা করা হয়েছে। কি রকম পরিস্থিতিতে এগুলো আপনার কাছে পাঠানো হলো তা জেনে কোন মহানুভব ব্যক্তি এর ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশী দাম দেবেন বলে আমি আশা করি। আমার এই চিঠিটির ইচ্ছেমত ব্যবহার আপনি করতে পাবেন।"

অকারণে আমরা কল্পনায় কত আতঙ্ক সৃষ্টি করি তা লক্ষনীয়। অনেক রাজা আছেন যারা স্বেচ্ছায় খোলাখুলি ভাবে খদ্দরের অনুমোদন করেছেন আর আমার পত্রলেখিকার মতানুযায়ী যে দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে তারা অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন এরই মাধ্যমে তাদেরই সহায়তা করেছেন। একথা সত্যি যে খাদির একটি রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও আছে কিন্তু আমরা এখনও সেই অধ্যায়ে আসিনি যখন সরকার খাদি সমর্থনকে আইন অনুযায়ী অপরাধ বলে ঘোষণা করতে পারেন। পরহিতের জন্য যে কোন আন্দোলনই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত হতে পারে কিন্তু তাই বলে ঐ আন্দোলনে যেটুকু লোকহিতৈষী বৈশিষ্ট্য আছে তা বর্জন করা পরিতাপের বিষয়। তবে সত্যের খাতিরে একথা বলতে হবে যে ঐ মহিলা চিকিৎসক যে রাজার উল্লেখ করেছেন তিনিই একমাত্র লোক নন যিনি খাদির সমর্থন করতে বা আমার মত জনসেবককে সাধারণ সৌজন্য দেখাতে ভীত। অবশ্য এ ভালই হয়েছে যে রাজা আমাকে পরিহার করার ফলে এই দানের প্রেরণা এসেছে। কিন্তু আমি চাই যে যেসব বোনেরা ঘটনাক্রমে এই লেখাটুকু পড়বেন তারা যেন এটুকু উপলব্ধি করেন যে এই মহিলা দাত্রী যে অবস্থায় লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষুদের প্রতি নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তার সমকক্ষ হবার প্রয়োজন নেই। এটা অবশ্য সহজেই বোঝা উচিত যে যতদিন লক্ষ লক্ষ নরনারী কর্মাভাবে অন্নাভাবক্লিষ্ট থাকবেন ততদিন আমাদের এই বোনেদের দেহসজ্জার জন্য বা এগুলোর মালিক হবার আনন্দের জন্য বহুমূল্য মণিমুক্তার অধিকারী হবার কোন যুক্তি নেই। আমি এর আগেও

বলেছি যে ভারতীয় ধনী রমণীরা যদি তাদের সকল বাহুল্য বর্জন করে খাদির মাধ্যমে যতখানি সজ্জিতা হওয়া যায় তাতেই পরিতৃপ্তা হন তবে তাদের এই আচরণ সমগ্র জাতির ওপর, বিশেষ করে উপবাসী জনগণের ওপর, যে প্রচণ্ড নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করবে তা আমাদের হিসেবের মধ্যে না ধরলেও তাতে খাদি আন্দোলনের প্রয়োজনীয় সকল অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হবে।

নারী ও অলঙ্কার

খবরের কাগজে আমি একটি সমালোচনা দেখেছি যাতে অলঙ্কার দান করার জন্য নারীদের কাছে আমার আবেদন ও প্রাপ্ত দান-সামগ্রী নিলামে বিক্রি করা সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। বাস্তবিকই আমি চাই যে, যে হাজার হাজার বোনেরা আমার সভায় আসেন তারা তাদের সবটুকু যদি নাও হয় বেশীর ভাগ অলঙ্কার যেন দান করেন। এই দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক অর্ধভুক্ত—যেখানে শতকরা আশীভাগ লোক পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় না সেখানে গহনা পরা বাস্তবিকই লজ্জাজনক দেখায়। একজন ভারতীয় রমণীর নিজস্ব বলে নগদ অর্থ ক্বচিৎ থাকে। কিন্তু যে অলঙ্কার সে পরে আর যেগুলো তারই তাও তিনি তার প্রভু বা স্বামীর সম্মতি ছাড়া দান করতে চান না—সাহসও পান না। যা তার নিজস্ব তা কোন সংকাজে দান করলে তার সুনামই হবে। বিশেষ করে এইসব অলঙ্কারের মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যের চিহ্নমাত্র নেই, কতকগুলো তো সত্যি সত্যি কুৎসিত আর মলিনতার আধার। যেমন পায়ের মল, ভারী কণ্ঠহার, কেশবন্ধনী যা কেশ বিন্যাসের জন্য নয় বরং রুক্ষ অধৌত আর প্রায়ই দুর্গন্ধ কেশরাজির নিছক বাহার হিসেবে পরা হয় বা মণিবন্ধ থেকে কনুই পর্যন্ত চুড়ির সারি। আমার মতে মূল্যবান অলঙ্কার পরা দেশের পক্ষে ক্ষতিস্বরূপ। একে তো অনেক পরিমাণ অর্থ এতে আবদ্ধ হয়ে গেল উপরন্তু এ ব্যবহারে ক্ষয় পায়—যা আরও ক্ষতিকর। আত্মশুদ্ধির এই আন্দোলনে নরনারীর অলঙ্কার দান সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর বলে আমি মনে করি। যারা দেন তারা সানন্দেই দেন। আমার একটি অপরিবর্তনীয় সর্ত হলো এই যে, প্রদত্ত অলঙ্কারের বদলে নতুন কিছু পরা চলবে না। যে সব জিনিষ তাদের দাসত্বের বন্ধনস্বরূপ তা থেকে তাদের ভারমুক্ত

করতে উদ্বুদ্ধ করায় বাস্তবিকই মহিলারা আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। এবং শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে নয় পুরুষেরাও আপন পরিবারে সরলতা আনবার মাধ্যম রূপে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

সিংহলীয় মহিলাদের প্রতি

কলম্বোতে সৌখীন সিংহলীয় এক সমাবেশে গান্ধিজী ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ উপবাসী মানুষের জীবন বর্ণনা করে বলেন—

মহেন্দ্র যখন সিংহলে এসেছিলেন তখন তোমাদের মাতৃভূমির সন্তানেরা বুভুক্ষু ছিল না—ঐহিক বা পারত্রিক কোন ভাবেই নয়। আমাদের সৌভাগ্যসূর্য্য তখন উদীয়মান—আর তোমরা সেই সৌভাগ্যের অংশীদার ছিলে। কিন্তু আজ সেই সন্তানেরা উপবাসী তাই তাদের পক্ষে আমি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এসেছি। তোমরা যদি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা অস্বীকার না কর বরং এই আত্মীয়তার জন্য যদি কিছু গর্ব বোধ কর তবে শুধু অর্থ নয় অন্যান্য অনেক জায়গায় বোনেরা যেমন দিয়েছেন তেমনি অলঙ্কার ইত্যাদি তোমাদেরও দিতে হবে। যখনই মণিমুক্তায় বিভূষিতা বোনেদের আমি দেখি—আমার প্রলুব্ধ দৃষ্টি তখন সেই অলঙ্কারের ওপর পড়ে। অবশ্য অলঙ্কার ভিক্ষে চাওয়ার পেছনে একটি গূঢ় উদ্দেশ্যও আছে—সেটা হচ্ছে অলঙ্কার পরার মোহ থেকে মেয়েদের মুক্ত করা। আর তোমরা যদি অন্যান্য বোনেদের মত আমাকে খোলাখুলি কথা বলতে দাও তবে আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করবো—পুরুষের চেয়ে নারীর বেশী সাজসজ্জা করার হেতুটা কি ? মহিলা বন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, পুরুষদের খুসী করার জন্যই তারা এমন করেন। তবে আমি তোমাদের বলি যে, জগতের নানা বিষয়ে যদি তোমাদের যোগ্য দায়িত্ব নিতে চাও তবে পুরুষকে খুসী করবার জন্য বেশভূষা করতে অস্বীকার কর। আমি যদি মেয়ে হয়ে জন্মাতাম তবে মেয়েরা তাদের ক্রীড়নক হতেই জন্মেছে—পুরুষের এমন দম্ভ করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতাম। তোমাদের অন্তরে সহজেই প্রবেশ করার জন্য মনে মনে আমি মেয়েই হয়েছি। আমার স্ত্রীর অন্তরে আমি ততদিন কোন ঠাঁই পাইনি

যতদিন না আমি আগে যেমন ব্যবহার করতাম তার চেয়ে ভিন্ন আচরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর স্বামী হিসেবে আমার তথাকথিত বিশেষ অধিকারগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করে তাকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি। তাকে তোমরা আজ আমার মতই সাদাসিধে দেখতে পাবে। গলায় তার কোন কণ্ঠহার নেই—পরণে নেই কোন সৌখীন সজ্জা। আমি চাই তোমরা এইরকমই হও। নিজেদের খেয়াল-খুসীর দাস হতে বা পুরুষের ক্রীতদাসী হতে অস্বীকার কর। নিজেদের সুসজ্জিতা করতে পরাঙ্মুখ হও। সুগন্ধি বা ল্যাভেণ্ডার নির্যাসের জন্য লালায়িত হয়ো না—যদি সত্যিকার সৌরভই বিতরণ করতে চাও তবে তা তোমাদের অন্তর থেকে উৎসারিত হোক—তবেই তোমরা শুধু পুরুষ নয় সমগ্র মানবজাতিকে মুগ্ধ করবে। এই তোমাদের জন্মগত অধিকার। নারীই পুরুষের জননী—নারীর দেহ থেকেই তার দেহ—নারীর অস্থি থেকেই তার অস্থি। তোমরা আত্মসচেতন হও—নিজেদের বাণী আবার প্রচার কর।

এরপর তিনি নিষ্কলুষতায় নির্ভীক সীতার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন—উল্লেখ করেন কুমারী স্লেসিনেব দৃষ্টান্ত যিনি আপন পবিত্রতায় ও সহজাত নির্ভয়তায় দক্ষিণ আফ্রিকায় হাজার হাজার লোকের সম্ভ্রম অর্জন করেছিলেন যাদের মধ্যে দুর্ধর্ষ পাঠান দস্যু এমন কি অসৎ প্রকৃতির লোকও ছিল। সত্যকার সম্ভ্রম বলতে কি বোঝায় তা বর্ণনা করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

চা বাগানগুলোতে তোমাদের বোনেদের দুর্দশার কথা তোমরা জান কি? তাদের সঙ্গে বোনের মত আচরণ কর। তাদের মধ্যে যাও—তোমাদের নিজের গুণে ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে বেশী জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সেবা কর। তাদের সেবার মধ্যে তোমাদের যথার্থ সম্মান নিহিত আছে। তোমাদের নিজের পাড়ায় কি এরকম সেবার সুযোগ নেই? এমন পুরুষ আছে যারা দুর্বৃত্ত ও পানাসক্ত হওয়ায়

সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। তোমরা নির্ভয়ে তাদের মধ্যে যাও—তাদের পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনো—যেমন স্যালভেসন আর্মির মেয়েরা চোর, জুয়াড়ী ও মদ্যপদের আড্ডায় গিয়ে তাদের স্নেহ করে, অনুনয় করে সৎপথে ফিরিযে আনে। ঐ সেবার কাজ তোমাদের এখনকার সৌখীন সাজসজ্জার থেকে অনেক বেশী সুসজ্জিতা করে তুলবে। তোমরা এইভাবে যে অর্থ সঞ্চয় করবে আমি হব তার অছি—আর দরিদ্রদের মধ্যে তা আমি বিতরণ করবো।

আমার এই অসম্বদ্ধ সংলাপ তোমাদের মনে যেন লেগে থাকে আমি এই প্রার্থনা করি।

সুনির্দিষ্ট ত্যাগ স্বীকার কর

হরিজন কল্যাণে গান্ধিজীর পরিভ্রমণকালে মাদ্রাজে একটি মেয়ে তাঁর স্বাক্ষরের জন্য পাঁচ টাকার একটি নোট তাঁকে দেয়।

গান্ধিজী বললেন—"না, একটি বালা।" মেয়েটি তার দুটি বালাই খুলে দিল—নোটটিও দিল।

"এগুলো বিলিয়ে দিতে তোমার মা-বাবার মত আছে তো? ইচ্ছে করলে তুমি বালাজোড়া ফিরিয়ে নিতেও পার।"

স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দেবে বলে মেয়েটি একটি বালা ফেরৎ নিল।

"তুমি তোমার বাবা-মাকে আর একটি নতুন বালা গড়িয়ে দিতে বলবে না?"

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব এলো—"না"।

"বেশ তবে এটি আমাকে দিয়েই দাও।" মেয়েটিও হাসতে হাসতে চলে গেল।

আর একটি মেয়ে বললে "বাবার অনুমতি না নিয়ে আমি কোন কিছু দান করি কি করে?"

গান্ধিজী বললেন—"না, তা হয়তো পারো না। কিন্তু সবটুকু স্বাধীনতা কি তোমার বাবা নিজের জন্যে রেখে দিয়েছেন—তোমাকে কিছুই দেননি?"

একটি নবোঢ়া বললে—"টাকা আমি আপনাকে দেব কিন্তু আমার অলঙ্কার নয়। কেননা গহনা যদি আমি দিই তবে আমি নিশ্চয়ই তা আবার গড়িয়ে নেব আর সেটা আপনার পছন্দ নয়। গহনা আমি আপনাকে তখনই দেব যখন আমি তা আপনাকে একেবারেই দিতে পারবো।"

গান্ধিজী বললেন—"তুমি ঠিকই বলেছো। আমি তোমার

টাকাও চাই না। চাইলে টাকা আমি তোমার বাবার কাছেই পাবো। আমি তোমার কাছ থেকে তোমার গহনাই চাই। সর্ত এই যে ওগুলো আবার নতুন করে গড়িয়ে নেওয়া হবে না। আমি ধৈর্য ধরে সেদিনের অপেক্ষা করবো যেদিন তুমি স্বেচ্ছায় তোমার অলঙ্কার আমার হাতে সমর্পণ করবে।”

ভিজাগাপট্টমে মহিলাদের কাছে একটি সুনির্দিষ্ট ত্যাগ স্বীকারের জন্য তিনি গভীর আবেগময়ী ভাষায় আহ্বান জানান। তিনি বলেন—

“হরিজনদের বিষয়টি আগুণের মত। যত ঘি তুমি আগুণে ঢালবে আরও ঘি তখন চাইবে আগুণ। তেমনি হরিজনদের কল্যাণে যত দেবে আরও দানের দাবী আসবে। এই উদ্দেশ্যে যারা দেন তারা লাভবানই হন—লোকসান কখনও তাদের হয় না, আর যারা দেন না তারা নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হন। যা তোমরা লাভ করবে তা হলো পুণ্য আর না দিলে তোমরা নিজেকেই হারাবে। কারণ হিন্দুদের মধ্যে সর্বজাতির স্ত্রীপুরুষেরা যুগ যুগ ধরে হরিজনদের ওপর নির্যাতন করে এসেছে। আজ যদি আমরা দুঃখের মধ্যে দিন কাটাই আমি নিশ্চিত জানি যে হরিজনদের প্রতি আমাদের আচরণ তার জন্য কম দায়ী নয়। সেইজন্যই আমি ভারতের নারীদের বলে চলেছি যে অস্পৃশ্যতার ভূতকে মন থেকে তাড়িয়ে দাও। আমাদের চেয়ে কেউ নীচ এ চিন্তা অন্যায়—এ পাপ। ভগবানের রাজত্বে কেউ নীচও নয় উঁচুও নয়। আমরা সবাই তাঁর সন্তান—বাবা-মার চোখে যেমন সব সন্তানই সর্বতোভাবেই সমান তেমনি ঈশ্বরমানসে তাঁর সকল সৃষ্টিই নিশ্চয়ই সমান। সেই জন্য আমি যখন বলি যে ধর্মে অস্পৃশ্যতার কোন অনুমোদন নেই—তখন তোমরা আমায় বিশ্বাস কোরো। এই অনুরোধ আমি তোমাদের কাছে করি, তোমাদের আশেপাশে যত হরিজন আছে তাদের সকলের জন্য মনে একটু ঠাঁই রেখো, তোমাদের বাড়ীতে হরিজন শিশুদের সাদরে ডাকো,

হরিজন পাড়ায় যাও—তাদের ছেলেমেয়েদের, তাদের ঘর বাড়ীর পরিচর্যা কর—নিজের বোনের মত হরিজন নারীদের সঙ্গে আলাপ কর।

হরিজনদের সম্বন্ধে এই দায়িত্ব মূলতঃ ভারতীয় নারীদেরই বহন করতে হবে—এবং আমি আশা করি এই এলাকায় হিন্দু রমণীরা তোমাদের কর্তব্য যথাযথ পালন করবে। আমি আশা করি যে তোমাদের মধ্যে যাদের নিজের অলঙ্কারের সবটুকু বা খানিকটা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করার বাসনা বা সামর্থ্য আছে তারা তা করবে। কিন্তু এই দানের একটি সর্ত আছে। তোমরা যাই কেননা দান কর তা নতুন করে আর সংগ্রহ করবে না। আমি চাই যে তোমাদের এই ভাব আসুক যে ব্যক্তিগতভাবে তোমরা এই ব্রতে কিছু দান করেছো। টাকা বা নোট যখন দাও তখন তোমাদের সেই ভাব আসতে পারে না কেননা ওগুলো হয় তোমাদের বাবা, মা বা স্বামীদের কাছ থেকে পাওয়া। কিন্তু অলঙ্কার তোমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। যখন তোমরা স্বামী বা বাবা-মাকে দিয়ে নতুন করে গড়িয়ে নেবার কোন চিন্তা না করে তোমাদের অলঙ্কার দান কর তখন সেটা তোমাদের এক সুনির্দিষ্ট ত্যাগ স্বীকার। আমি চাই তোমাদের কাছে আমার এই আহ্বানের মর্মার্থ যারা বুঝেছো তারা সবাই এই সুনির্দিষ্ট ত্যাগ স্বীকার করবে।

নারীর প্রকৃত ভূষণ

হরিজন কল্যাণে মহীশূর ভ্রমণকালে মহিলাদের সভায় গান্ধিজী এই বলে ভাষণ দেন—

"নারীব প্রকৃত ভূষণ হলো তার চরিত্র—তার পবিত্রতা। ধাতু বা প্রস্তর কখনও তার প্রকৃত ভূষণ হতে পারে না। সীতা বা দময়ন্তীর মত নারীদের নাম যে আমাদের কাছে পবিত্র বলে মনে হয় তা তাদের নিষ্কলুষ সতীত্বের জন্য—কোন মণি-মুক্তোর জন্য নয়—যদিই বা তারা তা পরে থাকেন। তোমাদের কাছ থেকে আমার অলঙ্কার ভিক্ষে করার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। অনেক বোন আমাকে বলেছেন যে অলঙ্কার থেকে ভারমুক্ত হয়ে তারা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।" অন্য একটি সভায় তিনি বলেছিলেন, "একটি নয়, একাধিক কারণে দানকে আমি পুণ্যকর্ম বলে অভিহিত করেছি। নারী বা পুরুষ কারুরই কোন সম্পদের অধিকারী হবার দাবী থাকে না, যদি না তিনি ঐ সম্পদের একটি ন্যায্য অংশ দরিদ্র ও অসহায়কে দান করেন। এ একটি সামাজিক বা ধর্মীয় কর্তব্য—ভগবদ্‌গীতায় একে বলা হয়েছে ত্যাগ। যিনি এই ত্যাগ স্বীকারে পরাঙ্মুখ তাকে চোর বলা হয়। গীতায় অবশ্য বহু প্রকারের ত্যাগের বিধান আছে, কিন্তু দরিদ্র বা অভাবীর সেবা করার চেয়ে মহত্তর ত্যাগ আর কি হতে পারে? আজকাল উঁচু-নীচুর পার্থক্য ভুলে যাওয়া আর মানুষের মধ্যে সাম্যের উপলব্ধির চেয়ে আমাদের পক্ষে আর কোন ত্যাগই মহত্তর হতে পারে না। ভারতীয় নারীদের আমি একথাই বোঝাতে চাই যে ধাতু বা প্রস্তরখণ্ডে দেহকে ভারাক্রান্ত করায় যথার্থ অলঙ্করণ হয় না—অন্তরের শুদ্ধি ও আত্মার মাধুর্য বিকাশেই তা সম্ভব।"

স্বর্গীয়া শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী যিনি অন্ধ্রপ্রদেশে তার ভগিনীদের

কাছে সর্বপ্রথম সেবা ও আত্মোৎসর্গের এক মহান্ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তার ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে গান্ধিজী অন্য এক উপলক্ষে বলেছিলেন—"আমার সঙ্গে দেখা হবার প্রথম দিনেই তিনি তার একটি নয় সমস্ত অলঙ্কারই খুলে ফেলেন। অন্য মহিলারা যারা এই দৃশ্য দেখেছিলেন তারা ঘটনাটি দেখে বিমূঢ় হয়ে যান। আর তার পরেই অলঙ্কার বর্ষণ সুরু হয়। তোমরা কি মনে কর যে সব অলঙ্কার বিলিয়ে দেওয়ায় তাকে কম সুন্দর দেখাচ্ছিল? বরং আমার চোখে তাকে বেশী সুন্দর মনে হলো। ইংরাজী ভাষায় প্রবাদ আছে, 'সুন্দর সে যে সুন্দর করে'।"

—সি. এস

কৌমুদীর আত্মত্যাগ

বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এই কর্মব্যস্ত জীবনে বহু মর্মস্পর্শী ও করুণ দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু এই প্রবন্ধ রচনার সময় হরিজনদের বিষয়টির মত করুণ কিছু আমার মনে পড়ে না। বাডাগাড়ায় আমি আমার বক্তৃতা মাত্র শেষ করেছি। ঐ বক্তৃতায় উপস্থিত মহিলাদের কাছে অলঙ্কার দান করার জন্য আমি যুক্তি দিয়ে আবেদন করেছিলাম। বক্তৃতা শেষ করে দান পাওয়া জিনিষগুলো বিক্রি করছি এমন সময় ষোড়শ বর্ষীয়া কৌমুদী আস্তে আস্তে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলো। সে একটি বালা খুলে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি আমার স্বাক্ষর দেব কিনা। স্বাক্ষর দেবার জন্য তৈরী হচ্ছি এমন সময় অপর বালাটিও খুলে নিল। তার প্রতি হাতে একটি করেই বালা ছিল। আমি বললাম, "তোমার দুটিই দেবার দরকার নেই। মাত্র একটি বালার জন্য তোমাকে আমি স্বাক্ষর দেব।"

তার সোনার হারটি খুলে সে এর উত্তর দিল। এ কাজ খুব সহজ ছিল না। তার লম্বা বিনুনী থেকে সেটাকে ছাড়িয়ে নিতে হল। কিন্তু সে একজন মালাবারী তরুণী—কয়েক হাজার বিস্মিত নব-নারীর সামনে এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে তার কোন মিথ্যা সঙ্কোচ ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম—"কিন্তু তোমার বাবা-মার মত আছে তো?" সে কোন উত্তর দিল না। তার পূর্ণ ত্যাগের কাজ তখনও শেষ হয়নি। তার হাত দুটি আপনা থেকেই তার কানে গিয়ে পৌঁছল আর উপস্থিত জনসাধারণ যাদের আনন্দের অভিব্যক্তিকে আর রোধ করা গেল না তাদের জয়ধ্বনির মাঝে মুক্তোখচিত মাকড়ী দুটিও খোলা হয়ে গেল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম যে এইভাবে ত্যাগ স্বীকারের বিষয়ে তার বাবা-মার

অনুমতি আছে কিনা। ঐ লাজুক মেয়েটির কাছ থেকে কোন উত্তর আসবার আগে একজন আমাকে জানালেন যে তার বাবা এই সভায় উপস্থিত আছেন এবং যে মানপত্রগুলো আমি নীলামে বিক্রি করছিলাম সেগুলো ডাক দেবার ব্যাপারে তিনিই আমার সহায়তা করছিলেন, আর যোগ্য কাজে দান করার বিষয়ে তিনি তার মেয়ের মতই উদার। আমি কৌমুদীকে মনে করিয়ে দিলাম যে এই গহনার বদলে নতুন গহনা গড়ানো চলবে না। সে দৃঢ়ভাবে এ সর্ত মেনে নিল। তাকে স্বাক্ষরটি দেবার সময় আমি এই মন্তব্যটুকু না লিখে পারিনি—"তোমার পরিত্যক্ত অলঙ্কারের চেয়ে তোমার আত্মত্যাগই সত্যকার ভূষণ।" তার এই ত্যাগ স্বীকার প্রকৃত হরিজন সেবিকার আন্তরিকতার নিদর্শন হোক।

কৌমুদীর তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত

ষোড়শবর্ষীয়া মালাবারী তরুণী কৌমুদীর আত্মত্যাগের সম্বন্ধে গান্ধিজী লিখেছেন। কালিকটে গান্ধিজীর অবস্থানের শেষ দিনে সে তার বাবার সঙ্গে গান্ধিজীকে দর্শন করতে আসে। বাডাগাড়ায় আমি গান্ধিজীর সঙ্গী ছিলাম না। তাই কৌমুদীকে আমি এই প্রথম দেখলাম। তার মধ্যে কোন কপটতা ছিল না। সে খুব লাজুক, নম্র আর আস্তে আস্তে কথা বলছিল। ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সে পড়াশোনা করেছিল তাই আলোচনা বেশ সহজেই বুঝতে পারছিল। গান্ধিজী তার আত্মত্যাগ সম্বন্ধে আরও জানতে চান। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে ত্যাগের সঙ্কল্প নিয়েই কি সে সভায় এসেছিল না ঐ সভাতে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয়।

তার বাবা উত্তর দিলেন—"সে বাড়ীতেই তার মন স্থির করে —আমাদের অনুমতিও সে নেয়।"

"কিন্তু তোমার কোন গহনা না দেখে তোমার মা কি দুঃখ পাবেন না ?"

"পাবেন, কিন্তু আমাকে তা আবাব পরতে বাধ্য করবেন না বলে আমার বিশ্বাস"—কৌমুদী বলল।

"কিন্তু সময়কালে যখন তোমার বিয়ে হবে তখন হয়ত তোমার স্বামী তোমাকে নিবাভরণা দেখতে নাও পছন্দ করতে পারেন। তখন তুমি কি করবে ? আমার নিজের মনেও নীতিগতভাবে কিছু দ্বিধা আছে। হরিজন পত্রিকায় তোমার ত্যাগের বিষয়ে আমি যে প্রবন্ধটি লিখেছি তা সত্যই মনোরম। সেই প্রবন্ধে আমি বলেছি যে তুমি আর কোনদিন গহনা পরবে না। তুমি যদি তার জন্য প্রস্তুত না থাকো তবে প্রবন্ধের সেই অংশটুকু আমাকে বদলে দিতে হবে ; অথবা তোমার ভাবী স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমাকে

অনমনীয় হতে হবে। অবশ্য তোমার মত মালাবারী তরুণীর পক্ষে এ করা সম্ভব। কিংবা তোমাকে এমন স্বামী নির্বাচন করতে হবে যিনি নিরাভরণা হলেও তোমাকে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হবেন। তুমি অসঙ্কোচে তোমার মনের ভাব আমাকে বলতে পার।"

কৌমুদী ধীরে ধীরে গান্ধিজীর বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন করলো। তাকে যে কাজটি করতে বলা হলো তা সত্যিই কঠিন। তাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নিতে হলো। কিছুক্ষণ সে চিন্তা করলো আর একটিমাত্র বাক্যই উচ্চারণ করলো—"আমাকে গহনা পরতে বাধ্য করবেন না এমন স্বামীই আমি নির্বাচন করবো।"

গান্ধিজীর চোখ দুটি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন—"আমার অন্নপূর্ণা ছিল। সে বিবাহিত ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার সব অলঙ্কার ত্যাগ করেছে। আর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে তার এই অঙ্গীকার রেখে গেছে। এখন আমি তোমাকে পেলাম।" এর পর থেকে গান্ধিজী মহিলাদের কাছে কৌমুদীর মহৎ আত্মত্যাগের বিবরণী দিতে কখনও ক্লান্তি বোধ করেননি।

আর একটি মহৎ ত্যাগ

ত্রিবান্দ্রামে অনেক দর্শনপ্রার্থীর মধ্যে সতেরো বছরের একটি মেয়েও ছিল। সে গান্ধিজীর সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কে?"

"একটি ছোট্ট মেয়ে।"—সে উত্তর দিল।

"ছোট্ট মেয়ের গহনার দরকার কি?" সে অনেক অলঙ্কার পরে আছে গান্ধিজী লক্ষ্য করেছিলেন। মীনাক্ষী উত্তর দিল—"কারণ আমি মেয়েই থাকতে চাই।"

"তবে তোমার গহনা পরা উচিত নয়"—গান্ধিজী কৌমুদীর ত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করলেন।

"কৌমুদীর বয়স ষোল বছর—তোমার চেয়ে এক বছরের ছোট তা সত্ত্বেও সে তার সব অলঙ্কার ত্যাগ করেছে।"

মীনাক্ষীর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বললো—"আমিও অলঙ্কার দিতে চাই।"

"তোমার বাবার মত আছে তো?"

"আমি তা পাবো।"

"মালাবার মেয়েরা স্বাধীন আমি তা জানি।"

"আমি কি এটি আপনাকে দেব?"

"হ্যাঁ, হরিজনদের জন্য।"

"আমারও তাই ইচ্ছে।"

"তুমি যদি আমাকে সত্যিকার হরিজন বলে মনে কর তবে আমাকে এটি দাও। যদি মনে কর আমি একটি বাচাল তাহলে দিও না। আমি সব মেয়েদের নিজের অলঙ্কার ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ করি। আমি জানি একটি মেয়ের পক্ষে এ করা কত কঠিন। সমাজে কত রকমের সৌখীনতাই আজকাল আছে। আমি বলি সেই ভাল যে ভাল করে।"

"আমি নিজেকেও যদি আপনার কাছে সমর্পণ করি ?"

"হ্যাঁ, তোমার বোনকে পেয়েছি—এবার তোমাকে পেলাম।"

"তা বেশ, সেই কথাই রইল।"

"তা সত্ত্বেও তোমাকে ভাববার জন্য আমি একরাত্রি সময় দিলাম।"

পরদিন সকালবেলা মীনাক্ষীকে যখন দেখলাম তখন সহজে তাকে আমি চিনতে পারিনি। অঙ্গে তার কোন অলঙ্কারই নেই। তাকে জিজ্ঞেস করলাম—"তোমার গহনাগুলো কোথায় ?"

"সে সব দিয়ে দিয়েছি।"

"গান্ধিজীকে ?"

সে বলল—"না, তা পারিনি। আমার বাবার ঋণ আছে তাই অলঙ্কার আমি দিতে পারি না। কিন্তু তা আর কখনও পরব না বলে মন স্থির করেছি।"

"তোমার এই পরিবর্তনে তোমার বাবা-মা সম্মত হয়েছেন ?"

"বাবা হয়েছেন, কিন্তু মার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন।"

দিনের শেষে মীনাক্ষী তার বাবা-মার সঙ্গে গান্ধিজীর কাছে এসে হরিজন উদ্দেশ্যে তাঁকে একটি সোনার বালা আর কণ্ঠহার দান করলো। গান্ধিজী ঋণের কথা আগেই জানতেন। তিনি তার মা-বাবাকে বললেন—"এগুলো তোমরা না দিলেও পার। মীনাক্ষীর পরিত্যক্ত অলঙ্কার দিয়ে তোমরা যতটা পার ঋণ শোধ কর। সে আর কখনও এসব চাইবে না।"

মীনাক্ষীর গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো। তার আবেগ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। সারা জীবনের জন্য সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

গান্ধিজী তার মাকে জিজ্ঞেস করলেন—কেন তিনি তাঁর কন্যার মহৎ সঙ্কল্পে মত দিতে পারছেন না।

মা বললেন—"তার বিয়ে দিতে হবে। অলঙ্কারবিহীনা তাকে

নিয়ে সন্তুষ্ট হবে এমন স্বামীও খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হবে।”

গান্ধিজী তার আশঙ্কা দূর করে বললেন—“সে বিষয়ে তোমার ভাবনার প্রয়োজন নেই, সময়মত আমিই তোমাকে মীনাক্ষীর জন্য একজন নয় পঞ্চাশজন প্রার্থী খুঁজে দেব—তুমি তাদের মধ্যে থেকে যে কোন একজনকে পছন্দ করে নিও।”

মা তখন মীনাক্ষীর সঙ্কল্পে আশীর্বাদ করলেন। দৃশ্যটি মর্মস্পর্শী ছিল। মহৎ ত্যাগের এরকম দৃষ্টান্তই কষ্টের মাঝে জীবনকে সহনীয় রাখে—প্রাণশক্তি যোগায়। অজ্ঞতার যে অন্ধকারে অস্পৃশ্যতার মত পাপ বেঁচে থাকে তা দূর করতে ও ত্যাগের ভাবকে সঞ্জীবিত রাখতে মীনাক্ষী আর কৌমুদীর সর্বস্ব ত্যাগ যেন সহায়ক হয়।

নারী ও অস্পৃশ্যতা

হরিজন কল্যাণে পরিভ্রমণকালে বিভিন্ন মহিলা-সভায় গান্ধিজীর দেওয়া ভাষণ থেকে নীচের অংশগুলো উদ্ধৃত হলো।

বিলাসপুরে

আমি চাই হরিজন কল্যাণে তোমরা বোনেরা যতটা পার দাও। তোমাদের দেওয়া মানপত্রে কিভাবে তোমরা হরিজনদের সেবা করতে পার আমাকে আগে জিজ্ঞেস করেছো। আমার ইচ্ছে, সবার আগে তোমাদের মন থেকে অস্পৃশ্যতাবোধ দূর কর, নিজের সন্তানের মত হরিজন শিশুদের যত্ন কর, আপন পরিজনের মত তাদের ভালবাস কেননা ভারতমাতার সন্তান তারা—তোমাদের নিজের ভাই-বোনেরই মত। ত্যাগ ও সেবার জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে আমি নারীকে পূজো করি। নিঃস্বার্থ সেবার যে মনোভাব প্রকৃতি তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে পুরুষ কখনও তাতে তোমাদের সমতুল্য হতে পারে না। নারীর এমন একটি সংবেদনশীল মন আছে যা যে কোন দুঃখ ভোগের দৃশ্যে বিগলিত হয়। অতএব হরিজনদের দুর্দশা যদি তোমাদের মনে সাড়া জাগায়—উঁচু-নীচু, ভেদাভেদের সঙ্গে অস্পৃশ্যতাকেও যদি তোমরা বিসর্জন দাও তবে হিন্দুধর্ম নির্মল হবে—আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে হিন্দু সমাজের গতি দ্রুত হবে। কেননা পরিণামে এর অর্থ সমগ্র ভারতবর্ষ অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ কোটি নর-নারীর কল্যাণ, আর মানব জাতির এই এক-পঞ্চমাংশ যে অভূতপূর্ব চিত্তশুদ্ধির প্রচেষ্টায় লিপ্ত হবে তা সমগ্র মানব সমাজের ওপর এক কল্যাণময় প্রভাব না এনে পারে না। এই আন্দোলনে এক সুদূর-প্রসারী শুভ সম্ভাবনা নিহিত। এ আন্দোলন বিরাট—আত্মশুদ্ধির বিষয়ে বর্তমানে বোধ হয় এ তুলনাহীন। আমি আশা করি যে তোমরা এতে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করবে।

দিল্লীতে

স্বষ্টিকর্তা ঈশ্বরের বিচারে তাঁর সব স্বষ্টিই সমান। মানুষে মানুষে কোন উঁচু-নীচু পার্থক্য যদি তিনি স্বষ্টি করতেন তবে একটি হাতী ও পিঁপড়ের পার্থক্যের মত তা প্রকাশ্যে দেখা যেত। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই প্রতিটি মানুষকে তিনি একই আকার—একই প্রাকৃতিক প্রয়োজন দিয়েছেন। আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করে বলেই যদি তোমরা হরিজনদের অস্পৃশ্য বলে মনে কর তবে এমন কোন্ মা আছেন যিনি তাঁর সন্তানের জন্য অনুরূপ কাজ করেন না? সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেবক এই হবিজনদের অস্পৃশ্য তথা জাতিচ্যুত কবা চবম অবিচার। হিন্দু বোনেদেব মনে এ বিষয়ে অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যই আমি এভাবে পরিভ্রমণ করছি। কোন মানুষকে নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে অবহেলা করা কখনও কোন সৎকাজ হতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজো করলেও একই ঈশ্বরের পূজারী আমরা। অতএব এই মূলগত ঐক্যের উপলব্ধি আমাদের করতেই হবে। আর মানুষের মধ্যে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতা ত্যাগ কবতেই হবে।

মাদ্রাজে

তোমাদের একটি কাজ করতে বলার জন্যই আমি এখানে এসেছি। কেউ উঁচু কেউ নীচু এ নিঃশেষে ভুলে যাও। নিঃশেষে ভুলে যাও কেউ স্পৃশ্য, কেউ অস্পৃশ্য। আমি জানি যে তোমরা আমার মতই ঈশ্বরে বিশ্বাস কর আর সেই ঈশ্বর পুরুষে-পুরুষে বা নারীতে-নারাতে কোন ভেদাভেদ স্বষ্টি করবার মত অবিবেচক বা নিষ্ঠুর হতে পারেন না। এই অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের একটি বিরাট কলঙ্ক, আর আমার বলতে বাধা নেই যে, যদি অস্পৃশ্যতা বেঁচে থাকে তবে হিন্দুধর্ম মরবেই। ঈশ্বর সম্বন্ধে যদি মানুষের ভাষায় বলতে হয় তবে বলা যায় যে আমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বর অত্যন্ত ক্ষমাশীল। কিন্তু

আমি কোন রকম ইতস্ততঃ না করে বলতে পারি যে ঈশ্বরেরও ক্ষমাশীলতার শেষ আছে। ভারতের হিন্দু সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের এই অবিচার তিনি আর ক্ষমা করবেন না।

বাঙ্গালোরে

আমরা যখন মনে করি যে কোন কোন লোক আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট তখনই আমাদের মধ্যে গুরুতর পাপ ঢুকেছে বোঝা যায়। যদি আমরা সেই পাপ দূর না করি তবে তা আমাদের গ্রাস করবে। প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য একজন হিন্দুও তখন অবশিষ্ট থাকবে না। আর যদি অদৃষ্ট আমাদের তাই হয় তবে তা আমাদের যোগ্য শাস্তিই হবে। শুধুমাত্র এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করতেই আমি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যদি হরিজনদের নিজের ভাই-বোনের মত গ্রহণ কর তবে তোমরা একটি বিশেষ পুণ্যের কাজ করবে।

মহীশূরের হরিজন আবাসগুলোর তুলনায় অন্য কয়েকটি হরিজন আবাসের শোচনীয় পার্থক্য দেখবার পর একটি সভায় তিনি এই বলে ভাষণ দেন —

আমি এই নীতিতে বিশ্বাস করি যে অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার আমরা আশা করি অন্যের প্রতিও আমাদের সেই ব্যবহারই করা উচিত। আজ সকালে যে কয়েকটি খুপরী আমি দেখে এলাম তা মানুষের বাসের যোগ্য নয়। জীবন ধারণের একটি ন্যূনতম মান আছে—তার নীচে যেতে আমরা সাহস করি না কেননা তাতে মানবসমাজের অবমাননা হয়। আমি যে খুপরীগুলো দেখলাম সেগুলো এই ন্যূনতম মানদণ্ডের নীচে। অন্য অনেক দিকে সুন্দর এই জায়গাটির এই কলঙ্ক আমি চাই যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করা হয়। আমাকে অবশ্য বলা হয়েছে যে এই সব হতভাগ্য ভাই-বোনদের জন্য উন্নততর বাসগৃহের ব্যবস্থা করা হয়েছে

কিন্তু এরকম সহায়তার সময়ে তৎপরতা যে বিশেষ প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তোমরা নিশ্চয়ই একমত হবে। তোমাদের সব ব্যবস্থাই যখন ঠিক আছে তখন যেন আর শোনা না যায় যে অনেক দেরী হয়ে গেল।

নারীদের সহিত সরল সংলাপ

হরিজন কল্যাণে পরিভ্রমণকালে বারানসীতে মহিলা-সভায় প্রদত্ত তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতায় গান্ধিজী অস্পৃশ্যতার বিষয়ে তাঁর মনোভাবের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

এটা পরিতাপের বিষয় যে খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলা বা উঁচু-নীচু এই ভেদাভেদ-বোধ আঁকড়ে ধরা ছাড়া আজকাল আমাদের ধর্ম বলতে আর কিছুই নেই। আমি তোমাদের বলতে চাই যে এর চেয়ে বেশী অজ্ঞতা আর হতে পারে না। জন্ম অথবা কতকগুলো বিধিনিষেধ মেনে চলায় কারো কৌলীন্য বা হীনতা নিরূপিত হয় না। কেবলমাত্র চরিত্রবলেই তা নির্ধারিত হয়। ভগবান মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনত্বের ছাপ দিয়ে সৃষ্টি করেন না। আর কোন ধর্মপুস্তকে যদি কোন মানুষকে তার জন্মের কারণে হীন বা অস্পৃশ্য করে সৃষ্টি করে তবে তা আমাদের অনুসরণের যোগ্য নয়। এ দ্বারা ঈশ্বরকে এবং সত্য যা ঈশ্বরেরই নামান্তর তাকে অস্বীকার করা হয়। ভগবান যিনি ন্যায়, সততা ও সত্যের প্রতীক তিনি নিশ্চয়ই এমন কোন ধর্ম বা আচার অনুমোদন করেননি, যা আমাদের এই বিরাট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশকে অস্পৃশ্য বলে নির্দেশ দেয়। এরকম একটি উদ্ভট ধারনা থেকে তোমরা নিজেদের মুক্ত করবে এই আমি চাই। অপরিচ্ছন্ন কাজে অস্পৃশ্যতাবোধ সংশ্লিষ্ট রয়েছে—আর তা থাকবেই। এ আমাদের সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা ময়লা বা নোংরা গা থেকে ধুয়ে ফেলে পরিষ্কার হই তখন আর আমরা অস্পৃশ্য থাকি না। কিন্তু কোন একটি কাজ বা আচরণ কোন নারী বা পুরুষকে চিরজীবনের জন্য অস্পৃশ্য করতে পারে না।

আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পাপী আর আমাদের প্রত্যেকটি ধর্ম-

পুস্তক গীতা, ভাগবৎ ও তুলসী-রামায়ণে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে যিনি ঈশ্বরের স্মরণ নেন বা তাঁর নাম ভজনা করেন তিনি সব পাপ থেকে মুক্ত হন। এ নির্দেশ সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রযোজ্য।

আমি চাই আর একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে তোমরা এই সমস্যাটির বিচার করবে। মানুষ বা মনুষ্যেতর প্রত্যেকটি প্রাণীর কোন না কোন বিশেষ চিহ্ন আছে যার দ্বারা তোমরা বলতে পার কে মানুষ আর কে জন্তু, কোন্‌টি কুকুর আর কোন্‌টিই বা গরু। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের দেহে এমন কোন বিশেষ চিহ্ন আছে কি যার দ্বারা তাদের অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করা যায়? আমাদের প্রত্যেকের মতন তারাও মানুষ। আর মনুষ্যেতর প্রাণীদেরও তো আমরা অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করি না। অতএব এই উদ্ভট অবিচার কেন, আর কোথা থেকেই বা এলো? এ ধর্ম নয় বরং অধর্মের এক নিকৃষ্ট নিদর্শন। তোমাদের মধ্যে যদি এই পাপ আজও থাকে তবে তোমরা তা থেকে বিমুক্ত হও—এই আমি চাই।

এই শতাব্দীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমরা একটি উপায়েই করতে পারো তা হলো হরিজনদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে, তাদের পল্লীতে গিয়ে তাদেব শিশুদের নিজের সন্তানের মত আদর করে, তাদের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে আর পর্যাপ্ত খাদ্য, নির্মল পানীয় জল বা উন্মুক্ত আলো-বাতাস—যা তোমরা স্বাধিকারে ভোগ কর তা তারা সমভাবে পায় কিনা সে বিষয়ে খোঁজ করে। আর একটি উপায় আছে তা হলো তোমাদের প্রত্যেককে সূত্রযজ্ঞ করতে হবে আর যে খাদি এই অবহেলিত লক্ষ লক্ষ নর-নারীর সহায়তা করে সেই খাদি পরতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। সূত্রযজ্ঞের মাধ্যমে কিছুটা অন্ততঃ তোমরা তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে আব যতটুকু খদ্দর তোমরা পরিধান করবে তার ফলে ততটুকু পরিমাণ কয়েকটি পয়সা হরিজন ও দরিদ্রদের আয় হবে। পরিশেষে তোমরা হরিজন ভাণ্ডারে সাধ্যমত দান কর কারণ হরিজনদের কল্যাণই এই ভাণ্ডারের একমাত্র লক্ষ্য।

পর্দাপ্রথা দূর করুন

যখনই আমি বাংলা বিহার বা যুক্তপ্রদেশে গিয়েছি সেখানে পর্দাপ্রথা অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে আরও কঠোরতার সঙ্গে অনুসৃত হতে দেখেছি। কিন্তু একদিন যখন গভীর রাতে দারভাঙ্গায়—বিশৃঙ্খল জনতা ও হট্টগোলের বাইরে শান্ত পরিবেশে আমি এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন অবশ্য আমার সামনে পুরুষেরাই ছিলেন—কিন্তু আমার পেছনে পর্দার আড়ালে অনেক মহিলাও ছিলেন—যাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করা পর্যন্ত আমি কিছুই জানতে পারিনি। অনুষ্ঠানটি ছিল একটি অনাথ আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য কিন্তু আমাকে পর্দার আড়ালে বসা মহিলাদের কাছেই ভাষণ দিতে বলা হয়। যে পর্দার আড়ালে আমার শ্রোত্রীরা বসেছিলেন আর যাদের সংখ্যাও আমার অজানা ছিল তা দেখে আমার খুবই দুঃখ হচ্ছিল। এতে আমি ব্যথিত ও অনুকম্পা বোধ করছিলাম। ভাবছিলাম যে, একটি অসভ্য প্রথা যা প্রথম প্রবর্তনের সময়ে যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন আজ যা পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়, আর যাতে দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে তাকে আঁকড়ে ধরে ভারতের পুরুষেরা নারীদের প্রতি কত অন্যায় করছে। গত একশ বছর ধরে আমরা যে শিক্ষা পেয়ে এসেছি তা আমাদের মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করেনি বলেই মনে হয় কারণ আমি লক্ষ্য করেছি শিক্ষিত পরিবারেও পর্দাপ্রথা বহালই আছে—কারণ অবশ্য এই নয় যে শিক্ষিত লোকেরা এতে বিশ্বাস করেন—কারণ এই যে এই বর্বর প্রথাটিকে পৌরুষের সঙ্গে বাধা দিতে বা এক আঘাতে একে দূর করতে তারা পারেন না। হাজার হাজার মহিলারা যোগ দিয়েছেন এরকম শত শত সভায় ভাষণ দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যে হট্টগোল আর গোলমাল

এই সব সভায় হয় তাতে উপস্থিত মহিলাদের কাছে কার্যকরী কোন বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। যতদিন তাদের বাড়ী বা সঙ্কীর্ণ উঠোনের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হবে ততদিন এর থেকে ভাল কিছু আশা করাও যায় না। অতএব যখন তারা এক বড়ো দালানের মধ্যে নিজেদের সমবেত দেখে বা হঠাৎ কোন বক্তার ভাষণ শোনার ব্যবস্থা করা হয় তখন তারা নিজেদের নিয়ে বা বক্তার বিষয়ে কি করবে ভেবে পায়না। পরিশেষে যখন সব কিছু নীরব হয়ে আসে তার পরেও অধিকাংশ সাময়িক বিষয়ে তাদের উৎসাহী করা শক্ত হয়ে ওঠে। কারণ চিরকাল স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন তাদের নিষিদ্ধ থাকায় তারা এসব বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আমি জানি যে এই বর্ণনা কিছুটা অতিরঞ্জিত হল। এই হাজার হাজার বোনেরা—যাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার বিশেষ সুযোগ আমার ঘটেছে—তাদের সভ্যতার আভিজাত্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি। আমি জানি যে পুরুষের মত সমান ভাবেই তাবা এগিয়ে যেতে সক্ষম—আমি এও জানি যে তাদের বাইরে যাবার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে এটা কিছু গৌরবের কথা নয়। কেননা প্রশ্ন এই যে তারা আরও বেশী অগ্রসর হয়নি কেন? কেন আমাদের নারীরা পুরুষের মত সমান স্বাধীনতা ভোগ করেন না? কেনই বা তাদের বাইরে যেতে বা মুক্ত বায়ু সেবন করতে দেওয়া হবে না?

সতীত্ববোধ আচ্ছাদনের আড়ালে বিকশিত হয় না। ওপর থেকে তা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। চারদিকে পর্দার পাঁচিল তুলেও তা রক্ষা করা যায় না। অন্তর থেকে তার বিকাশ হওয়া প্রয়োজন —আর যখন তা অযাচিত প্রলোভনকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় তখনই তার যথার্থ মূল্য। সীতার সতীত্বের মতই তা হবে মহিমাময়—অন্যনিরপেক্ষ। পুরুষের দৃষ্টিই সহ্য করতে যা অক্ষম সে বস্তু অসার। পুরুষের পৌরুষ থাকলে পরিবারের নারীদের

ওপর আস্থা থাকাই দরকার যেমন নারীরা পুরুষদের বিশ্বাস করতে বাধ্য হন। আমাদের একটি অংগকে আংশিক বা পুরোপুরি পঙ্গু করে জীবনযাপন করতে যেন না হয়। রাম নিজে যেমন মুক্ত ও স্বাধীন ছিলেন সীতাও তেমনি না থাকলে রামের কোন অস্তিত্বই থাকতো না। কিন্তু স্বাধীনতা বিষয়ে গর্ব করার মত দ্রৌপদীর চেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত বোধ হয় নেই। সীতা নম্রতার প্রতিমূর্তি ছিলেন—একটি পেলব কুসুমের মতো। কিন্তু দ্রৌপদী বিশাল মহীরুহের মতো। তাঁর সাম্রাজ্ঞীর মত মনোবলের কাছে প্রবল ভীমকেও নতি স্বীকার করিয়েছিলেন। অন্য সকলেব কাছে ভয়ঙ্কর হলেও দ্রৌপদীর কাছে ভীম মেষশিশু। পাণ্ডবদের কারুর কাছেই তিনি নিরাপত্তা প্রার্থনা করেননি। ভারতের মহিলাসমাজের অবাধ বিকাশে বাধা দেবার চেষ্টা করে আজকাল আমরা মুক্ত ও স্বাধীনচেতা পুরুষের বিকাশেরও প্রতিবন্ধকতা করছি। আমাদের নারীদের প্রতি—অস্পৃশ্যদের প্রতি আমরা যা করছি—হাজারগুণ শক্তিতে বেড়ে তা আমাদের মাথার ওপরেই ভেঙ্গে পড়বে। এ আমাদের দুর্বলতা, দ্বিধা, ক্ষুদ্রতা ও অসহায়তার কিছু কারণও বটে। আসুন! আমরা এক প্রচণ্ড টানে পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলি।

পর্দাপ্রথার বিলোপ

খুব সম্প্রতি পর্দাপ্রথা সম্পূর্ণ বিলোপ করার আহ্বান জানিয়ে বিহারের বিশেষ প্রভাবশালী অনেক পুরুষ ও প্রায় সমান সংখ্যক মহিলার এক যুক্তিপূর্ণ আবেদন প্রচারিত হয়েছে। পঞ্চাশজনেরও বেশী মহিলা এই আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন। তাতে এই তথ্য প্রমাণ করে যে উদ্যমের সঙ্গে কাজ করলে বিহারে পর্দাপ্রথার বিলোপ আসন্ন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই, যেসব মহিলারা আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন তাঁরা পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন নন—বরং রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু।

সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

"আমরা চাই যে আমাদের নারীদের অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা আসুক—সমাজজীবনে তারা যেন সঙ্গত অংশ নিতে পারেন যেমন মাদ্রাজ মহারাষ্ট্র বা কর্ণাটকের বোনেরা নিয়ে থাকেন—মূলতঃ এই পদ্ধতিই হবে ভারতীয়। ইউরোপীয় ভাবানুসরণের সব প্রয়াসকে পরিহার করতে হবে কেননা আমাদের বিচারে বাধ্যতামূলক অন্তঃপুরাবাস থেকে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য জীবনধারা গ্রহণ তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত চুল্লীতে পড়ার মতই হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের নারীদের যদি ভারতীয় আদর্শে উন্নত করতে হয় তবে পর্দাপ্রথা বিলোপ করতেই হবে। আমরা যদি এই চাই যে তারা সামাজিক জীবনে শ্রী ও সৌন্দর্য বাড়িয়ে নৈতিক মান উন্নত করবেন, আমরা যদি এই চাই যে তারা আপন সংসারে সুগৃহিণী হবেন, স্বামীর সহায়িকা হবেন তবে এখনও পর্দা যেভাবে প্রচলিত তা সরাতেই হবে। বাস্তবিকই এই আবরণ ছিঁড়ে না ফেললে তাদের কল্যাণের জন্য সত্যকার কিছু করা সম্ভব নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমাদের সমাজের অর্ধেক অংশের আবেগ যাকে অস্বাভাবিক উপায়ে রুদ্ধ রাখা হয়েছে, একবার যদি তা বিমুক্ত হয় তবে এমন এক শক্তির উদ্ভব হবে যা ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত হলে আমাদের প্রদেশের অমেয় কল্যাণ সাধিত হবে।"

বিহারে পর্দাপ্রথার কু-ফলের কথা আমি জানি। তাই এ আন্দোলন ঠিক সময়েই শুরু হয়েছে।

আন্দোলনের শুরু হয় অদ্ভুতভাবে। বাবু রামনন্দন মিশ্র একজন খাদি কর্মী—পর্দার অত্যাচার থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করতে আগ্রহী হন। তাঁর পরিবারের লোকেরা মেয়েটিকে আশ্রমে আসতে সম্মতি না দেওয়ায় তিনি আশ্রম থেকে দুটি মেয়েকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গিনী হবার জন্য নিয়ে যান। ওদেরই একজন মগনলাল গান্ধীর কন্যা রাধা বেন তার শিক্ষিকা হলেন আর তাঁর সঙ্গী হয়ে রইলেন স্বর্গীয় দলবাহাদুর গিরির কন্যা দুর্গা দেবী। বালিকাবধূর বাবা-মা পর্দার বিলোপে তরুণী শ্রীমতী মিশ্রকে এইভাবে আগ্রহান্বিত করা অপছন্দ করলেন। কিন্তু শ্রীমতী মিশ্র সাহসের সঙ্গে সব অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। ইতিমধ্যে মগনলাল গান্ধী তাঁর কন্যাকে দেখতে গিয়ে সব রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আপন প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অবিচল থাকার উপদেশ দিয়ে আসেন। যে গ্রামে রাধা বেন কাজ করছিলেন তিনি সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ও পাটনায় দেহত্যাগ করেন। সুতরাং বন্ধুরা পর্দার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো যেন একটা মর্যাদাব বিষয় বলে মনে করেন। রাধা বেন তাঁর ছাত্রীকে আশ্রমে নিয়ে আসেন। মেয়েটি আশ্রমে চলে আসায় আবার কিছু আলোড়ন সৃষ্টি হয় যার ফলে তার স্বামী যিনি মনে মনে তৈরী হয়েই ছিলেন আরও বেশী উৎসাহে এই সংগ্রামে যোগ দিতে বাধ্য হন। ফলে কিছুটা ব্যক্তিস্বার্থজড়িত এই আন্দোলন আরও বেশী উদ্যমে চালিত হবার সম্ভাবনা। বহু যুদ্ধের নায়ক বিহারের অভিজ্ঞ সৈনিক বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ পুরোভাগে রয়েছেন, তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত কোন আন্দোলনের অবসান ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ে না।

যে প্রথা বিহারের অর্ধাংশ অধিবাসীদের সমাজসেবার ওপর নিষ্ঠুর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আর অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা

এমন কি অবাধ আলো ও মুক্ত বায়ু সেবনের অধিকার কেড়ে নিয়েছে সেই প্রথার বিরুদ্ধে এই আবেদনে তীব্র আন্দোলনের সূচনার দিন আগামী ৮ই জুলাই স্থির করা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি বোঝা যাবে যে সামাজিক অনেক কু-প্রথাই আমাদের স্বরাজলাভে বাধা সৃষ্টি করে—আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে আমাদের অগ্রগতিও তত দ্রুত হবে। স্বরাজলাভ করা পর্যন্ত সমাজ সংস্কার স্থগিত রাখার অর্থ হলো স্বরাজের তাৎপর্য না বোঝা। আমরা যদি আমাদের সমাজে উত্তমাংশদের পঙ্গু হয়ে থাকতে দিই তবে নিশ্চিতভাবে অন্যান্য জাতির সঙ্গে নিয়মসম্মত প্রতিযোগিতায় বা আত্মরক্ষায় অসমর্থ আমাদের হতেই হবে।

সেই জন্যই পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে উৎসাহের সঙ্গে এই সংগ্রাম শুরু করবার জন্য বিহারের নেতৃবৃন্দকে আমি অভিনন্দন জানাই। সাধারণতঃ সব রকম সংস্কারের ব্যাপারেই—বিশেষতঃ এই সংস্কারের কাজে সার্থকতা কর্মীদের নিষ্কলুষতার ওপর নির্ভর করে। যে মহিলারা এই আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন তাদের ওপরেও অনেকটা দায়িত্ব থাকবে। যদি পর্দাপ্রথা দূর করার পরেও তারা ভারতীয় নারীর প্রাচীন শালীনতা রক্ষা করতে পারেন তবে তাদের প্রয়াসের সার্থকতা তারা অচিরেই লাভ করবেন। পর্দার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তবে তার অর্থ হবে বিহারের পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য নির্ভুল নীতিতে গণশিক্ষার ব্যবস্থা।

বিহারে পর্দাপ্রথা

গত ৮ই বিহারের অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য জায়গায় পর্দার বিরুদ্ধে যে সুসংবদ্ধ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল তা উদ্যোক্তাদের আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করে বলে এক বিহারী বন্ধুর চিঠিতে জানলাম। পাটনার সভার বিবরণী দিয়ে 'সার্চ লাইট' এই বলে আরম্ভ করেছেন—

"গত রবিবার ৮ই জুলাই পাটনায় রাধিকা সিংহ ইন্‌ষ্টিটিউটে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের এক মিলিত সভায় একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। প্রচণ্ড বৃষ্টি সত্ত্বেও—অবশ্য তা সৌভাগ্যক্রমে সভার সময় থেমে যায়—অপ্রত্যাশিত জনসমাগম হয়। বস্তুতঃ রাধিকা সিংহ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রশস্ত হলের অর্ধেকই মহিলাদের দ্বারাই পূর্ণ ছিল ও এদের তিন-চতুর্থাংশই আগের দিন পর্যন্ত, হয়তো বা এক ঘণ্টা আগেও পর্দা মেনে চলতেন।"

সভায় গৃহীত প্রস্তাবের অনুবাদ নীচে দেওয়া হল—

"আমরা সমবেত পাটনার নর-নারী এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আজ থেকে বিষময় পর্দাপ্রথা—যে প্রথা অতীতে ও বর্তমানে দেশের বিশেষতঃ নারীসমাজের অমেয় ক্ষতি করেছে তা অবলুপ্ত হোল—আর এই প্রদেশের যে সব মহিলারা এখনও দ্বিধাগ্রস্ত তাঁদের কাছে আবেদন করছি তারা যেন যত শীঘ্র পারেন এই প্রথাকে বিলুপ্ত করে নিজেদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধান করেন।"

পর্দার বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন পরিচালনার জন্য ও বিহার প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য এই সভায় একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। তৃতীয় একটি প্রস্তাবে প্রদেশের প্রতিটি গ্রামে ও শহরে মহিলা সমিতি সংগঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়। চতুর্থ একটি প্রস্তাব এই মর্মে গৃহীত হয় যে বিভিন্ন জায়গায় মহিলা আশ্রম সংগঠন করা হবে যেখানে মহিলারা নির্দিষ্টকাল থাকতে পারবেন ও সুগৃহিণী, সুজননী ও দেশের সুকন্যা হবার মতো শিক্ষা নিতে

পারবেন। এই উদ্দেশ্যে সেইখানে তখনই পাঁচ হাজারের বেশী টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় আর দাতাদের মধ্যে অনেক মহিলার নাম দেখতে পাই যারা ২৫ টাকা থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত দান করেছেন। ঐ সংবাদপত্রে বিহারেব আরও কয়েক জায়গায় অনুরূপ সভার খবর রয়েছে। এই অভিযান যদি ঠিকমত সংগঠিত হয় আর উদ্যমের সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া যায় তবে পর্দার অস্তিত্ব অতীতে মিলিয়ে যাবে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে এ আন্দোলন কোন ইঙ্গ-ভারতীয় আন্দোলন নয়—এটি একটি দেশীয় পুরাণোপন্থী প্রচেষ্টা—যা সেইসব নেতারাই করছেন যারা স্বভাবে রক্ষণশীল হলেও হিন্দু-সমাজে যে সব কুপ্রথা আছে সে সম্বন্ধে অবহিত। বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যাঁরা সুদূর লণ্ডন থেকে আন্দোলনের ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছেন ও সমর্থন করেছেন তাঁরা কেউই ভারতীয় সমাজের পাশ্চাত্ত্যধর্মী দৃষ্টান্ত নন। তাঁরা গোঁড়া হিন্দু—ভারতীয় সভ্যতা ও জীবনধারাকে ভালবাসেন। তাঁরা পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ করেন না আবার তার মধ্যে যেটুকু ভালো আছে তা গ্রহণ করতেও দ্বিধা কবেন না। তাই যারা ভীতু বা দ্বিধাগ্রস্ত তাদের মনে কোন সন্দেহ থাকার কারণ নেই যে এই আন্দোলন এমন কোন রূপ বা আকার নেবে যাতে ভারতীয় কৃষ্টিতে যা সবচেয়ে মহার্ঘ্য—বিশেষতঃ ভারতীয় নারীত্বের যে বৈশিষ্ট্য নারীর নম্রতায় ও সম্ভ্রমবোধে রয়েছে—তার বিকৃতি ঘটবে।

বর্মী মহিলাদের প্রতি

বর্মার মৌলমিনের এক সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে গান্ধিজী বর্মীদের আত্মসংবরণ ও সুখী হবার জন্য চরকা গ্রহণ করতে আহ্বান করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

আজকাল পৃথিবীর কোন নারীজাতি যে স্বাধীনতা ভোগ করেন না তোমরা তাই ভোগ করছো। তোমরা তোমাদের শিল্প ও নিপুণতার জন্য প্রসিদ্ধ। তোমাদের সংগঠনের ক্ষমতা অনেক। বিদেশী সৌখীনতা সম্বন্ধে যদি তোমরা তোমাদের রুচি বদলাও আর আমি যে সরলতার বাণী তোমাদের দিলাম তা যদি তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর তবে তোমরা তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনতে পারবে।

* * *

ধূমপানের ভীষণ কুফল সম্বন্ধে বলবার সাহস আমার ততটা নেই। কিন্তু আমি জেনেছি যে সমস্ত ব্রহ্মদেশে এ অভ্যেস থেকে মুক্ত একটিও পুরুষ বা নারীকে আমি দেখতে পাবো না। আমরা যারা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি তারা সুন্দরী বর্মী মহিলাদের চুরুট ও সিগারে মুখ বিকৃত দেখে দুঃখ ও বিস্ময় বোধ করি। কিন্তু আমি জানি—যে অভ্যেস সমস্ত পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা খুবই কঠিন। তোমরা টলষ্টয়ের নাম যদি শুনে থাকো আমি প্রমাণ স্বরূপ তাঁর উক্তির উল্লেখ করছি যে টলষ্টয় নিজে একজন ঘোরতর ধূমপায়ী হয়েও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে তামাক মানুষের অন্যান্য অনুভূতি ছাড়াও সর্বোপরি তার বুদ্ধির জড়ত্ব আনে। প্রমাণ করবার জন্য তিনি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন যে তামাকের প্রভাবে অধিকাংশ অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে এবং তাঁর সুন্দর গল্পগুলোর একটির মধ্যে তিনি সেই

গল্পের দুরাত্মাকে মদ্যপানের পরে নয় বরং ধূম পানের পরেই হত্যাকারী বলে চিত্রিত করেছেন। অবশ্য এটা সত্যি যে ধূম পানের অভ্যেস ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে আর এর সমর্থকদের মধ্যে পৃথিবীর অনেক তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি রয়েছেন। তবুও এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আগ্রহ দেখা দিয়েছে ও প্রতিরোধকারীদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যের অনেক খ্যাতনামা সাধু ও নীতিবাদীও আছেন।

প্রশ্নাবলী

পুরুষ ও নারী

প্রশ্ন—নারী ও পুরুষ সত্যাগ্রহীরা অবাধে মেলামেশা করবেন ও একসঙ্গে কাজ করবেন বা নিজের নিজের সুনির্দিষ্ট পৃথক কর্মক্ষেত্রে—ভিন্ন সংস্থায় তারা সংগঠিত হবেন—এ বিষয়ে আপনি কোন্‌টি অনুমোদন করেন আমি জানতে চাই। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে প্রথম পদ্ধতিতে বেশ কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলতা ও অধঃপতন পরিণামে আসবে। আপনি যদি আমার সঙ্গে একমত হন তাহলে সম্ভাব্য এই মন্দকে প্রতিহত করতে কি কি নিয়ম থাকা আপনি প্রস্তাব করেন?

উত্তর—আমি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থাই চাই। নিজেদের মধ্যে কাজ করার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দায় নারীদের আছে। আমাদের নারীরা ভীষণভাবে অবহেলিতা ও তাদের মধ্যে কাজ করার জন্য নিষ্কলুষ সততা নিয়ে শত শত ধীমতী মহিলাকর্মীর প্রয়োজন। নীতিগতভাবেও নারী ও পুরুষের আলাদা কাজ করা ভালো বলেই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু নিয়মের কোন কড়াকড়ি করতেও আমি চাই না। দুজনের মধ্যেকার সম্বন্ধ শুভবুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। দুজনের মধ্যে কোন পাঁচিল তোলা উচিৎ হবে না—পারস্পরিক আচরণও স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফুর্ত হওয়া উচিৎ।

নারীই বলীয়সী

প্রশ্ন—প্রতিরোধ না করা কি প্রবলের কাছে আত্মসমর্পণ নয়?

উত্তর—নির্বিরোধ প্রতিরোধকে দুর্বলের অস্ত্র বলে মনে করা হয়—কিন্তু যে প্রতিরোধ পদ্ধতির জন্য আমাকে একেবারে নতুন নামকরণ করতে হয় তা বলীশ্রেষ্ঠের আয়ুধ। যা আমি বলতে চেয়েছি তা সুস্পষ্ট করবার জন্য আমাকে নতুন কথা তৈরী করতে হয়। কিন্তু কথাটির তুলনাহীন সৌন্দর্য এই যে বাস্তবিকপক্ষে এটি

বলীশ্রেষ্ঠের অস্ত্র হলেও দেহে ক্ষীণ এমন ব্যক্তিও এটি ব্যবহার করতে পারেন—বৃদ্ধ যিনি তিনিও এমনকি শিশুরাও যদি তাদের হৃদয়ে বল থাকে। আর যেহেতু সত্যাগ্রহে আত্মনিপীড়নের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা হয়—নারীরাও স্বভাবতঃই এ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। গত বছরে আমরা দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীরা দুঃখবরণে তাদের ভাইদের ছাড়িয়ে গিয়েছেন ও উভয়ে মিলে অভিযানে এক মহত্ত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন। কেননা এই আত্মনিগ্রহ সংক্রামক হয়ে পড়ে ও তারা বিস্ময়করভাবে স্বার্থত্যাগে উদ্যোগী হন। যদি এমন হয় যে ইউরোপীয় নারী ও শিশুরা মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হলেন, তবে তারা পুরুষদের বিমূঢ় করে অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ে জঙ্গীবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। মূলগত ধারণাটা এই যে নারী, শিশু ও অন্যান্য সকলেরই আছে একই আত্মা—একই শক্তিসম্ভাবনা। সত্যের অশেষ শক্তির বিকাশসাধনই সমস্যা।

নারীর অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য

প্রশ্ন—সম্পত্তির মালিকানা বিষয়ে বিবাহিতা নারীর অধিকার সম্বন্ধীয় আইনের সংস্কারে কেউ কেউ আপত্তি করেন এই যুক্তিতে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীদের মধ্যে দুর্নীতির প্রসার ঘটিয়ে দাম্পত্যজীবন বিপর্যস্ত করবে। এ বিষয়ে আপনার মনোভাব কি?

উত্তর—আমি একটি প্রতিপ্রশ্ন করে উত্তর দেব। পুরুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সম্পত্তির ওপর অধিকার কি তাদের মধ্যে দুর্নীতি ঘটায়নি? যদি তুমি বল হ্যাঁ তবে নারীর ক্ষেত্রেও তাই হোক। যখন নারীরও পুরুষের মত মালিকানা ও অনুরূপ অধিকার থাকবে তখন দেখা যাবে এ অধিকার ভোগ পাপ-পুণ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। নারী বা পুরুষের অসহায়তার ওপরে যে নীতিবোধের ভিত্তি তা অনুসরণের যোগ্য নয়। আমাদের অন্তরের শুচিতার ওপরেই নীতিবোধের ভিত্তি।

সমাজে নারীর স্থান

প্রশ্ন—ভারতীয় নারীদের নাগরিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগরণের ফলে চিরাচরিত গার্হস্থ্য কর্তব্য পালনের সঙ্গে সমাজের প্রতি কর্তব্য-পালনে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। যদি সামাজিক কোন কাজে কোন নারী নিজেকে নিয়োজিত করেন তবে হয় সন্তানের প্রতি নয় গার্হস্থ্য কর্মে অবহেলা ঘটে। এ সমস্যা সমাধান কি করে করা যায়?

উত্তর—অপরিহার্য গার্হস্থ্য কাজ সম্পাদনে নারীর যত সময় যায় তার চেয়ে বেশী সময় যায় তার প্রভু ও স্বামীর আত্মতুষ্টি সাধনে ও নিজের গর্বসুখ মেটাতে। আমার কাছে নারীর গার্হস্থ্য কাজে এই দাসত্ব আদিম জীবনের নিদর্শন। আমার মতে রান্নাঘরের বন্দীত্ব মূলতঃ অসভ্য সমাজের শেষসীমা। এই দুঃস্বপ্ন থেকে আমাদের নারীসমাজকে মুক্ত করতে আর দেরী করা উচিত নয়। নারীর সময়ের সবটুকুই গার্হস্থ্য কাজে ব্যয়িত হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন—নির্বাচনের সময় আপনার কংগ্রেস-কর্মীরা আমাদের কাছে সব রকম সহায়তা চান। কিন্তু আমরা যখন আমাদের সামাজিক কাজে যোগ দিতে তাঁদের স্ত্রী-কন্যাদের পাঠাতে অনুরোধ করি তখন তাঁরা নানা অজুহাতের অবতারণা করেন ও বাড়ীর চার দেয়ালের মধ্যে তাদের কড়া নজরে বন্দিনী রাখতে চান। এ ব্যাপারে আপনি কি রকম প্রতিকারের প্রস্তাব করেন?

উত্তর—এই প্রগতিবিরোধী সব ফসিলদের নাম হরিজনে প্রকাশনের জন্য আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

একজন বিধবার সমস্যা

প্রশ্ন—আমি একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বিধবা। বৈধব্যের সময় থেকে এই ২৪ বছর খাবার ব্যাপারে আমি সমস্ত রকম বিধিই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। আমার আলাদা বিধবাদের রান্নাঘর আছে ও আমার নিজের পরিবারেও আলাদা বাসনপত্র আছে। আপনার সত্য ও অহিংসার আদর্শের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। ১৯৩০ সাল থেকে আমি নিয়মিত খাদি ব্যবহার করি ও সূতা কাটি। আমাদের মহিলাসমাজ

ঢাকার এক হরিজন গ্রামে একটি হরিজন বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। আমি সেখানে যাই ও হরিজনদের সঙ্গে মিশি। মুসলমান বোনেদের সঙ্গে আমি অবাধে মেলামেশা করি ও তাদের প্রতি শুভেচ্ছা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। কিন্তু হরিজনদের সাথে বা অব্রাহ্মণ কারও সাথে একসঙ্গে আহার করতে আমি পারি না। অতএব আমার মত গোঁড়া বিধবারা কি সক্রিয় বা সহায়কভাবে সত্যাগ্রহী হতে পারে না?

উত্তর—কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে তোমার নাম লেখানোর সমান অধিকার আছে। তুমি তোমার এ অধিকার প্রয়োগ করতেও পার। কিন্তু তুমি আমার মত চেয়েছো তাই আমি তোমায় নাম লেখানো থেকে বিরত থাকতেই বলি। আমি জানি বাঙ্গালী বিধবারা সংস্কার দ্বারা আরোপিত বিধি কতো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলেন। কিন্তু যে বিধবারা দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের যে কোন লোকের সঙ্গে আহার্য গ্রহণে কোন দ্বিধা বোধ করা উচিত নয়। আমি বিশ্বাস করি না—একসাথে আহার করলে—তা সে যার সঙ্গেই হোক্ না কেন তাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হয়। যদি কোন বিধবা নির্দিষ্ট কাজ করবার সময় সেবার ভাব মনে রাখেন তবে তার পক্ষে সেটা মঙ্গলের। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বা অন্য সব বিধিও যদি কোন বিধবা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেন তবুও তিনি সত্যিকার বিধবা হবেন না যদি না তার অন্তর নির্মল হয়। আমার মত তুমিও ভালই জানো যে সমাজরক্ষার বিধিগুলো শুধু বাইরে মেনে চলার—অন্তরালে প্রায়ই ভণ্ডামি থাকে। সেই জন্যই আমি তোমায় পরামর্শ দিই যে পংক্তি-ভোজনের ওপর নিষেধ বা এইরকম বিধি আধ্যাত্মিক ও জাতির উন্নতির বাধা স্বরূপ বলে তা উপেক্ষা কর ও চিত্তশুদ্ধির ওপর মনোনিবেশ কর। সত্যাগ্রহীদলে আত্মতুষ্ট লোকের বদলে আমি তাদেরই চাই যারা যুক্তি দিয়ে বিচার করেছেন ও এমন একটি জীবনধারা বেছে নিয়েছেন যা বুদ্ধি ও অন্তরের বিচারে গ্রাহ্য বলে মনে করেছেন।
